আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১

কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব বিগ-ব্যাংগ

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

মানব সমাজে যারা অতি বিজ্ঞানপ্রিয় সেজে নিজেদেরকে প্রগতিবাদী ও প্রকৃত জ্ঞানী হিসেবে জাহির করেছিলেন এবং ধর্মকে ভ্রুকুটি করে অনন্ত আযাবময় অগ্নিদুর্গ 'জাহান্নামকে' অস্বীকার করেছিলেন, আজ বিজ্ঞান-ই তাদের বিরুদ্ধে অভিনব আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদেরকে চরমভাবে হেস্ত-নেস্ত করে ছেড়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের মনগড়া কথা সমাজে চালু করে বাহ্‌বা পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান তাদের ক্ষমা করেনি।

আজকে বিজ্ঞানবিশ্ব মহাকাশে কল্পনাতীত ও ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন অগ্নিদুর্গ 'কোয়াসার' আবিষ্কার করে তার ছবি ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির দৃষ্টি আল্-কুরআনের দাবী অনুযায়ী প্রচণ্ড শাস্তিময় স্থান অগ্নিদুর্গ 'জাহান্নাম'-এর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। মানব সমাজ হতবাক হয়ে তা অবলোকন করে শিউরে উঠছে আর নিজের অজান্তেই বলছে 'এও কি সম্ভব?' তাহলে 'জাহান্নাম' কি সত্যিই আছে? হে আল্লাহ্! তুমি এক মহাসত্য পবিত্র সত্তা, তোমার 'কুরআন'ও সত্যগ্রন্থ, তোমার নবী-রাসূলগণও (সা) সত্য বাণীবাহক, পরকালও সম্পূর্ণরূপে সত্যজগৎ, আমি আত্মসমর্পণ করলাম তোমার শাহী দরবারে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমাকে তুমি মুক্তি দিও ঐ 'জাহান্নাম' থেকে পরকালে, হে প্রভু! আমীন!'

- আপনি কি জাহান্নামের বিস্ময়কর নিদর্শন 'কোয়াসার' ও নক্ষত্রবিহীন পরকাল সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে বইটির ভেতরে প্রবেশ করুন,
- আপনি কি মহাকাশ বিজ্ঞান বুঝতে চান ? তাহলে বইটি একবার পড়ে দেখতে পারেন,
- আপনি কি 'ঈমান' বহুগুনে বৃদ্ধি করতে চান? তাহলে বইটি পড়ে দেখতে পারেন,
- আপনি কি 'সত্য ও মিথ্যার' মধ্যে পরখ করতে চান? তবে বইটি আপনারই প্রয়োজন বেশি,
- আপনি কি সত্য ও সুন্দরের পতাকাবাহী সিপাহ্‌সালার? তাহলে বইটি আপনার নিত্যসঙ্গী হতে পারে,
- আপনি কি আগামী দিনে সোনালী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে রাজপথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলা যুবক? তাহলে বইটি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করবে।

বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের হীরণময় কিরণে উদ্ভাসিত এই বিশ্বে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে 'দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' তার যাত্রা শুরু করেছে। আর সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' একযোগে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে 'আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজ-১ থেকে সিরিজ-৫ পর্যন্ত মোট ৫টি খণ্ড, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

- সিরিজ-১ ঃ কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ।
- সিরিজ-২ ঃ কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল।
- সিরিজ-৩ ঃ কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব।
- সিরিজ-৪ ঃ কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস।
- সিরিজ-৫ ঃ কুরআন, কোয়াসার ও শিঙ্গায় ফুৎকার।

গ্রন্থগুলোর প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য র‍্যাক্স পাবলিকেশন্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিরিজের খণ্ডগুলো আপনার সমগ্র জীবনে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি উত্তম সংগ্রহ হিসেবে অবদান রাখতে পারে। নিজে বইগুলো পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন।

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা মানুষের হিতসাধন করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন।"

আল-কুরআন (২ : ১৬৪)

আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১

কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব বিগ-ব্যাংগ

মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাহবুবুল হক

র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ
মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

ISBN : 984-873-000-1 set

প্রকাশনায়
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯২২৭০৪২১০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০১
ষষ্ঠ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

প্রচ্ছদ : আহসান কম্পিউটার

পরিবেশনায়
- আহসান পাবলিকেশন
  বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
  ফোন : ৭১২৫৬৬০
- মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
- মাওলা প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা
- খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

কম্পোজ ও মুদ্রণে
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য ঃ ৪০০.০০ টাকা মাত্র
ইউএস ডলার : ৮.০০

RAQS Book Series : 03

QURAN, COSMOLOGY & BIG BANG
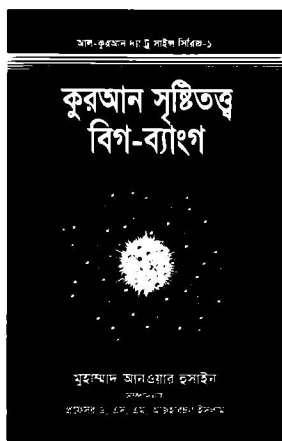
MOHAMMAD ANWAR HUSSAIN

Edited by

Dr. S. M. Azharul Islam

Mahbubul Huq

তোহফা

খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোবিহীন অন্ধকারময় মহাবিশ্ব সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা) হিসেবে পবিত্র গ্রন্থ কুরআনসহ যিনি জ্ঞানের সকল শাখাকে একত্রিত করে মানব সমাজে সর্বাঙ্গীণ ও চূড়ান্ত বিপ্লব সাধন করেছিলেন, সেই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মুনাজাত জানিয়ে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস আল্লাহর নামে উৎসর্গ করছি।

প্রকাশকের নিবেদন

মহান আল্লাহ্ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির রহস্য জানানোর জন্য মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি করেছেন। যাতে তারা সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সঠিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। একই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কালে কালে গোত্রে-গোত্রে বাণীবাহক পাঠিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সবাই নবী এবং কেউ কেউ রাসূল। এসব রাসূল আল্লাহর বাণী সমৃদ্ধ বক্তব্য ও গ্রন্থ পেয়েছেন। সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন পেয়েছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য মানুষ ও জ্বীনকে প্রতিনিয়ত আল-কুরআনের দিকে ফিরে যেতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে আল-কুরআনের ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানের নানা তথ্য ছড়িয়ে আছে। এসব যে বিজ্ঞানের কথা, শুরুতে তা বুঝা যায়নি। সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। একজন বিজ্ঞানী যখন গবেষণার মনোভঙ্গি নিয়ে গভীর অভিনিবেশের সাথে আল-কুরআন অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি কুরআনের ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য উপলব্ধি করেন। একই কথা প্রযোজ্য ধর্মবেত্তা, শাসক, ইতিহাসবিদ, সমাজবেত্তা, আইনবিদ, সংস্কৃতজ্ঞসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে।

নানারকম অন্ধত্ব ও ভুল সিদ্ধান্তের ওপর বিজ্ঞানের অভিযাত্রা। এ অভিযাত্রায় কুরআন যদি কম্পাসের ভূমিকা পালন করতে পারতো, তা'হলে বিজ্ঞান আজ এই কূলে, কাল ঐ কূলে ভিড়তো না। শুরু থেকে না হোক, অন্তত গত দেড় হাজার বছরে সঠিক ঠিকানায় সে নোঙ্গর করতে পারতো। এ না পারার জন্য মানব জাতির সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ক্ষতির জন্য

দায়ী প্রধানতঃ মুসলিম শাসক ও বিজ্ঞানীরা। তাঁরা কুরআনকে খোলা-পাতার মতো মেলে ধরেননি। 'বিষয়টি একান্তই ধর্মতাত্ত্বিকদের', এ ধরনের মূঢ় মনোভাব সকল সময়ে বিরাজিত ছিলো। ফলে সর্বনাশ যা' হবার তা হয়ে গেছে।

আমাদের সৌভাগ্য, তামাম দুনিয়ার প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা অবশেষে কুরআন অধ্যয়নে লেগে গেছেন। তাঁরা দেখছেন, সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন করবে, তার সকল ইঙ্গিত রয়েছে আল-কুরআনে। তাই নানাদিকে ছুটোছুটি করে বা অন্ধকারে হাতড়িয়ে লাভ নেই। আল-কুরআনের মহাসমুদ্র থেকে বিজ্ঞানের মণি-মুক্তা আহরণ করতে হবে।

বিজ্ঞানী না হলেও মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ গবেষক। তিনি একান্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যবসায় করছেন। তাঁর আন্তরিক ও কষ্টসাধ্য অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি বক্ষমান এ সিরিজ। আমরা জানি, সত্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানবতার মুক্তির জন্য জীবন সাধ্য এ প্রয়াসে তিনি নিয়োজিত। এর বিনিময় তিনি মহান মালিকের কাছ থেকেই পাবেন। সিরিজের খণ্ডগুলো যত্নসহ প্রকাশ করার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে কামিয়াবীর জন্য পরম বিজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. এস.এস.এম. আজহারুল ইসলাম ও কবি মাহবুবুল হক তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে পালন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদেরকে আমরা খাটো করতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁদেরকে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস আল্লাহ্ কবুল করুন, আমীন।

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার অর্থ হলো সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করা। এই দুই অগ্রযাত্রার শুভারম্ভ মানুষের আবির্ভাবকালে। কালে কালে তা সফল হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

মানুষের জীবন স্বস্তিময়, সুখময়, শান্তিময় এবং মুক্তিময় করার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অকাতরে বাণী পাঠিয়েছেন। বাণীকে পল্লবিত করার জন্য বাণীবাহক পাঠিয়েছেন। এসব বাণীর প্রধান অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। বাণীবাহকরা শাব্দিক অর্থে বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞানের বাণীবাহক ছিলেন তাঁরা।

সভ্যতার দুর্ভাগ্য, স্রষ্টার বাণীকে অবিসংবাদিত তথ্য হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করার এবং বাণীবাহকদের মানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে মেনে নেয়ার অনিবার্য প্রয়াস সবসময় বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত প্রজ্ঞা নিয়ে অসীম ও অখণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভূ হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। ফলে অন্যান্য অসারতা ও অবিমিশ্রকারিতার সাথে বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের চর্চাও কম হয়নি। সভ্যতার অগ্রযাত্রা সে কারণে 'আলোকে-তিমিরে' হয়েছে, স্বচ্ছন্দ, পরিপূর্ণ এবং আলো ঝলমল হতে পারেনি।

অথচ সভ্যতাকে লাবণ্যময় করার জন্য প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর সর্বশেষ বাণীতেও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উচ্চকিত করেছেন। কিন্তু অজ্ঞতা ও অবজ্ঞাবশতঃ সেসব উন্মোচিত না করেই মানুষ মহাবিশ্বের ভগ্নাংশে বিচরণ করে আত্মপ্রসাদে বিমোহিত হয়েছে। অবশ্য হালে বিজ্ঞানীদের একটি অংশ কৌতূহলবশতঃ কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞানের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াসে মানবতার জন্য তথ্যের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রমাণিত হচ্ছে ১৪শ' বছর পূর্বেই মহাবিশ্বের সকল খুঁটি-নাটি বিষয় মহা বিজ্ঞানময় পালনকর্তা ও তাঁর সর্বশেষ বাণীবাহক মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে জাতিকে সোচ্চারে অবহিত করেছেন। এ থেকে আরও

"অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না (গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধান করিয়া দেখে না) যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি (আল্লাহ) তাদের সবাইকে (প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে) পৃথক করিয়া দিলাম?"

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৩০)

Zones not to scale

200,000 to 500,000 yrs

Big Bang

Cosmic microwave background

প্রমাণিত হচ্ছে স্রষ্টার সর্বশেষ গ্রন্থই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বা সূতিকাগার। আল-কুরআনকে এই আঙ্গিকে এবং নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই উদ্যোগই গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ গবেষক মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন। তিনি মাতৃভাষা বাংলায় এর চর্চা করে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এখন তিনি বিষয় থেকে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে মানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মণি-মুক্তা আহরণ করছেন।

বক্ষ্যমাণ খণ্ডটি পাঠ করে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। গবেষককে আমরা সাধুবাদ জানাই। তথ্য, উপাত্ত ও ভাষা, যেখানে যা প্রয়োজন ছিলো, আমরা দ্রুততার সাথে সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছি।

গবেষকের অক্লান্ত প্রয়াস আরো কেন্দ্রীভূত, নিখুঁত, নির্দিষ্ট ও জোরদার হোক, সত্য ও স্ফটিক-স্বচ্ছ হোক। মানবতা সকল আবিলতা থেকে মুক্তি পাক। সভ্যতা দোদুল্যমানতা ভুলে একনিষ্ঠভাবে কল্যাণময়ী অগ্রযাত্রায় ঊর্মিমুখর হোক। সর্বোপরি মানবতা আত্মসমর্পিত ও বিজয়ী হোক।

২১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ইং

ড. এস এম আজহারুল ইসলাম
মাহবুবুল হক

লেখকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ, অবশেষে হাজারো প্রতিকূলতার সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ডিঙ্গিয়ে 'আল-কুরআন' দ্যা ট্রু সাইন্স' গ্রন্থটি সিরিজ আকারে পর পর বহু খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো। এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা মহাবিজ্ঞানময় মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌রই।

'আল-কুরআন' আল্লাহর বাণী। যার মাঝে মানবজীবনের দিক নির্দেশনা, মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত, ফিরিশ্‌তাকুল ও জ্বীন সম্প্রদায়ের আলোচনা, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমনের ইতিহাসসহ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত আলোচনার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তার ধ্বংস, চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি ও তাদের পরিণতি, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, ঋতুর পরিবর্তন, জীবন, উদ্ভিদ এবং মানুষের সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক তথ্য পেশ করে মানব জাতিকে তার সত্যতা প্রমাণ করে দেখার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধানের আহ্বান জানানো হয়েছে। সাথে সাথে মহাবিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী অদৃশ্য সেই মহান সত্তা, প্রচণ্ড ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের অধিকারী 'আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনকে' দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেনে নেয়ার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এমন সব বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে যেন পৃথিবী নামক গ্রন্থটি চূড়ান্ত ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানব সমাজের হাজারো প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান খুব সহজে চোখের সামনেই পেয়ে যেতে পারে।

'আল্লাহ্ পাক' জানেন যে, সময়ের বিবর্তনে এই মাটির পৃথিবী এমন এক পর্যায় অতিক্রম করবে, যখন বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষতা লাভ করবে। উন্নত এ সময়ে মানুষ প্রত্যেকটি বিষয়কে সরাসরি বিজ্ঞানের অর্জিত সাফল্যের নিক্তিতে পরিমাপ করে তবেই তা গ্রহণ করবে অথবা বর্জন করবে। সম্ভবত এ কারণেই (আল্লাহ্ ভালো জানেন) তিনি কুরআনে বৈজ্ঞানিক মৌলিক তথ্য ও প্রস্তাবসমূহ জুড়ে দিয়েছেন, যেন বিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মানুষের বিবেক পবিত্র 'কুরআনকে' বাস্তবতার আলোকে যাচাই বাছাই করে এর সত্যতাকে নিরেট 'সত্য' হিসেবে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে। তা না হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন পরিবেশে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে যখন 'কুরআন' নাযিল হচ্ছিল, তখন মানবমণ্ডলী জ্ঞানের এমন এক নিম্নতম স্তরে অবস্থান করছিল যে, তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান রাখতো না এবং

এমন কোনো আগ্রহই পোষণ করতো না যা দিয়ে তারা পরখ করতে পারতো যে, 'আল-কুরআন' সত্যিই মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্য সঠিক গ্রন্থ। বস্তুতঃ 'আল-কুরআন' হচ্ছে এক মহাসত্য গ্রন্থ, আর 'বিজ্ঞান' হচ্ছে সেই মহাসত্যকে বাস্তবে প্রমাণিত করার 'টুলস্' বা 'মাধ্যম মাত্র'। 'কুরআন' হচ্ছে টাকার প্রধান পিঠ এবং 'বিজ্ঞান' হচ্ছে টাকার দ্বিতীয় পিঠ। কাউকে অস্বীকার করা যায় না।

একজন বিশ্বাসী 'বিজ্ঞান' নামের যেকোনো তথ্যকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে মেনে নিতে এগিয়ে যায়। তার কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে পরখ করে দেখার কোনো মানদণ্ড নেই। ফলে পরবর্তীতে বাস্তবতার আলোকে যখন 'বৈজ্ঞানিক তথ্যের' পরিবর্তন ঘটে তখন ঐ অবিশ্বাসীকেও তার অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু একজন বিশ্বাসী যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমূলক তথ্যকে 'আল-কুরআনের' আলোকে পরখ করে মিলিয়ে দেখে। যখন তা 'কুরআনের' সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং 'কুরআনের' সাথে একাত্ম হয়ে যায়, কেবল তখনই বিজ্ঞানের উদ্ঘাটনকৃত ঐ সত্য তথ্যকে গ্রহণ করে, নতুবা নয়। এক্ষেত্রে 'আল-কুরআন' মানদণ্ডের কারণ হলো– 'কুরআনের' অবস্থান বর্তমান বিজ্ঞানের অনেক অগ্রে, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে 'আল-কুরআন' দুনিয়ার মানুষের সামনে আগমন করেছে এবং বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত তথ্য একাধিকবার তার অবস্থান পরিবর্তন করলেও 'আল-কুরআনের' বিষয়তো দূরের কথা, একটি শব্দ এমনকি একটি অক্ষরও বিগত ১৪০০ বছর থেকে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত রয়েছে। গোটা বিশ্ববাসীর জ্ঞান-রাজ্যের সম্মুখে ভরা দুপুরের সূর্যের ন্যায় ঝল্মল্ করে তাদেরকে 'মহাসত্যের' প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানাচ্ছে। এর কারণ মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' নাযিল হয়েছে সকল জ্ঞানের উৎস এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী মহান সত্তা বিশ্বপ্রভু 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের' পক্ষ থেকে। অপরদিকে বিজ্ঞান নামক তথ্যসমূহ আগমন করছে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে, আর সেজন্যই 'বৈজ্ঞানিক তথ্য বা থিউরিকে' সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বিজ্ঞান বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে এই মহাবিশ্বের অসংখ্য বিষয়ে নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে, তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব সভ্যতার মাঝে জ্ঞানের ধারক ও চিন্তাশীল সমাজই বিভ্রান্ত হয়েছেন বেশি। তারা স্বল্প সময়ে বিজ্ঞানের বদৌলতে

এই মহাবিশ্বের অগণিত বিষয়ে এত বেশি তথ্য লাভ করেছেন যে, বেশি প্রাপ্তির ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যাঁর অদৃশ্য সৃষ্টি নৈপুণ্যতায় প্রতিমুহূর্তে যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, তাঁকেই ভুলে গিয়ে তদস্থলে 'বিজ্ঞানকে' বসিয়ে দিয়েছেন এবং জ্ঞানের চক্ষুকে আপাততঃ বন্ধ রেখে বিফল ও ব্যর্থ আত্মতৃপ্তির স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করছেন।

আমাদের সমাজের উল্লিখিত শ্রেণীর সম্মানিত জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীলগণের দৃষ্টির সম্মুখে বর্তমান বিজ্ঞানের অতি মূল্যবান ও জটিল আবিষ্কারগুলোকে পুনর্বার সযত্নে তুলে ধরে চিরন্তন-শাশ্বত ও কালজয়ী ঐশীবাণীর অপ্রতিরোধ্য 'আলোর ঝলক' দিয়ে তাদের 'ভাবাবেগকে' দূর করার নিমিত্তে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস শুরু করেছি।

এছাড়া যারা শুধু কুরআন অধ্যয়ন করেন অথচ বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন নন, এ বই তাদেরকেও ভারসাম্য জীবনের ইঙ্গিত প্রদান করবে।

আবার বর্তমান সমাজের একটি বিরাট অংশই উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করছেন। তারা না কুরআন অধ্যয়ন করেন আর না বিজ্ঞানের কাছে যান, তাদের কাছে গ্রন্থটি চমকপ্রদ মনে হবে।

যারা জীবনের অনেক চাওয়া-পাওয়াকে পরিত্যাগ করে 'সত্যকে' সমাজের বুকে জ্ঞান এবং যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চান, সেই সৌভাগ্যবান মানুষদের জন্য বইটি নিত্যসঙ্গী এবং তাঁদের চলার পথে আলোর দিশারি হয়ে কাজ করবে।

যারা এখনো অবিশ্বাসী, তাদের জন্য বইটি জ্ঞান-চক্ষু হিসেবে কাজ করবে। 'সত্য এবং মিথ্যার' মধ্যে পার্থক্য করার মতো অবস্থা ও জ্ঞান তারা লাভ করতে সমর্থ হবেন এই বই থেকে।

এছাড়াও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ভার্সিটির উদীয়মান জ্ঞান পিপাসু তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনগুলো প্রকৃত সত্যের সোনালী কিরণচ্ছটায় সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বইটি তাদেরও নেহায়েত প্রয়োজন।

আমি পেশাগতভাবে বিজ্ঞানী বা গবেষক নই, তবে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সবসময়ই বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী ছিলাম। একজন বিশ্বাসী হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত প্রায় এক যুগের চেয়ে বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উপর যা কিছু সংগ্রহ করেছিলাম তাকে সম্বল করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে পথচলা শুরু করেছি।

এ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে যাদের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে খাটো করতে চাই না। শুধু প্রার্থনা থাকলো দয়াময় আল্লাহ্ যেন তাদেরকে এর উত্তম বিনিময় উভয় জগতে দান করেন। 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান' উভয় বিষয়-ই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবি জানায়। এ কারণে সকল আলোচনাকেই জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও কাঠিন্য থেকে মুক্ত করে একেবারে সাদামাটা ও সহজ-সরল স্রোতে প্রবহমাণ রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষার অলংকারহীন প্রকাশ ও ছন্দহীন বর্ণনায় সুধী পাঠকের অধ্যয়ন আহত না হয়ে বরং সাদামাটা ও সহজ-সরল প্রকাশের ভেতর দিয়েই পাঠক সমাজ মূল উদ্দেশ্য লাভে যত্নবান হবেন– এটাই লেখক হিসেবে আমার প্রত্যাশা থাকবে।

বইটি গবেষণামূলক নয় বরং তুলনা ও বিচারমূলক। তবে অধ্যয়নের পর পাঠকের বিবেকের দ্বার নিজ থেকেই 'সত্য এবং মিথ্যার' গবেষণায় খুলে যাবে। সে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রকৃত সত্যকে সত্য জেনে আলিঙ্গন করার এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ করার দায়িত্ব সম্মানিত পাঠকের উপরই থাকবে। এই বইয়ের প্রত্যেকটি অধ্যায়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর সে কারণেই কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা বা তথ্য সম্মানিত পাঠকের বুঝার স্বার্থেই একাধিক বার পেশ করা হয়েছে। আশাকরি অধ্যায়ের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তে ঐ জাতীয় পুনরাবৃত্তি সুধী পাঠকের আগ্রহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতার কারণে ভুল-ক্রটি থাকা খুবই স্বাভাবিক, যদি ক্রটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা জানালে নিজকে ধন্য মনে করবো।

পরিশেষে, আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র বালিকণা থেকে শুরু করে বৃহৎ মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, উদয়-অস্ত, এসবের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ সকল কিছুর পেছনে যে অদৃশ্য মহান কর্ম-কৌশলী সক্রিয়, সেই চরম ও পরম 'সত্তাকে' জ্ঞানের মাপকাঠিতে যেন আমরা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারি এবং তাঁরই সম্মুখে আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ আপন 'মস্তক'কে অবনত করে দিয়ে ধন্য হতে পারি, বইটিকে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার তৌফিক যেন তিনি দান করেন, এই প্রার্থনাই পেশ করছি। আমীন!

১০ সেপ্টেম্বর, ২০০১ **মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন**
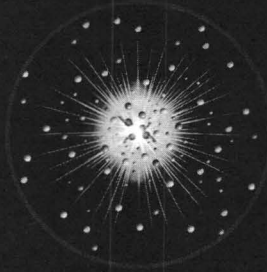
আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১
কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব
বিগ-ব্যাংগ
মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন
সম্পাদনায়
প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

প্রারম্ভিক ভাবনা

দিনের বেলায় প্রখর সূর্যের কিরণে আলোকোজ্জল, রাতের বেলায় চাঁদের সোনালী আভায় উদ্ভাসিত গাছ-পালা, তরু-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ও সাগর-মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত এই নয়নাভিরাম বসুন্ধরায় মানবসম্প্রদায়ের আবির্ভাবের প্রথমক্ষণ মুহূর্ত থেকেই সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি, গ্রহ-উপগ্রহসহ সকল জীব ও উদ্ভিদ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে ভাবতে, চিন্তা করতে ও ধারণা করতে মানুষ কখনও পিছপা হয়নি। তবে এই ভাবনা চিন্তা বা ধারণা প্রতিটি যুগের বা কালের পরিবেশ পরিস্থিতি ও সাজ-সরঞ্জামের ওপরই যে বেশি নির্ভরশীল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনি 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকে উদ্ধৃত বিবরণগুলো পাঠ করলে সহজেই দেখতে পাবেন যে, যে যুগে মানুষের সম্মুখে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়ায়নি, সে যুগে মানুষ নিজের কল্পনায় তৈরী কিম্ভুত-কিমাকার দেব-দেবীর ঘাড়ে মহাবিশ্ব, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টির নানান ধরনের কল্পিত কাহিনী চাপিয়ে দিয়ে সাময়িকভাবে প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টাই শুধু করেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চীন, জাপান, পাক-ভারত, গ্রীক, ব্যবিলনীয়, মিশরীয়, পারসিক কোন জাতিই এ অবস্থা হতে অব্যাহতি পায়নি।

কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে যখন 'জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর আলো গোটা পৃথিবী জুড়ে উদ্ভাসিত হতে থাকলো, তখন মানুষ পূর্বের অন্ধকার যুগের ধ্যান-ধারণা বর্জন করে জ্ঞানেব আলোতে নতুন করে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় রত হলো। ফলে আজকের দিন পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে বাস্তবভাবে এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হয়েছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মহল কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে একই সাথে মহান সৃষ্টি কৌশলীর বাণী যা ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরব মরুভূমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে

একত্রিত করে নিরক্ষর (উম্মী) নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তা পরম সত্য বলে বৈজ্ঞানিক দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও নতুন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।
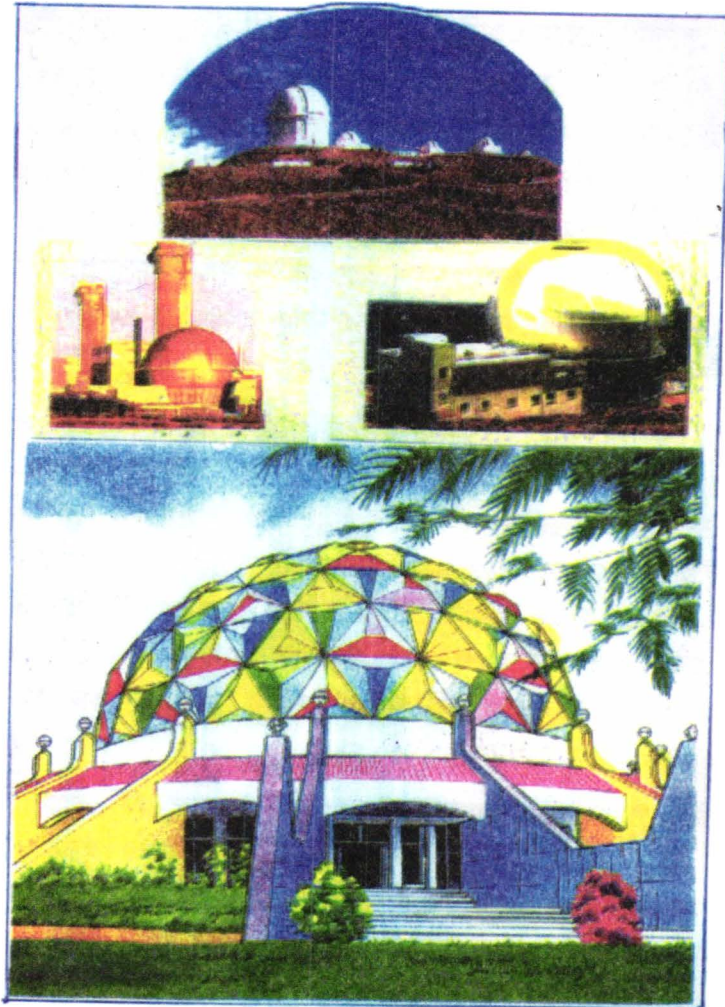
চিত্র ঃ ১

বিশ্বব্যাপী বর্তমান আধুনিক 'আকাশ পর্যবেক্ষণকারী মানমন্দির' এবং সর্বাধুনিক 'বিজ্ঞান গবেষণাগার', যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে পূর্বের কাল্পনিক সকল প্রকার ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটাতে সফল হয়েছে।

এখন যদি মানুষের কাল্পনিক দেব-দেবীর কল্পকাহিনীগুলো একপাশে রেখে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা এ মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে এ ব্যাপারে চারটি প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে।

চিত্র ঃ ২

বর্তমান উন্নততর প্রযুক্তির কল্পনাতীত সাফল্য মহাবিশ্বের জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সত্য উদঘাটনে এগিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়করভাবে।

প্রস্তাব চারটি হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ 'এই মহাবিশ্ব কোন স্রষ্টাবিহীন সম্পূর্ণ শূন্য হতে আপনা-আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে'।

দ্বিতীয়তঃ 'বর্ণনাতীত বিশৃংখলা থেকে দৈবক্রমে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে'।

তৃতীয়তঃ 'আদৌ এই মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন হয়নি। অনন্তকাল থেকেই মহাবিশ্ব বিদ্যমান আছে এবং অনাদিকাল পর্যন্ত তা বিরাজমান থাকবে'।

চতুর্থতঃ 'যেভাবেই হোক এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।

এখন আমরা উল্লেখিত চারটি প্রস্তাবকে যুক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করার চেষ্টা করবো যাতে করে 'সত্য এবং সঠিক' প্রস্তাবটি সকল কুয়াশা, অন্ধকার ও সমস্যাবলীর ভিতর থেকে স্পষ্ট আলোতে বেরিয়ে আসতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র মানবমন্ডলীকে সেই সত্যের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান পৌঁছাতে পারে।

প্রথম প্রস্তাব

'এ মহাবিশ্ব কোন স্রষ্টাবিহীন সম্পূর্ণ শূন্য থেকে আপনা আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই **সৃষ্টি** হয়েছে'।

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'প্রিন্সটন' বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক 'রনক্লিন' বলেনঃ পদার্থের সংযোজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ থেকেই হঠাৎ করে জীবনের স্পন্দন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই, যতটুকু সম্ভাবনা আছে একটি মুদ্রাণালয়ে (ছাপাখানায়) হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসার'।[১]

বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানের ব্যাপক প্রসারতা ঘটার কারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ নৈপুন্যের অধিকারী বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও

---

১. 'চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব।'

অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি, তার অস্তিত্ব, তার ব্যবস্থা, নীতি-নিয়ম, তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বস্তুর গঠন প্রকৃতি এবং যে জ্ঞান ও উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ তাদের মূলে সক্রিয় রয়েছে, সে সবের যদি কোন যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হতে পারে, তবে তা হলো এই সবই একজন মহাজ্ঞানী মহান কৌশলীর নিজ তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি। আর এর সবচাইতে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হলো যে, এই সবই নিজে নিজে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বস্তু এবং শক্তি নিজেদের জন্য প্রাকৃতিক আইন তৈরী করে তার অধীনে চলছে এবং তারা নিজেরাই চূড়ান্ত কার্যকারণ নির্ধারিত করে নিয়েছে। এর চাইতে অদ্ভূত ব্যাপার আর কি হতে পারে? কোন ব্যবস্থাপক ছাড়াই একটি ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাওয়া এবং চালু হয়ে যথাযথভাবে কার্যাবলী সম্পাদন করা, তাও আবার মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর থেকে বিরামহীনভাবে, এটা এমন একটি ব্যাপার যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না।

শুধু একটি ব্যাপারেই লক্ষ্য করুন, আমিষ উপাদানগুলি (Protein) সকল জ্যান্ত জীবকোষের বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান। এই আমিষ উপাদান পাঁচটি মৌলিক পদার্থ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন
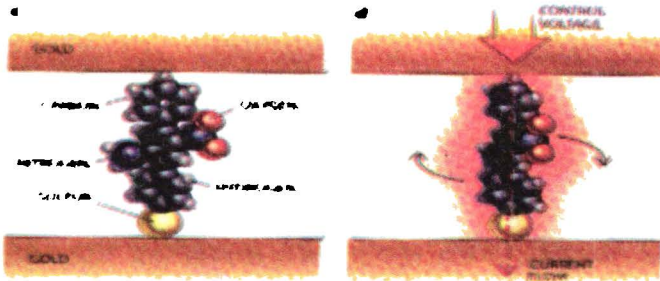
চিত্র ঃ ৩

কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার সমন্বয়ে আমিষ অণু গঠিত। এরাই জীবনের মূল ভিত্তি রচনা করেছে।

ও সাল্‌ফার সমন্বয়ে গঠিত। অনেক ভারী একটি অণুতে প্রায় (৪০,০০০) চল্লিশ হাজার পরমাণু থাকে। যেহেতু আমাদের ভূ-পৃষ্ঠে এ পর্যন্ত (১১২)

একশত বারটি মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়েছে এবং প্রথম প্রস্তাবের প্রস্তাবকদের কথামত সবই যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে, তখন বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানের বদৌলতে একটি অণু সৃষ্টি করার জন্য এই পাঁচটি মূল উপাদানের একত্রে মিলিত হওয়ার কতটা সুযোগ আছে, এ জন্যে কি পরিমাণ পদার্থ একত্রে সংরক্ষণ ও নড়াচড়ার প্রয়োজন এবং এই কাজ সম্পন্ন হতে কতটা সময়ের দরকার সবই হিসেব করা যেতে পারে। সুইজারল্যান্ডের গাণিতিক 'চাল্স ইউজিন গাই' এই গণনা সম্পন্ন করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন যে এমনি সুযোগের চাইতে অসুযোগের সংখ্যা হচ্ছে ১-এর অনুপাতে $১০^{১৬০}$। অর্থাৎ, ১০কে ১০দিয়ে ১৬০ বার গুণ করার পর যে অবিশ্বাস্য বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে (যা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার) তার মধ্যে মাত্র একবার এমনি ধারা মিলিত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। একবার যদি বলা যায় 'হাঁ', তাহলে ১-এর পরে ১৬০টি শূন্য বসিয়ে যে কাল্পনিক বিরাট সংখ্যা হবে, ততবার বলতে হবে 'না'।

এরপর আমিষ উপাদানের একটিমাত্র অণু সৃষ্টি করার জন্য যে পরিমাণ পদার্থের নাড়াচাড়ার প্রয়োজন রয়েছে তার পরিমাণ সমগ্র মহাবিশ্বের পদার্থের পরিমাণের চাইতে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি। তারপর একমাত্র এই পৃথিবীতে অনুরূপ একটি অণু সৃষ্টি হতে বহু বহু প্রায় সীমাহীন লক্ষ-কোটি $১০^{২৪৩}$ বছরের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ, ১ লিখে তার ডান দিকে ২৪৩টি শূন্য বসিয়ে যে সীমাহীন বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে, ঠিক তত বৎসরের প্রয়োজন হবে। মনে রাখতে হবে শুধু একটি আমিষ অণু সৃষ্টির জন্য এই সময়ের প্রয়োজন পড়বে।

তারপর এ্যামাইনো এসিড থেকে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আমিষ উপাদান সৃষ্টি হয়। যেভাবে এই প্রক্রিয়া একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি কোন কারণে এই প্রক্রিয়ায় একটুখানি ব্যতিক্রম হয় তাহলে তা বিষ (Poison) তুল্য হয়ে যাবে এবং তখন জীবন রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। ইংলান্ডের 'অধ্যাপক জে, বি, ল্যাথস্' হিসেব করে দেখেছেন—একটি সাধারণ আমিষ উপাদান সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাকে লক্ষ-লক্ষ উপায়ে ($১০^{৪৮}$) অর্থাৎ, ১ লিখে তার ডান দিকে ৪৮টি শূন্য বসিয়ে যে বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে ততবার

একত্রিত করা যেতে পারে। কিন্তু আমিষ উপাদানের একটিমাত্র অণু সৃষ্টি করার জন্য এইসব সুযোগের যুগপৎ মিলন ঘটানো সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব।
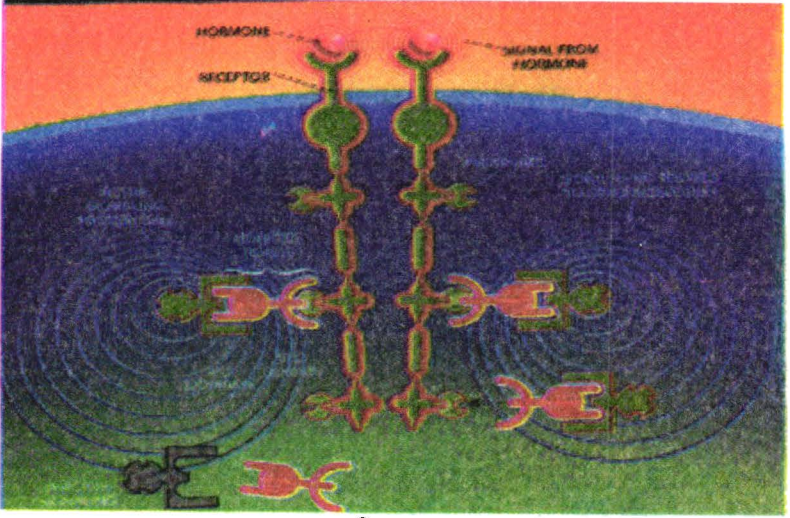
চিত্র ঃ ৪

এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে আমিষ উপাদান (Protein) সৃষ্টি হয়।
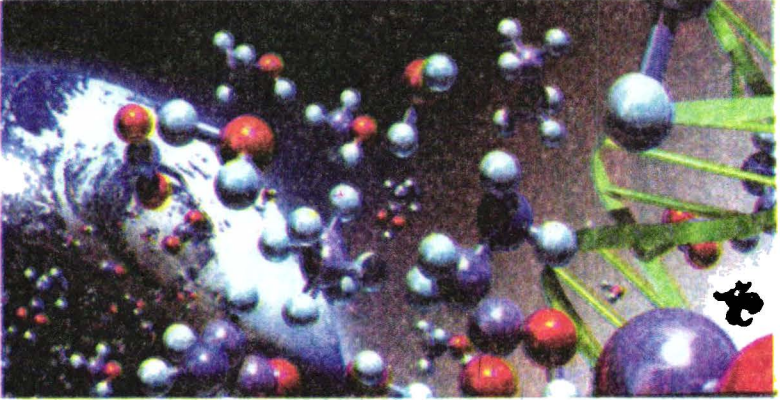
চিত্র ঃ ৫

প্রাণহীন আমিষ উপাদানগুলো অদৃশ্য জগত থেকে প্রাণলাভের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

এরপরও কথা থেকে যায়–বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে আমিষ উপাদানগুলো প্রাণহীন। কেবল যখনই অদৃশ্য জগত থেকে রহস্যজনকভাবে প্রাণ এই উপাদানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখনই তারা জীবিত হয় এবং প্রাণের আধার হিসাবে কর্মতৎপর হয়।
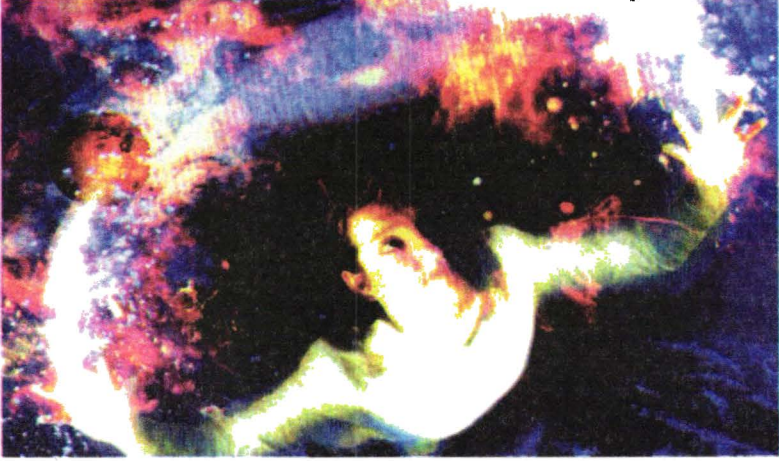
চিত্র ঃ ৬

অদৃশ্য থেকে রহস্যজনক প্রাণ লাভের পরেই আমিষ উপাদানগুলো জীবনময়গ্রহে প্রাণের আধারের ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে। প্রাণীজগত আজ সত্যই নিজেদেরকে ধন্য মনে করছে মহান স্রষ্টার অকল্পনীয় সৃষ্টি নৈপুণ্যের যাদুময়ী কীর্তিকলাপ দেখে।

এই যদি হয় সামান্য একটি আমিষ অণু সৃষ্টির পেছনে প্রমাণিত বাস্তব রহস্য, যা জ্ঞানবান মানবসম্প্রদায়কে নীরবে বলে যায় যেন ক্ষুদ্র একটি অণু যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না, জীবন্ত হতে পারে না অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ব্যতীত, সে অবস্থায় গোটা মহাবিশ্ব কি করে নিজ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টি হতে পারে?

অতএব, কোন প্রজ্ঞাবান ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ধী-শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কি একথা বিশ্বাস করা সম্ভব যে, অনুভূতিহীন–প্রাণহীন জড়পদার্থ

আপনা আপনি নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং সবক্রম ও আইনাবলী নিজেরাই নিজেদের ওপর তৈরী করে আরোপ করেছে, তারপর দৈবক্রমেই তাদের ওপর তা আরোপিত আছে? নিশ্চয়ই এর জবাব হচ্ছে 'না'। কারণ শক্তি যখন নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয় তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত আইনানুগভাবে অগ্রসর হয় এবং রূপান্তরের ফলে যে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় তা ইতোপূর্বে বিদ্যমান পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব আইনেরই অধীন হয়।

মানুষ মরণশীল। এই মরণশীল মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের বিস্তারও তাই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মানুষকে মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশি জ্ঞান দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মানুষকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী কখনই করা হয়নি। এই পৃথিবীপৃষ্ঠে মহাবিশ্বের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে এবং সৃষ্টির ভিতর স্রষ্টাকে উদ্‌ঘাটন করতে যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন, ঠিক সে পরিমাণ জ্ঞানই মানুষকে সরবরাহ করা হয়েছে। এর বাইরে তাকে অসীমত্বের জ্ঞান দেয়া হয়নি।

বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য উদাহরণ পেশ করে বলা যায়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন সাগরের পানিতে নানা ধরনের জলজপ্রাণী বাস করে এবং তাদের পাশাপাশি মানুষের তৈরী 'পারমাণবিক সাবমেরিন'ও বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। তাই বলে, ঐ সকল জলজ প্রাণী বা মৎস্যগুলো কি কখনও জানতে বা বুঝতে পারে যে তাদের পাশাপাশি অবস্থানরত ঐ 'পারমাণবিক সাবমেরিনটি' ইচ্ছা করলে গর্জে উঠে নিমিষের মধ্যেই একটি মহাদেশ পারমাণবিক মিশাইলের আঘাতে ধ্বংস করে দিতে পারে? জলজ ঐ প্রাণীগুলোর পক্ষে পারমাণবিক সাবমেরিনটির কর্মক্ষমতা বুঝা কক্ষণই সম্ভবপর হবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সেই জ্ঞান দেননি। এ ব্যাপারে জলজপ্রাণীগুলো যত রকমের চেষ্টা সাধনাই করুক না কেন, তাদের সকল কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। মৌলিকভাবেই যে জিনিস থেকে যাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, তা লাভ করার চেষ্টা সফলতা বয়ে আনবে না; বরং ব্যর্থতাই ডেকে আনবে বেশি।
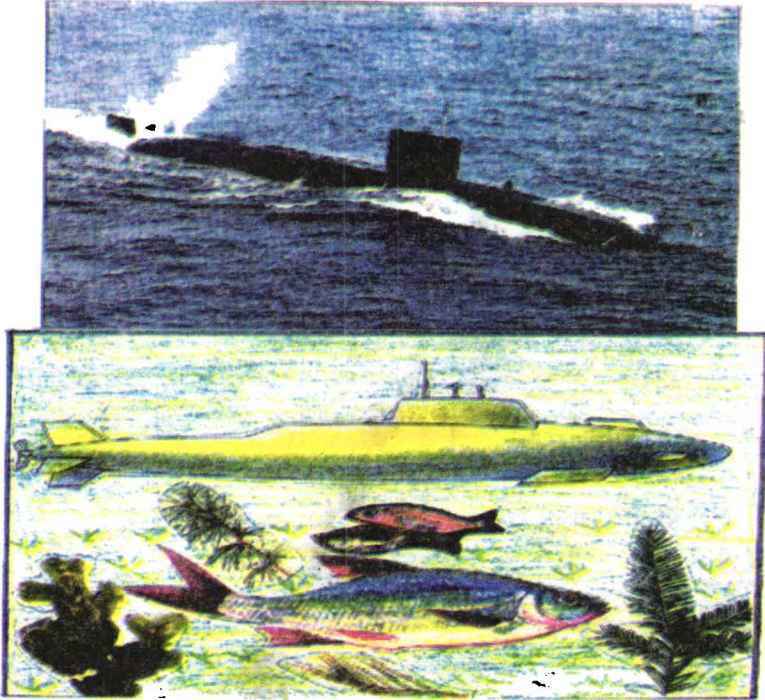
চিত্র ঃ ৭

একই পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থান করার পরও মৎস্যগুলো তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে কখনোই জানতে পারবে না 'সাবমেরিন' কি এবং কোন কাজের জন্য তাকে তৈরী করা হয়েছে। বাস্তবতার আলোকে মৎস্যগুলোর সেই জ্ঞানের প্রয়োজনও নেই, সম্ভবত সেই কারণেই তাদেরকে ঐ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

আবার দেখুন, সমগ্র আকাশময় বিভিন্ন ধরনের রং-বেরংয়ের অসংখ্য পাখী ডানা মেলে মনের প্রশান্তিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ বিমানগুলোও উড়ে যাচ্ছে। আপনি বলুনতো, একই আকাশ জগতে পাশাপাশি পাখী এবং যুদ্ধ বিমান উড্ডয়নের পরও পাখী কি কখনও ইচ্ছা করলেও তাদের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারবে যে,

এই যুদ্ধ বিমানগুলো একটা দেশকে ধ্বংস করার মত ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বহন করে উড়ে বেড়াচ্ছে? তা কখনই পারবে না। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা পাখীকে সে জ্ঞানের অধিকারী করেননি। আর তাদের সে জ্ঞানের প্রয়োজনও নেই।

চিত্র ঃ ৮

মুক্ত আকাশে প্রচন্ড শব্দের সৃষ্টি করে উড়ে যাওয়া যুদ্ধ বিমানগুলো দেখে মনের আনন্দে ডানা মেলে উড়ন্ত পাখীকুল ঈর্ষান্বিত হলেও যুদ্ধ বিমান সম্পর্কে সঠিক কোন জ্ঞান তাদের নেই। এ ধ্বংসাত্মক ভয়ংকর যুদ্ধ বিমানগুলো মানবসমাজের কি পরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে শত চেষ্টা করেও সে তথ্য পাখীকুল কখনই নিজ জ্ঞানের সীমায় লাভ করতে পারে না। এটা এক বাস্তব এবং স্বীকার্য ব্যাপার।

একইভাবে ইচ্ছা করলে আপনি আরো দেখতে পারবেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য রক্ষিত পারমাণবিক বোমার পাশাপাশি মাটির ওপর বিচরণকারী অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণী জীবন ধারণ করছে। তারা কি ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারে যে, একটু পরেই পৃথিবী কাঁপানো প্রচন্ড পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কারণে ঐ এলাকার আশপাশের বেশ কয়েক মাইলব্যাপী মাটির ওপরে বিচরণশীল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসংখ্য প্রাণী প্রচন্ড তাপ-বিকিরণের কারণে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? বুঝতে পারবে না। কারণ তা জানা বা বুঝার জ্ঞান তাদের নেই। সেই জ্ঞান থেকে তারা

বঞ্চিত। আপনি নিজেই বলুন, এই বাস্তব উদাহরণগুলো কি অস্বীকার করা যায়? যায় না।
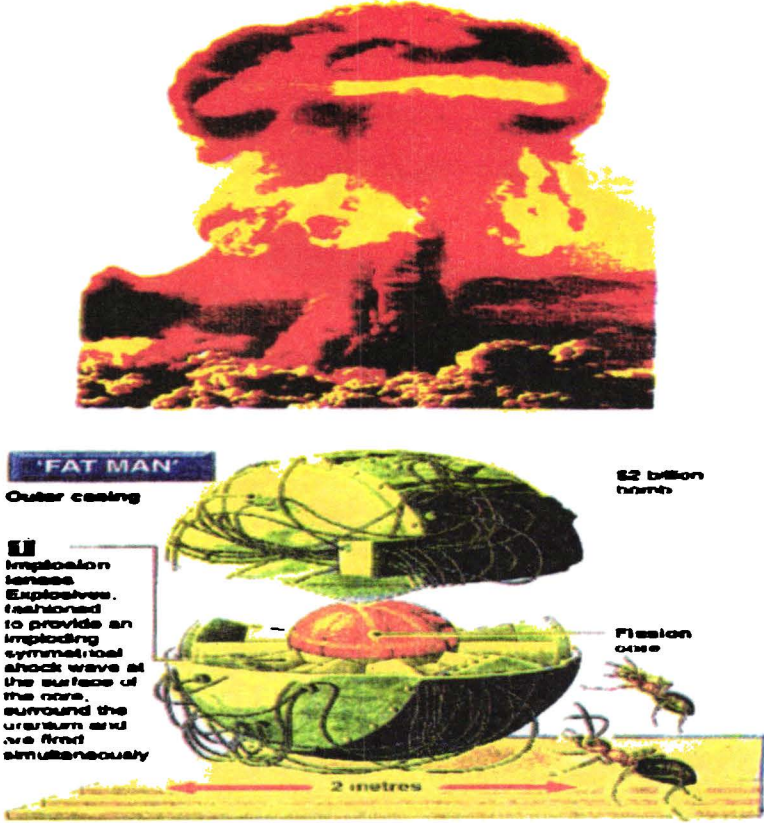
চিত্র ঃ ৯

ভয়ংকর দুনিয়া কাঁপানো পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পূর্বে এর নিকটবর্তী ক্ষুদ্রকীট পতঙ্গগুলো জানে না যে, একটু পরেই কত প্রচন্ড ধ্বংসলীলা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে জ্ঞান তাদের নেই।

অনুরূপভাবে আমরা মানুষ এই মহাবিশ্বে বাস করছি ঠিকই, তাই বলে প্রায় (২০,০০০) বিশ হাজার বিলিয়ন আলোকবর্ষ (Light Years) নিয়ে বিস্তৃত কল্পনাতীত এই বিরাট ও বিশাল মহাবিশ্বের সকল ব্যাপারেই কিন্তু জানা ও বুঝার বা দেখার জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেয়া হয়নি। যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আমরা মানুষ হিসাবে লাভ করেছি, ঠিক সে

বিষয়ে ততটুকুই আমাদের জ্ঞানের অগ্রযাত্রা ঘটবে। এর বেশি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেও সফলতা লাভ করা যাবে না; বরং সাত অন্ধের হাতী দর্শনের অবস্থাই বার বার প্রমাণিত হবে। যে বিষয়ে আমাদের সৃষ্টিগতভাবে জ্ঞানের কমতি রয়েছে, সে বিষয়ের আলোচনাতে গিয়েই আমরা জ্ঞান এবং যুক্তির পথ পরিহার করে আন্দাজ এবং অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করি। যার পরিণতিতে সত্য আমাদের ধরাছোঁয়ার অনেক দূরে সরে যায়। সত্যদর্শন হয়ে পড়ে সুদূরপরাহত।

চিত্র ঃ ১০

আমাদের এই 'মহাবিশ্ব' মানব ইতিহাসে জ্ঞানের আওতায় সবচেয়ে বড় 'বিস্ময়ের বিস্ময়' হয়ে বিরাজ করছে। সমগ্র মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র বালু কণার মত মানও পায় না। ব্যক্তি মানুষের তো প্রশ্নই আসে না। বর্তমান সময় পর্যন্ত যেখানে মানুষ তার ক্ষুদ্র 'সৌর পরিবারের' সবার কাছে স্ব-শরীরে এখনো পৌঁছতে পারেনি, সেখানে গ্যালাক্সী, ক্লাস্টার ও মহাবিশ্ব ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে দর্শন লাভ করার এবং তাঁর হাতের কাজকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অযৌক্তিক আবদার পেশ করা বোকামীই বলা চলে।

আমাদের মাঝে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিত্বই নিজের জ্ঞানের দোহাই দিয়ে মাঝে মধ্যে এমন ভাবসাব দেখায়, মনে হয় যেন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমরা বিরাট-বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পড়েছি।

অবশ্যই আমাদের জানা দরকার প্রকৃতই মানুষের জ্ঞানের বিস্তার কি পরিমাণ হতে পারে? বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান সত্য-সত্যই বিস্ময়কর সাফল্য বয়ে এনেছে যা প্রশংসার দাবীদার। বিজ্ঞান তার সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে প্রকাশ করেছে যে, হাবল্ স্পেস্ টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope) দিয়ে মহাকাশের দূর-দূরান্তের বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে এই দূরবর্তী পর্যবেক্ষণের সীমানা কোন ভাবেই তের হাজার (১৩,০০০) মিলিয়ন আলোক বর্ষের বেশি নয়। এই তের হাজার মিলিয়ন (তেরশত কোটি) আলোকবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এক একটি গ্যালাক্সি গড়ে প্রায় এক লক্ষ (১০০,০০০) আলোকবর্ষ ব্যাপী জায়গা নিয়ে মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে আছে। আবার প্রতিটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় বিশ হাজার (২০,০০০) কোটির উপরে নক্ষত্র অবস্থান করছে।
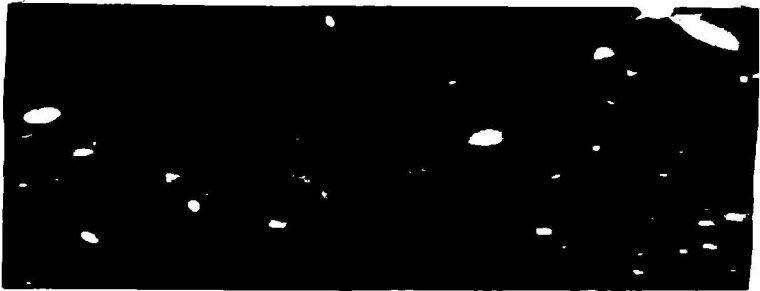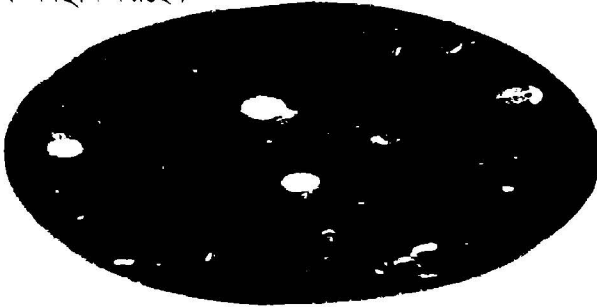
চিত্র ঃ ১১

মূল মহাবিশ্বের কল্পিত ছবি থেকে একটি বিন্দুকে তুলে এনে বর্ধিত করতে পারলে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে শত শত গ্যালাক্সী, যে গ্যালাক্সীগুলোর একটিতেই গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটির ওপরে নক্ষত্র বাস করে। প্রতিটি গ্যালাক্সী আবার গড়ে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ স্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এ পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রায় ১০০ কোটির মত গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছে, তাও মূল মহাবিশ্বের মাত্র দশভাগ আয়তনের মধ্যে (অনুমাণকৃত)। তাই মূল মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষ তার স্বল্প জ্ঞান দিয়ে কখনই পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আমাদের গ্যালাক্সীর নাম হলো 'মিলকি ওয়ে' (Milky Way)। এতে প্রায় বিশ হাজার কোটির চেয়েও বেশী নক্ষত্র বিদ্যমান। আমাদের পার্শ্ববর্তী নিকটতর গ্যালাক্সীর নাম হলো 'এন্ড্রোমিডা' (Andromida), তার মধ্যে নক্ষত্রের সংখ্যা হলো প্রায় ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) কোটি।

বর্তমান যে যুগে আমরা বিজ্ঞানের বড় ধরনের সফলতার দাবী জানাচ্ছি, সে যুগেই, সেই বিজ্ঞানীরাই আবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিশ্ববাসীকে অবহিত করছেন যে, 'হাবল্ স্পেস্ টেলিস্কোপ' দিয়ে যে ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত তারা মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এই সীমানার ভেতর যে ১০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছেন, তা কিন্তু মূল মহাবিশ্বের মাত্র ১০ ভাগ প্রায় (অনুমানকৃত)। অর্থাৎ, মানুষ সর্বশেষ প্রযুক্তি (Technology) দিয়েও মহাবিশ্বের মাত্র ১০% পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, যার অবস্থান মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে সংকুলান হচ্ছে না। মহাবিশ্বের বাকী ৯০% এখনও মানুষের বর্তমান প্রযুক্তির বাইরে রয়ে গেছে। মানুষ প্রকৃতই মহাবিশ্বের বাকী কতটুকু উদ্ধার করতে পারবে তা কেবল সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তবে বিজ্ঞান বড় একটা আশাবাদী নয়। কারণ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে ১০,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের বস্তুর গতিবেগ প্রায় ৯০,০০০ মাইল/সেকেন্ড। আর ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের বস্তুর গতিবেগ হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় আলোর গতির সমান (১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ড)। ফলে ঐ দূরত্বের পর কোন বস্তুর আলো আর কখনও পৃথিবীর দিকে আস্তে পারবেনা এবং পৃথিবী থেকেও তাদেরকে একই কারণে আর দেখা যাবেনা। অর্থাৎ, এই হিসাবে আমাদের নিকট পরিস্কার হয়ে গেল যে মানুষ ইচ্ছে করলেও মূল মহাবিশ্বের ১০০ ভাগের মধ্যে ১০ ভাগের বেশি মহাশূন্যকে নিজেদের পর্যবেক্ষণে কখনই আনতে পারবে না।

আমাদের সূর্যকেন্দ্রিক এই সৌরজগতটি আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের তুলনায় একটি বিন্দুর সমতুল্য, এর বেশি নয়। অথচ এই বিন্দুতুল্য সৌরজগতের

ভিতরেই আমরা আজ পর্যন্ত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্ব-শরীরে পৌঁছতে পারিনি। মহাবিশ্বের বিশাল জায়গার অন্য কোথাও পৌঁছাতো পরের স্বপ্ন। তাছাড়া বর্তমান রকেট প্রযুক্তি দিয়ে কখনই গ্রহান্তরে পাড়ি জমানো যাবে না। কারণ মহাকাশের বিস্তৃতি এতই বিশাল যে তা (রকেট) দিয়ে মানুষ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে সৌরজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছুতে হায়াত শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মিশন শেষ করতে পারবে না। গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সী সফরের তো প্রশ্নই আসে না, কারণ আলোর গতিতে ভ্রমণ করলেও মিলিয়ন মিলিয়ন বর্ষের প্রয়োজন হবে একটি গ্যালাক্সী থেকে অপর গ্যালাক্সীতে যেতে। এভাবে একটি গ্যালাক্সী থেকে যদি অপর গ্যালাক্সী গড় দূরত্ব বজায় রাখে তাহলে আবিস্কৃত ১০০ কোটি গ্যালাক্সী মহাবিশ্বের কত বিরাট-বিশাল জায়গা দখল করে আছে? এ অবস্থায় সীমা-পরিসীমাহীন এই অকল্পনীয় প্রকান্ড মহাবিশ্বের মাঝে মানুষের অবস্থান নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য।

মহাবিশ্বের মাত্র ১০ ভাগের প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানলাভ করেই যদি ১০০ ভাগ মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী সেই অদৃশ্য মহাকৌশলীকে না দেখার অজুহাতে অস্বীকার করা হয়, বা তাঁর আনুগত্য মানা না হয়, তাহলে গোটা বিষয়টি কি জ্ঞানবান সমাজের নিকট হাঁসির খোরাক যোগায় না?

মহাবিশ্বটি বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (লাইট ইয়ার) ব্যাপী বিস্তৃত। আমাদের মস্তিস্ক কি এই ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত হতে পারবে কখনো? পারবে না। তাহলে সমগ্র মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি পরিচালনা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর ব্যাপারে অন্তত প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের থাকতে পারে না।

আসুন আমরা সংক্ষিপ্তাকারেই মানুষের 'জ্ঞান-রাজ্য' বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মেপে দেখি। সাথে সাথে এও দেখি সমষ্টিগতভাবেই মানুষ আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু জানার অধিকার রাখে কি-না।

খাদ্য লবণের ক্ষুদ্র একটি কণায় সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এটম সংখ্যা হল $১০^{১৬}$। অর্থাৎ, ১ লেখার পর ১৬টি শূন্য তার পরে বসিয়ে যে বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে তার সমান (১০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০)। অপরদিকে বিজ্ঞানের অবদানে 'ব্রেইন' বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন মানুষের মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতা তার 'নিউরনের' সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মস্তিস্কের প্রতিটি নিউরন কোষ এক একটি তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষের আদর্শ মস্তিস্ক ধারণ ক্ষমতা হলো $১০^{১১}$ বা ১০০ ০০০ ০০০ ০০০, এর বেশি নয়। তবে নিউরনের কোষের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রায় ১০০০টি ডেন্‌ড্রাইট্‌স (Dendrites) যা কার্যক্ষেত্রে মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতা নিউরনের সংখ্যার হাজার গুণ বর্ধিত করে দেয়। অর্থাৎ, সর্বসাকুল্যে একজন বুদ্ধিজীবীর মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতা দাঁড়ায় $১০^{১১} X ১০০০ = ১০^{১৪}$ বা ১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০, এর বেশি নয়।

আপনি লক্ষ্য করুন, মানুষের সমাজে বড় বড় বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞানীদের মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতার এতবড় সংখ্যাটি লবণের ক্ষুদ্রতম একটি কণার মধ্যস্থিত এটমের সংখ্যার একশত ভাগের মাত্র একভাগ। লবণ কণার এটম সংখ্যা হলো $১০^{১৬}$ বা ১০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০, এবং জানা মতে নির্দোষ লবণ কেলাসিত হয়ে থাকে এমন একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে যে, প্রতিটি ক্লোরিন ও সোডিয়ামের এটম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়–অর্থাৎ, এদের কেলাসন এক অব্যাখ্যাত অজ্ঞাত আইনের শৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলে। সম্পূর্ণ নির্দোষ লবণের একটি বিন্দু কেলাস তার এটম শৃঙ্খলায় এমন এক পদ্ধতি মেনে চলে যে, প্রতিটি এটম তার বন্ধন বিন্যাসে প্রায় ১০টি 'তথ্য তরঙ্গ' (Information bit) দ্বারা নির্ধারিত হয় ফলে এ হিসাবে একটি সাধারণ লবণ কেলাস কণা সর্বনিম্ন যে সংখ্যক তথ্য ধারণ করে তা হলো $১০^{১৬} X ১০ = ১০^{১৭}$ বা ১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০। ফলে এই চিত্রে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, একটি আদর্শ লবণের

কণায় যে এটম থাকে, তাকে 'বাইনারি বিটে' পরিবর্তন করলে তথ্যের সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তা এক হাজার বুদ্ধিজীবির বা
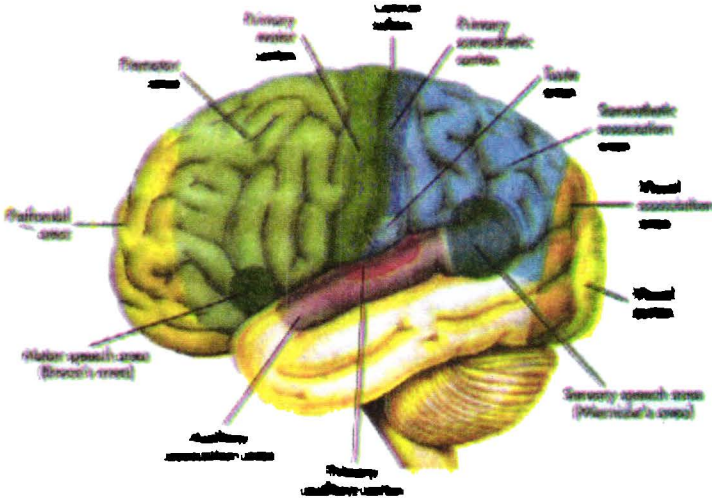
চিত্র ঃ ১২
শত বিস্ময়ের বিস্ময় মানবীয় মস্তিক! এর কর্মক্ষমতা তুলনাহীন। বর্তমান বিশ্বে উন্নততর প্রযুক্তির দুনিয়াবী উৎস হচ্ছে এই মস্তিস্ক। কিন্তু এই মানবীয় মস্তিষ্ক ছোট্ট একটি লবণ কণার সমানও জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। একটি লবণ কণা প্রায় ১০০০ বুদ্ধিজীবীর জ্ঞানের সমান তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং স্রষ্টাকে দর্শন করার মত জ্ঞান এবং দৃষ্টি শক্তি মানুষ রাখে না।

বিজ্ঞানীর মস্তিস্কের ধারণ সাধ্য জ্ঞানের চাইতেও বেশি। অর্থাৎ, কোনভাবেই আল্লাহ্ কে, তাঁর পরিচয় কি, তাঁর কোন স্রষ্টা থাকা দরকার কি-না, আল্লাহ্র পূর্বে কি ছিল? এসব বিষয়ে কোন প্রকার সমাধান উল্লেখিত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিস্ক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কিংবা বিজ্ঞানীর বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।[২] এই জন্য যে They can not on this level understand a grain of salt much less than the universe। তাই সৃষ্টিকর্তাকে সম্পূর্ণভাবে জানার প্রয়োজনে তাঁর সৃষ্টিকে প্রথমে ভালোভাবে বুঝতে হবে। সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি দৃশ্য ও অদৃশ্য এই

২. আল্-কোরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব - ১)

বিশাল বিপুল মহাবিশ্বে আদি অন্তহীন, অনন্ত অসীম গ্যালাক্সী, নক্ষত্র, নীহারিকা অধ্যুষিত এক বিশালতাকে। তাই এই বিশালতাকে বুঝার জন্য মানুষের অনুরূপ বিরাট ও বিশাল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিস্কের প্রয়োজন। আর তার সৃষ্টিকর্তাকে বুঝার জন্য আরো কত বিশাল মস্তিস্কের প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়।

এই বিষয়ে সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ বড় অসহায় বিধায় এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার কোন পথ তার জানা নেই। শত-সহস্র উপায়ে চেষ্টা করেও কোন বড় ধরনের উন্নতি সে করতে পারবে না।

বিজ্ঞানীগণ বলেছেন–সোডিয়ামের সাথে ক্লোরিন মিশালে তাদের এই রাসায়নিক বন্ধন এক অজ্ঞাত আইনের শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই অজ্ঞাত আইনটির ব্যাখ্যা অবোধগম্য যা অদৃশ্য জগত থেকে পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞান এই অজ্ঞাত আইনটিকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখে না। অদৃশ্য জগত থেকে নিয়ন্ত্রিত এই অজ্ঞাত আইনের কারণেই লবণের কেলাস জগতে অগণিত সোডিয়াম সীট, ক্লোরিন সীট, সোডিয়াম সীট, ক্লোরিন সীট, সোডিয়াম সীট, ক্লোরিন সীট, এভাবে একটার উপর আরেকটা চতুর্দিক থেকে এমনি সুবিন্যাসে ব্যবস্থিত, যার কারণে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এই মিশ্রনটি 'সোডিয়াম ক্লোরাইডে' (নির্দোষ খাদ্য লবণে) পরিণত হতে পেরেছে। উল্লেখিত সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এই বিন্যাস ব্যবস্থাপনাটি শুধুমাত্র 'তথ্য তরঙ্গ' (Information bit) দ্বারা গঠিত ও নির্ধারিত (An absolutely pure crystal of salt could have the position of every atom specified by something like 10 bits of information).[৩]

সোডিয়াম ক্লোরাইড তথা খাদ্য লবনের একটিমাত্র কণার গঠন ও বিন্যাসপ্রণালী অদৃশ্য 'তথ্যতরঙ্গ' (Information bit) দিয়ে এমন উচ্চতর জ্ঞানের ছাপ রেখে তার কার্যক্রম সৃষ্টির সেরা মানুষকে প্রদর্শন করে নীরবে যেন জানিয়ে দিল, মানুষ যতই তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বে জ্ঞানের সমারোহের তুলনায় তা খুবই নগন্য।

---

৩. আল্-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব - ১)
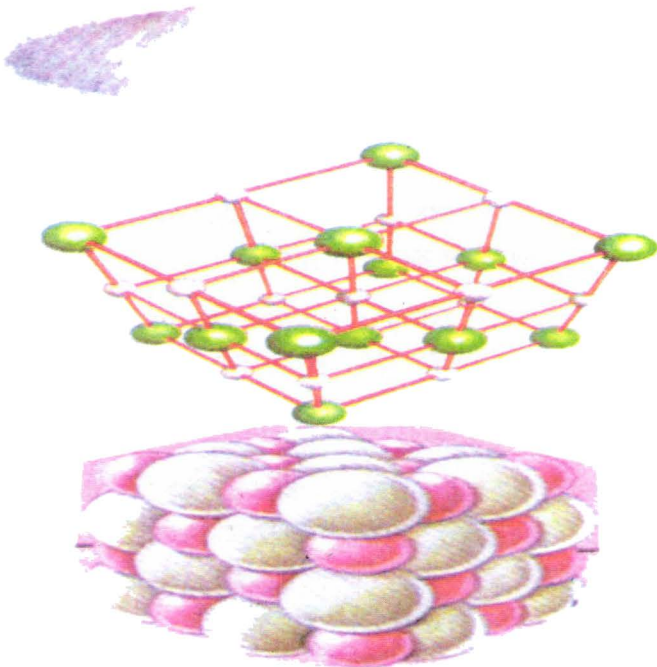
চিত্র ঃ ১৩
খাদ্য লবণের ছোট্ট একটি কণার আভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং সৃষ্টি নৈপুণ্য সৃষ্টির সেরা মানুষকেও যেন হার মানাতে চায়। নীরবে যেন বলে ঃ 'যেখানে আমার জ্ঞানের ও নৈপুণ্যতার পিছনে অদৃশ্য সত্তার আবরণমুক্ত করতে পারোনি সেখানে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে দর্শন লাভ করবে?

তাই, যে মানুষ সামান্য লবণ নামক বস্তুকণার গঠন প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য 'তথ্যতরঙ্গ' বা 'ইন্‌ফরমেশন বিটের' উৎস সম্পর্কে অবহিত নয়, সেই মানুষ যতই জ্ঞানের উৎকর্ষতার দাবী করুক, কখনও সে বস্তুর স্রষ্টা, বস্তুর 'তথ্য তরঙ্গ' সরবরাহকারী, কিংবা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণকারী সম্পর্কে সরাসরি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে না। তাঁকে জানার এবং বুঝার একটাই পথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির পরতে-পরতে তাঁকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা, যেখানে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর শক্তি-ক্ষমতা ও জ্ঞানের উপস্থিতি বিরাজমান।
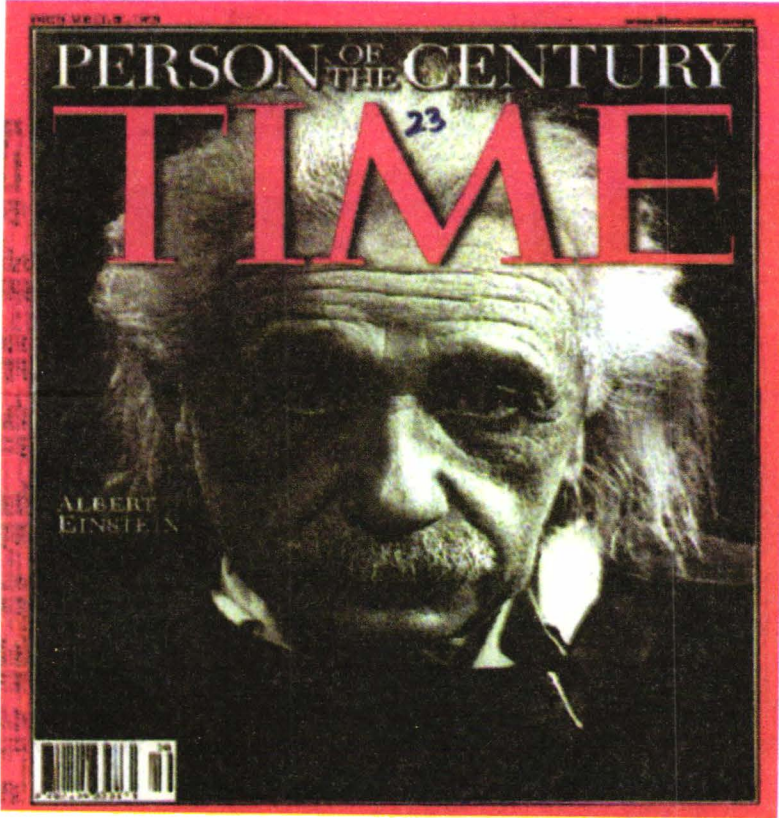
চিত্র ঃ ১৪

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আলবার্ট আইনস্টাইন'

১৯০৫ সালে 'Special theory of relativity' এবং ১৯১৬ সালে 'General theory of relativity' প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী বরেণ্য হয়ে রয়েছেন। এতবড় বিজ্ঞানী হয়েও তিনি মহা বিশ্বের স্রষ্টার সম্মুখে নিজ মস্তক অবনত করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও মহাবিশ্বের মহাজ্ঞানের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশও এ পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। তাই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী পদে ভূষিত হওয়ার পরও তিনি ধর্মভীরু রয়ে গেছেন।

চিত্র ঃ ১৫
'গোটাজীবন বিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করেও মনে হয় যেন মহাবিশ্বের জ্ঞান সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দু'একটি বালু-কণা মাত্র নাড়াচাড়া করে গেলাম'। আলবার্ট আইনস্টাইন

উল্লেখিত নগন্য জ্ঞানের কারণেই মানবসমাজের কিয়দাংশ মনে করে এই মহাবিশ্ব নিজে নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা এই মহাবিশ্বের কি রসায়ণ, কি জৈব রসায়ণ, কি পদার্থবিদ্যা সকল দিক ও বিভাগের সার্বিক কাজগুলি এতই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত ও সাজানো এবং এক কঠিন নিয়মে বাঁধা যে, তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রম এবং শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝায় বিজ্ঞানীদের নিকট তাই প্রকাশ করে থাকে। এই মহাবিশ্বের ধাপে ধাপে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা, সাজ-সজ্জা, নিয়ম এবং জ্ঞানের যে ছাপ

নজরে পড়ে তাতে কিন্তু অদৃশ্য এক সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতির শ্রেষ্টতম হাতের কাজের নিদর্শনই প্রকাশ পায়, আপনাআপনি বা নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টির কোন প্রমাণই বহন করে না।

মহাবিশ্বটি যদি সত্যই নিজ থেকে সৃষ্টি হতো তাহলে আমরা বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগেই কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলা ও ক্রমের ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ না করে বরং সর্বত্র বিশৃংখলা এবং অরাজকতাই প্রত্যক্ষ করতাম। সাথে সাথে একই নিয়মে প্রতিনিয়তই বহুজিনিস নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে দেখতে পেতাম। অথচ হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীপৃষ্ঠে নিজে নিজেই কোন কিছু সৃষ্টি হয়েছে, এমন আশ্চর্য সংবাদ মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখ নেই। উল্লেখ যা আছে তা হলো প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে একজন পরিপক্ক পরিকল্পনাকারী ও প্রস্তুতকারী রয়েছেন। পরিকল্পনাকারী এবং প্রস্তুতকারী ছাড়া কোন জিনিসই অস্তিত্ব ধারণ করতে সক্ষম নয়।

নিচের ছবিতে দেখুন একটি যাত্রীবাহী বাস, বাসটি দেখেই কি আপনার মনে

চিত্র ঃ ১৬

হবে যে শহরের মানুষের নিত্য দিনের কষ্ট লাঘব করার জন্য যাতায়াতের প্রয়োজনে নিজ থেকেই বাসটি সৃষ্টি হয়ে নিজে নিজেই চালকহীন চালিত

হয়ে সমগ্র শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে? যাত্রীদের প্রয়োজনে কখনও থামছে আবার কখনও চলছে? না-কি বাসটি দেখামাত্রই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে একটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ছবি–যারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথমে প্লান তৈরী করে পরবর্তীতে বহু শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং মেটেরিয়াল বাবত বহু অর্থ ব্যয় করে বাসটি তৈরী করেছেন? যদিও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটি আপনার স্বচক্ষে দেখার প্রয়োজন পড়েনি। এরপর একজন দক্ষ চালক সার্বক্ষণিক বাসটিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে বিধায় শহরের রাস্তায় চলার পথে প্রয়োজনমত থেমে থেমে যাত্রীদের সার্বিক সুবিধাদি দিয়ে যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয় শেষের বর্ণনার সাথেই একমত পোষণ করবেন, তাই নয় কি?

অনুরূপভাবে নিচের অন্য ছবিতে একটি যাত্রীবাহী বিমান দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ঃ ১৭

এই বিমানটি কি কোন দেশের পরিত্যক্ত লৌহসামগ্রীর স্তূপ (Scrap yard) থেকে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে পরবর্তীতে কোন পাইলট ছাড়াই নিজ থেকে চালিত হয়ে আকাশপথে বিভিন্ন দেশের যাত্রীদের নিয়ে সমগ্র বিশ্বময় উড়ে বেড়াচ্ছে? যাত্রীদের চাহিদামত বিমানটি নিজেনিজেই বিভিন্ন দেশে অবতরণ করছে এবং নিজেনিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবার আকাশ পথে ডানা মেলছে? আপনি অবশ্যই বলবেন যে, জড় পদার্থ হিসেবে বিমানটি যেমন নিজেনিজে তৈরী হতে পারেনি, ঠিক তেমনি নিজেনিজেই স্বতঃফূর্তভাবে

চালিত হয়ে আকাশে উড়তেও পারে না। এর জন্য নিশ্চয়ই একটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের নির্মাণের যোগ্যতা আছে এবং এর পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক কাজের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন রয়েছে। এ বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে মানুষ কি করে ভাবতে পারে যে, কোন স্রষ্টা ছাড়াই একটি বিমানের চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি জটিল এই মহাবিশ্ব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে আবার নিজে নিজেই নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক আইনে পরিচালিত হচ্ছে?

একইভাবে বলা যায় যে, নিচের যাত্রীবাহী 'ফেরীটি' নৌপথে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের নিমিত্তে নিজে নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র ঃ ১৮

এর কোন সৃষ্টিকারী, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনকারীও নেই। নিজ থেকেই চালিত হয়ে দিবা-রাত্র মানুষের কল্যাণসাধন করে চলেছে। মানুষের জ্ঞান-রাজ্য এ ধরনের বর্ণনার সাথে মোটেই পরিচিত নয়, আর নিয়ম-শৃংখলা ও উদ্দেশ্যমূলক এ জগতে পরিচিত না হওয়ারই কথা।

আপনি আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপনার চারপার্শ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঘড়ি, কলম, ক্যামেরা, রেকর্ড-প্লেয়ার, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেবিল লাইট, কম্পিউটার, টেবিল ফ্যান ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে

দেখুনতো, এই ধরনের কোন জিনিসই কি কখনও নিজ থেকে সৃষ্টি হয়ে

চিত্র ঃ ১৯

অস্তিত্ব ধারণ করতে পেরেছে? উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে কিভাবে মানুষ কল্পনায় স্থান দিতে পারে যে, প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত বিরাট-বিশাল মহাবিশ্বটি নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? এরপর সীমাহীন জটিলতা নিয়ে নিজেনিজেই পরিচালিত হচ্ছে? বাস্তবতার নিরিখে এ যে কখনই সম্ভবপর নয়!

আমরা যদি জৈবিক রসায়ণ বিজ্ঞানের চমৎকার জটিলতা এবং এর উপর পরিব্যাপ্ত ক্রম বা বিন্যাস লক্ষ্য করি, বিশেষ করে প্রাণীজগতে, তাহলে আকস্মিকভাবে এই সবের সৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণা পানির বুদ্-বুদের মত উবে যাবে। পদার্থ বিজ্ঞানের বেলায়ও বৈজ্ঞানিকগণ আজ যতই পরমাণুর কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করছেন, যতই তাদের 'মিথক্রিয়া' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, ততই এর পরিকল্পনাকারী ও

নমুনা প্রস্তুতকারীর প্রয়োজনীয়তা বেশি করে উপলব্ধি করছেন। পশু-প্রাণীর দেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে জৈবিক ও জৈব রাসায়ণিক কার্যরত
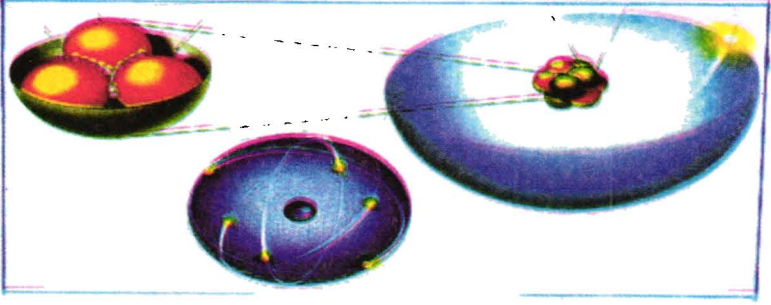
চিত্র ঃ ২০

এই মহাবিশ্বে যে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমাণু' একই পদ্ধতিতে গঠিত হয়ে একই কর্মনীতি প্রদর্শন করে চলেছে, এতে একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর জ্ঞানের প্রতিভা যে কাজ করছে তা মানবমন্ডলীর জ্ঞানরাজ্যে দোলা দেয়। 'মহাবিশ্ব' যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে-নিজেই সৃষ্টি হয়নি, মহাবিশ্বের সর্বত্র বস্তুর এই ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু-ই তার সার্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করছে।
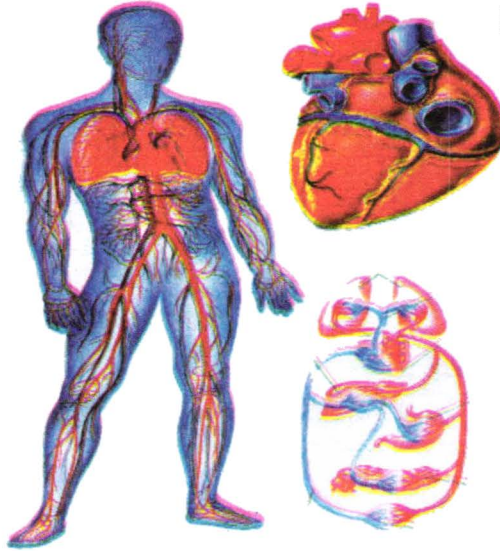
চিত্র ঃ ২১

বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ কি করে ভাবতে পারে যে এত সুন্দর অথচ লক্ষ জটিলতা নিয়ে প্রাণীকুল-জীবকুল নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? এবং নিজ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে?

প্রক্রিয়াসমূহ এতই জটিল যে, সেখানে প্রতিটি মূহুর্তে বিশৃংখলা দেখা দেয়া বা রোগের অনুপ্রবেশ মোটেই বিচিত্র নয়। এত জটিল যান্ত্রিকতাও যে কখনও
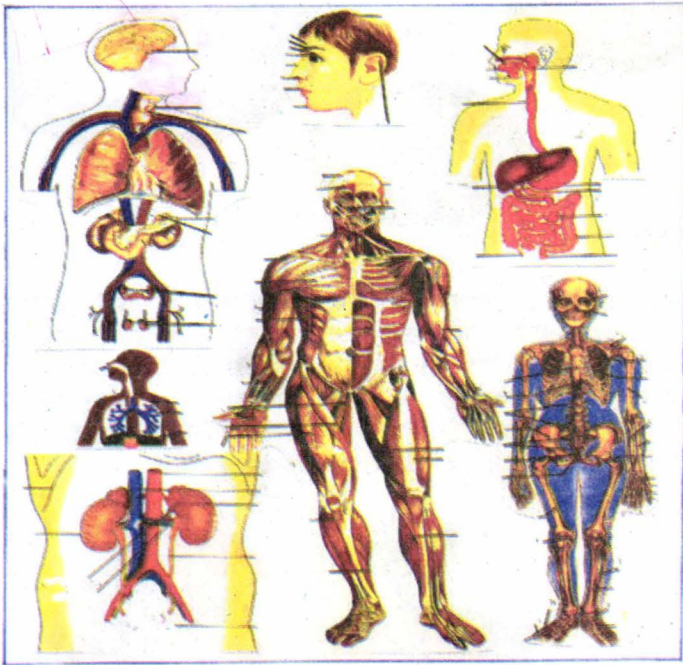
চিত্র ঃ ২২
এর পিছনে মানবীয় উৎকর্ষীয় জ্ঞান একজন দক্ষ পরিকল্পনাকারী ও সৃষ্টিকারীকেই কেবল স্বীকৃতি দেয়, একজন স্রষ্টা বিহীন নিজ থেকেই এই আশ্চর্য মানবীয় কাঠামোর অস্তিত্বকে মেনে নেয় না।

সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তা দেখে বিজ্ঞানীগণ নিজেরাই হতভম্ব হয়ে যান। তাদের কাছে সব কিছুই যেন একজন দক্ষ পরিকল্পনাকারী ও অসীম বুদ্ধিদীপ্ত রক্ষাকর্তার উপস্থিতিই সপ্রমাণিত হয়।

আমরা যদি এই ভূ-পৃষ্ঠের হাজার রকমের কীট-পতঙ্গের কথা বাদ দিয়ে শুধু মৌমাছির মৌচাক পর্যবেক্ষণ করি, তাহলেই যথেষ্ট হবে। সমস্ত দুনিয়ার যে লক্ষ-কোটি মৌচাক রয়েছে, তার প্রত্যেকটি একই জ্যামিতির পরিমাপে

সর্বাপেক্ষা যথার্থতা সহকারে সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এ সকল প্রমাণ কি স্বতঃস্ফূর্ততা, উদ্দেশ্যহীনতা ও স্রষ্টাবিহীন ইত্যাদি বক্তব্য পরিহার করে একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার মনীষার পরিচয় বহন করে না?
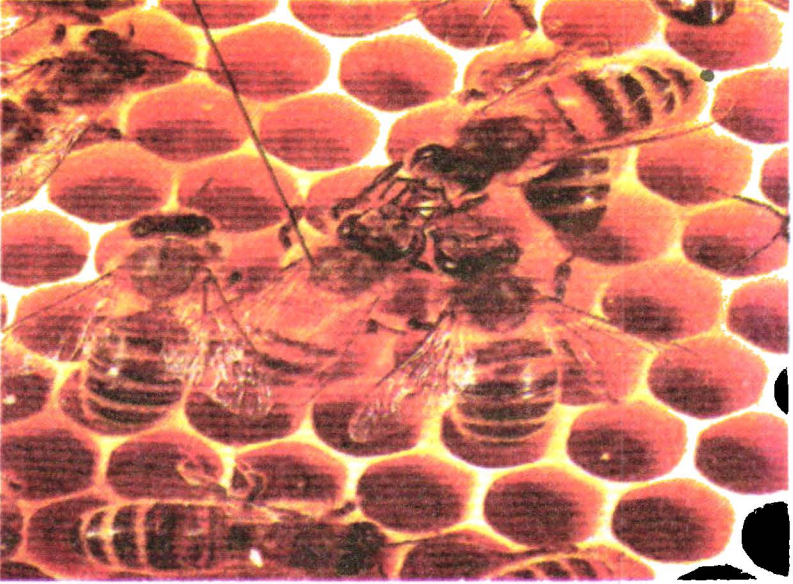
চিত্র ঃ ২৩

প্রায় ২৫,০০০ হাজার মাইল পরিধি বিশিষ্ট এই পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষুদ্র মৌমাছিগুলো একই নিয়মে, একই মাপে বাসা তৈরী করে। বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র এই পোকাগুলোর একই ধরনের জ্ঞান কি একথা প্রমাণ করে না যে, তাদের প্রাপ্তজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে আগত? নিজ থেকে সৃষ্টি হলে তাদের প্রত্যেকের জ্ঞান পৃথক-পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং মহাবিশ্ব এবং তার প্রতিটি জিনিসই নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি, বরং একজন মহাজ্ঞানী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান সত্ত্বা নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সকল ব্যাপারে কেবল সে কথাই বারংবার প্রমাণিত হচ্ছে।

তাই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা 'মেঝেতে পানি ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী হতে পারে, একথা কল্পনা করার চাইতেও অতিমাত্রায় অবাস্তব'।[৪]

দ্বিতীয় প্রস্তাব

'বর্ণনাতীত বিশৃংখলা থেকে দৈবক্রমে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, এ বিশ্ব বিভ্রম মাত্র।'

প্রস্তাবিত এ সমাধানটি নিশ্চিতভাবেই একথা প্রমাণ করে যে, একমাত্র অনেক সময় বিভ্রম বলে বিবেচিত মানব মনের চেতনা সম্পর্কিত অধিবিদ্যা সমস্যা ছাড়া শক্তির আঁধার এই বিশ্বের বিশৃংখলার ভিতর থেকে দৈবক্রমে উৎপত্তি সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় ধারণাও প্রথম চিন্তাধারার মত এতই অতিমাত্রায় অযৌক্তিক যে এর বিচার-বিবেচনাও নিস্প্রয়োজন মনে হয়। তথাপিও আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে উক্ত প্রস্তাবটিও পরখ করে দেখবো।

বিজ্ঞানময় এই জগতের যে দিকেই দৃষ্টি ফেরাই না কেন, সর্বত্র কেবল পরিকল্পনা, আইন ও শৃংখলা এবং ধারাবাহিক ক্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। অদৃশ্য হতে কোন এক মহাকৌশলী যেন সব যথাযথভাবে নীরবে সম্পাদন করে চলেছেন। কোথাও কোন বৈপরিত্য নেই। কঠিন এক নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে যেন সব বাঁধা। আমরা রৌদ্রোজ্জল পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পাশেই ফুটন্ত ফুলের আকর্ষণীয় অত্যন্ত খুটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলো যদি লক্ষ্য করি, মন দিয়ে দোয়েল-কোয়েল পাখির মিষ্টি মধুর গান শুনি, এবং খেজুরপাতা, তালপাতা দিয়ে জটিল বুনটওয়ালা বাবুই পাখীর বাসা পর্যবেক্ষণ করি, তা'হলে কি ভাবতে পারি? সব তারা দৈবক্রমেই লাভ করলো? পতঙ্গকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু, তা-কি দৈবক্রমে ফুলের মধ্যে পৌঁছেছে? পতঙ্গগুলো ফুল থেকে ফুলে উড়ে আগামী বছরে আরও ফুল জন্মাবার যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলো তাও কি দৈবক্রমে ঘটলো? অতিক্ষুদ্র পুস্পরেণু ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয়ে এই যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এটাকে কি মামুলী দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করা

৪. 'চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব।'

চলে? কোটি কোটি বছর থেকে একই পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন ছাড়াই এগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে সংঘটিত হয়ে আসছে যেখানে দৈবের পক্ষে সামান্য অংগুলি হেলানোর সুযোগ পর্যন্ত হয়নি। অথচ জ্ঞান ও যুক্তিবিহীনভাবে দাবী করা হলো এই মহাবিশ্ব দৈবক্রমে বিশৃংখলার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞানের হাজারো দৃষ্টান্ত দেখে-শুনে এ প্রস্তাবকেও মেনে নিতে রাজী হয় না।

চিত্র ঃ ২৪

প্রকৃতির মাঝে ফুটন্ত ফুলের সৌরভ, গাছে গাছে পাখীকুলের মিষ্টি-মধুর গান, সবই কিন্তু জ্ঞানপূর্ণ দৃষ্টির সামনে একজন সুনিপুন কৌশলীর হাতের কাজকে বিস্ময়করভাবে মেলে ধরবে। প্রমাণ করবে এর কোন কিছুই বিশৃংখলা বা দৈবক্রমে ঘটেনি। সকল কিছুই এক মহা পরিকল্পকের নির্দিষ্ট করা বিশেষ পরিকল্পনার অধীন মাত্র।
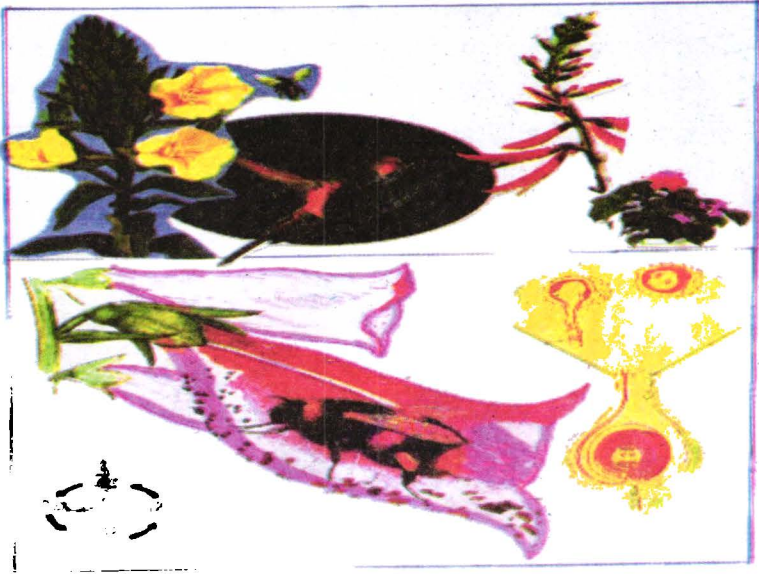
চিত্র ঃ ২৫
প্রকৃতির মাঝে ফুল এবং কীট-পতঙ্গের মেলামেশায় সুন্দরের যে আগমন বার্তা ঘোষিত হয় তাতে মহান সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির বাস্তব সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

রাতের বেলায় যদি নক্ষত্রখচিত আকাশপানে চোখ তুলে তাকাই, তাহলে সেখানকার সুশৃংখল দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিঃশূন্যের সকল জগত আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষপথে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে সময়ের সামান্যতমও হের-ফের হয় না। এরপরও কি বলা যেতে পারে যে এগুলি দৈবক্রমেই একত্রীভূত জোতিষ্ক জাতীয় পদার্থ এবং উদ্দেশ্যহীনভাবেই এগুলি আকাশ মার্গে বিচরণ করছে? যদি সত্যই তাদেরকে পরিচালনের কোন আইন না থাকে, তাহলে মানুষ কি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলিকে আকাশের অচিহ্নিত পথে পরিচালিত করতে পারবে? তা কখনই পারবে না। দৈবের প্রস্তাবকগণ যদিও বা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু তারা

এ কথা মানতে রাজী আছেন যে, জ্যোতিষ্কমন্ডলী যে কোনভাবেই হোক পরিচালিত হচ্ছে এবং এ পরিচালনা নির্ভরযোগ্য। দৈবক্রমে এদেরকে নির্দেশ দিলেও এই নির্দিষ্ট পথ থেকে সামান্যও টলানো যাবে না। শত-সহস্র, লক্ষ-কোটি মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কমন্ডলী সবই একই নিয়মের অধীন থেকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হচ্ছে। ভাবতে সত্যই অবাক লাগে যে, এ সবের পরিকল্পনাকারী কতবড় মহাজ্ঞানী সত্তা, যাঁর প্রতিষ্ঠিত আইনাবলীর কোথাও সামান্যতম তারতম্য নেই। হবার সম্ভাবনাও কল্পনাতীত। কত নিখুঁত তাঁর পরিকল্পনা, সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ!
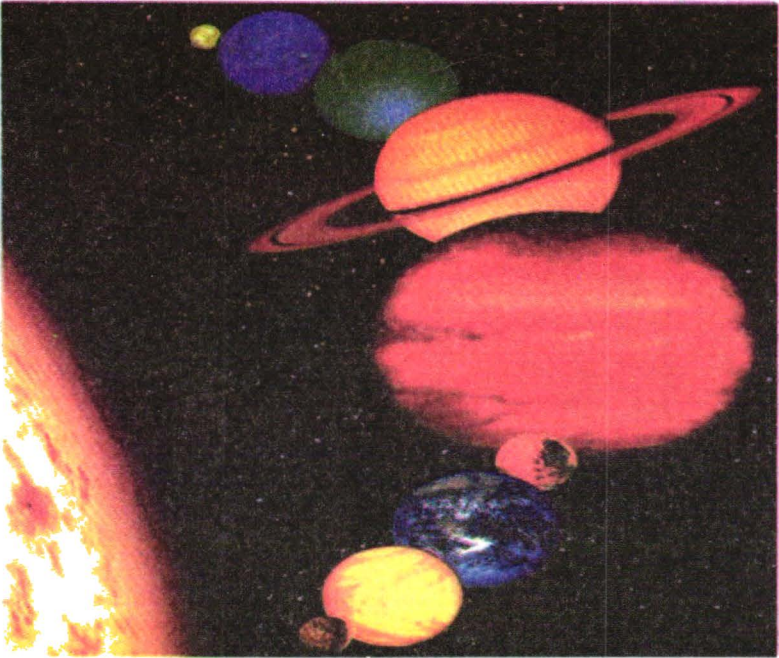
চিত্র ঃ ২৬

এই মহাবিশ্বে মহা জাগতিক প্রতিটি বস্তুই তার আকার, আকৃতি, গতি ও গঠন সবই এমন এক মহা জাগতিক সূক্ষ্ম ও কঠিন এবং ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-কানুন এর ভিতর পরিচালিত যে, কোটি কোটি বছর ধরে এই ভাবে একই নিয়মে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। অথচ কোথাও সামান্যতম পরিবর্তন, পরিবর্ধন কোন কিছুর-ই প্রয়োজন হচ্ছে না এবং বাইরের থেকে জোর করে শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। সবই যেন অদৃশ্য কোন এক সত্তার নির্দিষ্ট নিয়মের ভিতর দিয়েই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

বিচারশক্তি সম্পন্ন মূল্যবোধে পরিপূর্ণ একটি দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে নিজস্ব বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দ্বারা আমাদেরকে অবশ্যই পরমাণুর সংগঠনে, ওয়াটার সাইকেলে (Water Cycle), অক্সিজেন সাইকেলে (Oxygen Cycle), নাইট্রোজেন সাইকেলে (Nytrogen Cycle), জীব জগতের পুনঃসৃষ্টির আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়ায়, অনন্তকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শ্রেণীর জন্য সৌরশক্তি সঞ্চয় করার কাজে, গুরুত্বপূর্ণ সালোক সংশ্লেষণের কার্যক্রমের পশ্চাতে অনুরূপ বিজ্ঞ কার্যক্রম ও বুদ্ধিদীপ্ত নিয়ন্ত্রনের তাৎপর্যকে মেনে নিতেই হবে। যথার্থই কি করে আমরা এমন সব প্রক্রিয়া কোন বুদ্ধিদীপ্ত মাধ্যম ছাড়া কোন স্বেচ্ছাচারী বা দৈবের মাধ্যমে আরম্ভের কথা ভাবতে পারি?
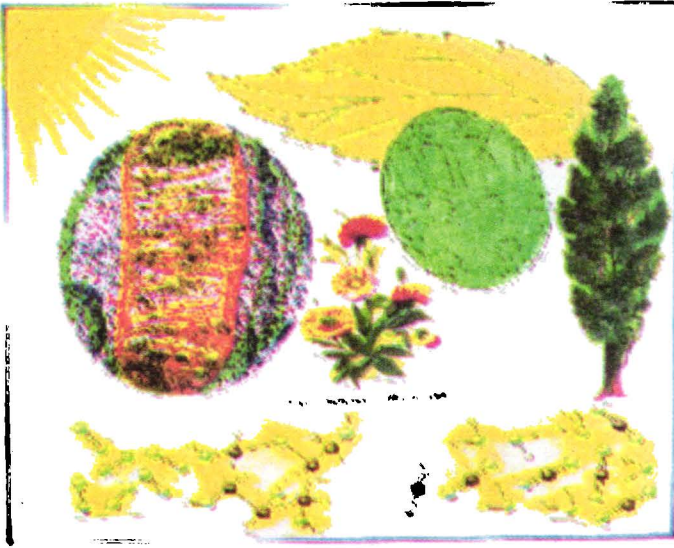
চিত্র ঃ ২৭
উদ্ভিতজগতের 'সালোক সংশ্লেষণ' পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য তৈরীর বিষয়টিও একক মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে। যেখানে দৈবের কোন স্থান নেই।

একটি ক্রিয়াশীল মহাবিশ্বের চাহিদাপূরণের জন্য যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমরূপতা ও সার্বজনীনতা, সৃষ্টি এবং পূর্ণতা, উদ্দেশ্যবাদ ও অন্তর্বৃত্তি অথবা নিত্যতা ও সমতা সম্পর্কিত পদ্ধতি কি চলে

আসতে পারে? কি করে সমগ্র প্রকৃতিতে একজন বিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা ও যিনি সর্বক্ষণ তাঁরই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছেন, তাঁর বুদ্ধি-সত্ত্বার ওপর নির্ভর না করে দৈবের ন্যায় উদ্ভট বিচার বুদ্ধিমত কাজ করা যেতে পারে? অথচ বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক বিশ্বের উপাত্তগুলি যখন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করেন তখন তাদের কাজের ভেতর দিয়ে কোন দৈবকে অবলোকন না করে বরং সেই অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতিকেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানবিদ 'লর্ড কেলভীন' যথার্থই বলেছিলেনঃ 'আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।'[৫]

রসায়ণ শাস্ত্রসহ সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গত কয়েকশত বৎসর ধরে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়ে আসছে, তা প্রধানতঃ পদার্থ ও শক্তির গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণায় অতীতে বারংবার এবং এখনও এটাই প্রমাণিত ও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অনুভূতিহীন জড়পদার্থের আচরণ পর্যন্ত আদৌ লক্ষ্যহীন নয়। অধিকন্তু তা নির্দিষ্ট 'স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন' মেনে চলে। প্রায়ই এই নিয়ম বা আইনের অস্তিত্বের কোন কারণ এবং প্রয়োগের পন্থা আবিষ্কারের অনেক আগেই আইনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করে। তবে যে সব শর্তস্বাপেক্ষে এই সব আইনকে বৈধ বলে দেখানো হয়, একবার যদি সেই শর্তগুলো জানা যায়, তাহলে রসায়ণবিদ স্থির নিশ্চিত হতে পারেন যে, উক্ত আইন ঐসব একই শর্তে অবশ্যই একই ফল লাভের জন্য কাজ করে যাবে। পদার্থ ও শক্তির ধর্ম যদি লক্ষ্যহীন হতো এবং যা কিছু ঘটবার সবই যদি দৈবক্রমে ঘটতো, তাহলে বিজ্ঞানীগণ কখনও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন না। আর যখন জানা যায় চূড়ান্তভাবে কোন আইন বিদ্যমান, কেন যেমনভাবে কাজ করা উচিত ঠিক তেমনভাবেই কাজ করে, তখন লক্ষ্যহীনতার এবং দৈব বিশৃংখলার সামান্য যেটুকু সম্ভাবনা থাকে তাও রীতিমত বিদূরিত হয়।

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ রসায়ণবিদ 'মেন্দেলেজেফ' আজ থেকে প্রায় একশত (১০০) বৎসর পূর্বে রাসায়ণিক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, তারমধ্যে একই প্রকার ধর্মের অধিকারী মৌলিক পদার্থ সংঘটনের পর্যায়বৃত্তকে যুক্তিযুক্তভাবে শুধু দৈবের ব্যাপার বলে কি অভিহিত

---

৫. 'চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব।'

করা যায়? তাই যদি হতো তাহলে তিনি যে সব মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কথা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে সেই সকল মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হলো, আবার তিনি সেইসব মৌলিক পদার্থের যেসব ধর্মের কথা আগাম বলেছিলেন, যখন তার সবই পাওয়া গেল, তখনও কি দৈব ও বিশৃংখলার পরিবর্তে এ মহাবিশ্বে এক মহাজ্ঞানী মনীষার পরিকল্পনায় সকল কিছুই নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনে সুশৃংখলভাবে সৃষ্টি হয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা–কি প্রমাণ করে না?

চিত্র ঃ ২৮

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ রসায়ণবিদ 'মেন্দেলেজেফ'

আজকের বিজ্ঞান যুগে রসায়ণবিদ 'মেন্দেলেজেফ' -এর ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত সেই মৌলিক পদার্থের বিরাট সাধারণ শ্রেণীভূক্তিকে 'দৈব পর্যায়' বা 'বিশৃংখলা'র ফল বলে অভিহিত করা হয় না, অধিকন্তু বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টিতে মহান সৃষ্টি কৌশলীর তৈরী 'পর্যায়ক্রম' বলেই উল্লেখ করে থাকেন।

অংকিত ছবিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উল্লেখিত মৌলিক পদার্থের 'পর্যায়বৃত্ত সারণী' বিশৃংখলা বা দৈবক্রমে সংঘটিত হওয়ার মত বিষয় নয়। বরং এ হচ্ছে মহাবিশ্বে আইন ও শৃংখলার চমৎকারভাবে বর্ণিত একটি পরিকল্পনা। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে অনবদ্য শৃংখলার পন্থায় এ সারণীতে সকল মৌলিক পদার্থের একটি সমাবেশ।
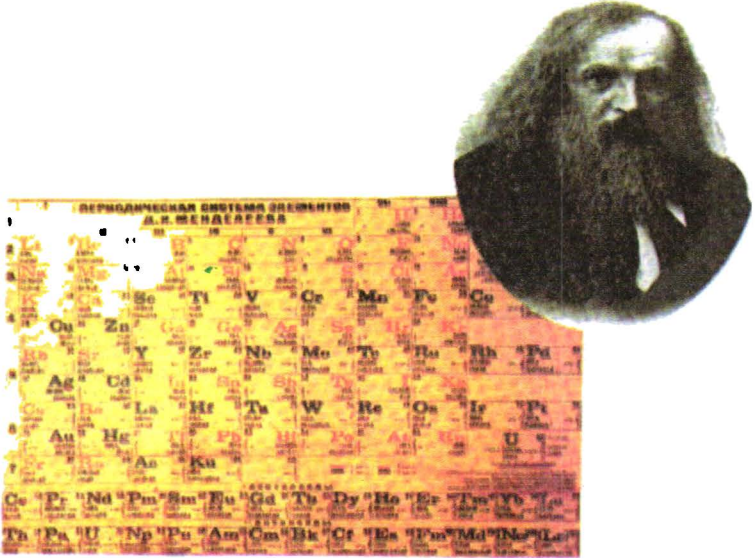
চিত্র ঃ ২৯

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ রসায়ণবিদ 'মেন্দেলেজেফ' ১৮৬৭ সালে তৎকালীন সময় পর্যন্ত আবিস্কৃত মৌলিক পদার্থসমূহের আণবিক ওজনসাপেক্ষে একটি চার্ট তৈরী করেন, বিজ্ঞান আজ সেই চার্টকে 'দৈবপর্যায়' বা 'বিশৃংখলার ফল' না বলে বরং সৃষ্টিতে পদার্থের অনবদ্য শৃংখলার 'পর্যায়ক্রম' বলে উল্লেখ করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একজন মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি-ই প্রচ্ছন্ন ইংগিত প্রদর্শন করে চলেছে।

কিভাবে একই রকম ধর্মের (গুণাবলী বা বৈশিষ্টের) পর্যায়বৃত্ত ঘটে তাই এই সারনীতে লিপিবদ্ধ আছে। পর্যায়বৃত্ত সারণীতে পারমানবিক (Atomic) সংখ্যানুক্রমে সকল মৌলিক পদার্থকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। পারমানবিক (Atomic) সংখ্যা হচ্ছে পরমাণুর 'নিউক্লিয়াসে' প্রোটনের সংখ্যা। এভাবে একটি সহজ পদার্থ 'হাইড্রোজেনের' সংখ্যা হচ্ছে 'এক'। কারণ এর

'নিউক্লিয়াসে' একটি প্রোটন রয়েছে। হিলিয়ামে–'দুই, লিথিয়ামে–'তিন' ইত্যাদি।

সারণীতে ক্রমবর্ধমান পারমানবিক (Atomic) ওজনের ক্রম অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজানো হয়েছে। মৌলিক পদার্থের ধর্মও একই রকম পরিবর্তনের পর্যায়বৃত্তের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এক সারিতে উপর্যপুরিভাবে সাজানো সব মৌলিক পদার্থই একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের ব্যাপারে তার ওপরের ও নিচের মৌলিক পদার্থ থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ, একটি পদার্থে একটি 'ইলেকট্রন' ও একটি 'প্রোটন' হবে বেশি আর অপরটিতে হবে কম। আবার লম্বাভাবে সাজানো সব মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বাইরের শেল এ 'ইলেকট্রনের' সংখ্যা এক। লম্বা সারিতে

চিত্রঃ ৩০

মৌলিক পদার্থের 'পর্যায়ক্রম' চার্টটিতে হলুদ রঙের মোট ২৮টি ঘর খালি রেখেই মেন্দেলেজেফ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ভবিষ্যতবাণী করে যান যে, আগামীতে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়ে ঐ ঘরগুলি পূর্ণ হবে। কি আশ্চর্য ! তার সে কথামত দিনের পর দিন একটি একটি করে মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়ে একদিকে যেমন 'মেন্দেলেজেফের' ভবিষ্যৎবাণীকে পূর্ণতা দান করেছে তেমনিভাবে অপরদিকে এই মহাবিশ্ব যে পরিকল্পনার জগত, নিয়ম-শৃংখলার জগত, ক্রমের জগত তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে।

মৌলিক পদার্থের একই ধর্ম বিদ্যমান বলেই ইলেক্ট্রনিক বহিরাকৃতিতে এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম,

রুবিডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফানাশিয়াম প্রত্যেকের বাইরের শেল-এ একটি করে 'ইলেকট্রন' থাকায় সবাইকে একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থের গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। আবার হিলিয়াম, আরগণ, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন এবং র‍্যাডন সবাইর বাইরের শেল স্থিতিশীল বহিরাকৃতিতে ভরা। কাজেই অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সংগে এদের মিলিত হওয়ার
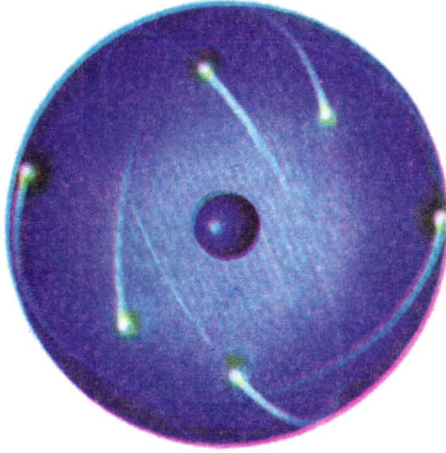
চিত্রঃ ৩১

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত 'পরমাণু'ও প্রমাণ করছে এ জগত দৈব ও বিশৃংখলার জগত নয়, বরং শৃংখলার জগত।

কোন সম্ভাবনা প্রকাশ পায় না। এই ছয়টি হচ্ছে 'জড় গ্যাস', তাই এদেরকে আবার একই গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত এই সুন্দর ব্যবস্থা জড় এই মহাবিশ্বের পরতে পরতে কোথাও আকস্মিক, দৈব বা বিশৃংখলার প্রমাণ বহন করে কি? করে না। জ্ঞানের রাজ্য বরং বার বার তার বিপরীতে উদ্দেশ্য–পরিকল্পনা, নিয়ম, শৃংখলার পেছনে একজন মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞানে গুনান্বিত সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিই দাবী করে। এরপরও কি দৈব বা বিশৃংখলার মত অপবাদ এ মহাবিশ্বের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায়? বিবেকবান মানুষ কি বিশ্বের মৌলিক পদার্থের নিরবচ্ছিন্নভাবে মেনে চলা আইন-শৃংখলা ও ক্রমকে শুধু চোখ বন্ধ করেই অস্বীকার করে যাবে? তাদের অন্তরে সত্যের কপাট কি এখনও খুলবে না?

পরমাণুর গঠন-কৌশল আবিষ্কারের ফলে বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের যুগে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, রসায়ণিক ধর্মের সকল দৃষ্টান্তে সঠিক আইন বিদ্যমান। বিশৃংখলা, লক্ষ্যহীনতা বা দৈবের কোন চিহ্নই তাতে নেই। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুই একই রকম অর্থাৎ, তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণিকা দ্বারা গঠিত। প্রোটন (পজেটিভ), ইলেকট্রন (নেগেটিভ) এবং নিউট্রন (চার্জশূন্য)। প্রদত্ত এক রকমের একটি পরমাণুতে সব কয়টি প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াসের' মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং সব কয়টি ইলেকট্রন সংখ্যায় যা প্রোটনের সমান তারা নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে বিভিন্ন 'কক্ষপথে' নিউক্লিয়াস থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক দূরে দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করে। পরমাণুর এই পরিক্রমণ প্রক্রিয়া অনেকটা সৌর জগতের মত একই রকম আইন মেনে চলছে কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে।

চিত্রঃ ৩২

মহাবিশ্বের মাঝে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট ১১২টি মৌলিক পদার্থ সকল অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট আইন মেনে চলছে, ঐ আইনের আওতায় মৌলিক পদার্থসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে আবার হাজার-হাজার নতুন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে করুণার ডানা বিছিয়ে দিয়েছে। ধন্য হয়েছে এই জীবনময় পৃথিবী।

এখন কথা হচ্ছে, অণু-পরমাণু গড় হিসাবে জড় পদার্থ, অণু ও পরমাণু এবং স্বয়ং এদের সব উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন তড়িৎ শক্তি, আবার শক্তি নিজে, সবই দেখা যায় উপযুক্ত আইন মেনে চলে। আদৌ দৈব বা বিশৃংখলভাবে পরিচালিত হয় না। বর্তমান বিজ্ঞান এর স্বপক্ষে সত্যতা প্রমাণের জন্য হাজারো উপাদান হাজির করেছে। তাই নিঃসন্দেহে এ মহাবিশ্ব রীতি ও ক্রমের জগত, বিশৃংখলার নয়; আইনের জগত, দৈব বা লক্ষ্যহীনতার জগত নয়।

বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রের কোথাও প্রাকৃতিক আইনাবলীকে এতটা প্রত্যক্ষভাবে, জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ওপর প্রয়োগ করা হয় না, যতটা জীব-রসায়নের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। মানবদেহের মধ্যে যেখানে 'হজম প্রক্রিয়া' ও 'পরিপাক প্রণালীর' রহস্যাবলীর প্রতিটি রাসায়ণিক বিক্রিয়ার মধ্যে সকল রহস্যের ব্যাখ্যা মিলে এবং আরো মিলে যে একটি 'উৎসেচক' এসকল পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। এরূপ বিক্রিয়া যে হওয়া উচিত এবং এরা ঠিক যে এমন নির্দিষ্টভাবে উৎসেচক কর্তৃক পরিচালিত হবে, কে তা নির্ধারণ করেছিল? এক নজর যদি আপনি এ ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কিত চার্টটি দেখেন এবং কিভাবে পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা লক্ষ্য করেন, তাহলে অতি সহজেই সব কিছুর মূলে দৈবের বা বিশৃংখলার হাত এমন মনে করার সকল সম্ভাবনা আপনার তিরোহিত হতে বাধ্য হবে। সম্ভবত অন্য কোথাও অপেক্ষা এখানে

চিত্রঃ ৩৩
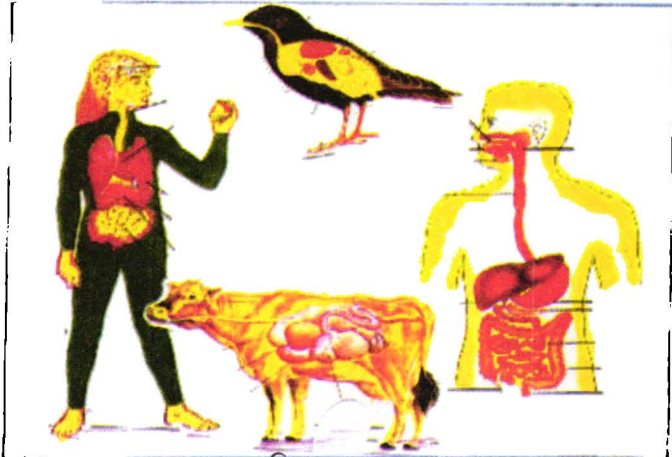
প্রাণী জগতের 'খাদ্য পরিপাক প্রণালী' একবার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই আপনার নিকট সত্য উন্মোচিত হবে, মিথ্যার কুহেলিকা চিরতরে দূর হয়ে যাবে। বুদ্ধিদীপ্ত একজন মহান মণীষার সক্রিয় পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ এর পিছনে যে কার্যকর সে বিশ্বাস আপনার দৃঢ় হবে। এখানে দৈব বিশৃংখলার যে কোন স্থান নেই তাও পরিষ্কার বুঝা যাবে।

ভালোভাবে এ বিষয়টি জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা কতগুলো নীতি-নিয়ম মেনে চলেন এবং প্রাণ সৃষ্টির সংগে সংগে তিনি এ নীতিগুলো কায়েম করেছেন, যা পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোর সমানুপাতিক।

ফরাসী উদ্ভিদবিদ্যাবিদ 'দ্যা যাসিয়া' উদ্ভিদের প্রজাতি বলতে কি বোঝায়, তাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন 'এটা প্রজনন দ্বারা চিরস্থায়ী একই রকম উদ্ভিদের বহু বর্ষজীবী পর পর অনুগমন মাত্র'। অর্থাৎ, উদ্ভিদজগতও প্রমাণ করছে যে এ মহাবিশ্ব দৈবক্রমে বা বিশৃংখলার ভেতর দিয়ে জন্ম নেয়নি, বরং একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে নিয়ম-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে কোটি-কোটি বছর থেকে ভূ-পৃষ্ঠে এক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে অন্য জাতীয় উদ্ভিদ জন্ম নিচ্ছে না, অধিকন্তু প্রত্যেকটি উদ্ভিদ নির্বাচনী প্রক্রিয়া সত্ত্বেও, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকতার
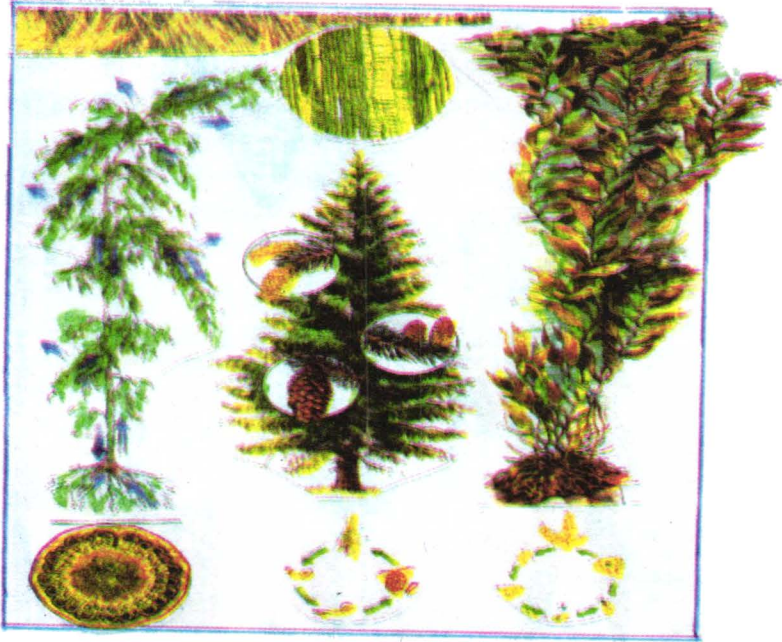
চিত্রঃ ৩৪
উদ্ভিদ জগতও নিজেদের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বংশ বৃস্তারের মাধ্যমে প্রমাণ করছে এ জগত বিশৃংখলার ভিতর দিয়ে জন্ম নেয়নি; বরং নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার আলোকে নিয়ম-পদ্ধতির ভিতর দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবর্তন অথবা জৈবিক শত্রুদের দ্বারা উপর্যপুরি আক্রমণ সত্ত্বেও সকল যুগের উদ্ভিদের জীবনের যে পরিবর্তন হয়ে থাকে তা হচ্ছে বর্ণ সম্পর্কিত

এবং বংশ সম্পর্কিত পরিবর্তন। কিন্তু এসব সত্বেও প্রজাতি নিজে অপরিবর্তীত-ই থেকে যায়।[৬]

দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে বলতে চাই, আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত একটি গণনাকারী (Calculator) যন্ত্রের জন্য যদি একজন পরিকল্পনাকারীর, প্রস্তুতকারীর প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের চারদিকে যে পৃথিবী, তা হচ্ছে ব্যাপক জটিলতার সমাবেশ। আবার মানুষের দেহযন্ত্রটি তার চাইতেও আরো বেশি জটিল। দেহযন্ত্রের তুলনায় মহাবিশ্বটি লক্ষ-কোটি গুণে জটিল থেকে জটিলতর। তাহলে সেই জটিলতর মহাবিশ্বের জন্য কত বেশি পরিকল্পনাকারীর প্রয়োজন তা কি ভেবে দেখবেন? এ ব্যাপারে সত্যের বাহন নামক বিবেক কি চুপ করে থাকবে? সত্য প্রকাশে কি এগিয়ে আসবে না?

পরিকল্পনা, ক্রম বা ব্যবস্থা একে আপনি যাই বলুন না কেন, কেবল মাত্র দৈবের কারণে তা কখনও উদ্ভুত হতে পারে না। ক্রম বা ব্যবস্থা অথবা শৃংখলা যেখানে আগমন করবে, সেখানে দৈব বা বিশৃংখলা আদৌ স্থান পাবে না। বস্তুতঃ গোটা মহাবিশ্বটি যে অসীম ক্রম বা জটিল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, তাতে তার পেছনে অসীম ক্ষমতাধর মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কিছুতেই বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজ বিশ্বাস দাঁড় করাতে পারছেন না।

প্রকৃতির মধ্যে যে শৃংখলা বা ক্রম আমরা দেখতে পাই, আসলে সে শৃংখলার মধ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই বিশৃংখলার মধ্য থেকে দৈবক্রমে আপনা আপনি শৃংখলার উদ্ভব হয়েছে এমন আন্দাজ অনুমান করে মিথ্যা তৃপ্তি লাভের চেয়ে এক মহাজ্ঞানী মনীষার অস্তিত্বকে এর পেছনে মেনে নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত নয় কি? প্রকৃত প্রস্তাবে 'সমগ্র বিশ্বজুড়ে' উদ্দেশ্যবাদ, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে, কেউ এ থেকে একটি মুহূর্তের জন্য অব্যাহতি পেতে পারি না। আকাশ রাজ্য এবং এ পৃথিবী সর্বত্র এ পরিকল্পনা বিরাজমান।

নয়নাভিরাম শস্যে ঢাকা ক্ষেত দেখে তার প্রশংসা করা এবং সে সংগে রাস্তার পাশেই খামার বাড়ীতে কৃষকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেমন অযৌক্তিক, ঠিক তেমনি ক্রম, পরিকল্পনা, শৃংখলা ও নিয়ম-নীতি সব দেখে শুনে বিস্মিত হয়ে এক ও একক মহাজ্ঞানী, পরিকল্পনাকারী, সৃষ্টিকর্তাকে

---

৬. চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

অস্বীকার করে দৈব ও বিশৃংখলার আশ্রয় নেয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক নয় কি?[৭]
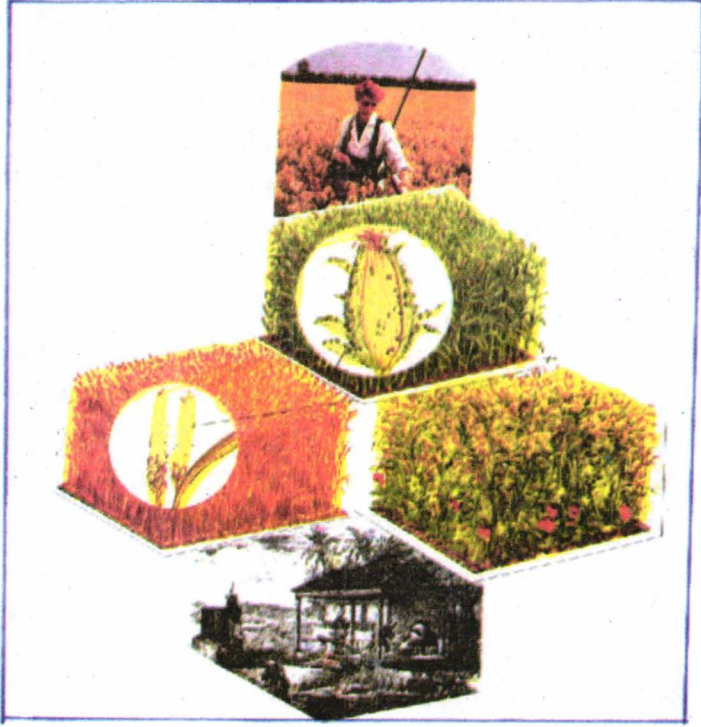
চিত্রঃ ৩৫

সৃষ্টির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শুধু তারই প্রশংসা করে সাথে সাথে তার প্রস্তুতকারীকে ভুলে যাওয়া যেমন বোকামী, ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্বের অগনিত বিষয়ের সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তাকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে শুধুমাত্র সৌন্দর্যের গুণকীর্তন করা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক-ই বটে।

---

৭. চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

তৃতীয় প্রস্তাব

'আদৌ এ মহাবিশ্বের কোন গোড়াপত্তন হয়নি। অনাদিকাল থেকেই মহাবিশ্ব বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্তই থাকবে।'

আমরা জানি যে, প্রাচীন বস্তুবাদের সব কিছুই এ দাবী নির্ভর ছিল 'বস্তুর ধ্বংস নেই, শুধু রূপান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনের পর বস্তুই থেকে যায়, এর পরিমাণ কম বা বেশি হয় না।' এ থেকে প্রমাণ করা হতো যে বস্তু জগতের আরম্ভ ও শেষ নেই। বর্তমানে 'পারমাণবিক' শক্তি কিন্তু এ ধারণার ভিত্তি পাল্টিয়ে দিয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ পেশ করে জানিয়ে দিয়েছে যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে বস্তুর বিনাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের সূর্যটি

চিত্র ঃ ৩৬

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বস্তুর বিনাস ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে Fission পদ্ধতিতে বস্তুকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে তুলনামূলক কম তাপীয় বস্তু ঐ তাপশক্তিকে গ্রহণ করে পূর্বের বস্তুটিকে চিরতরে তার অস্তিত্বের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

একটি বিশাল বড় ধরণের পারমানবিক চুল্লি, যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রায় ছয়শত (৬০০) কোটি টন হাইড্রোজেন বিষ্ফোরণের মাধ্যমে হিলিয়াম গ্যাসে

রূপান্তরিত হচ্ছে, এই প্রক্রিয়ায় প্রায় চল্লিশ (৪০) কোটি টন হাইড্রোজেন ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে প্রচন্ড তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হয়ে সৌরজগতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমগ্র সৌরজগত তাপ এবং আলো লাভ করে আজও টিকে আছে।

রসায়ণশাস্ত্রও এই একই তথ্য প্রকাশ করে যে, জড়পদার্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। কতক খুব ধীরে-ধীরে আবার কিছু অত্যন্ত দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা চলে যে জড় পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়। অতএব জড় পদার্থের নিশ্চয়ই একটা আরম্ভও রয়েছে। রসায়ণশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ও পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান করে এই ইংগিত করে যে, এই সূচনা কখনও ধীরে-ধীরে বা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়নি; বরং হঠাৎ করেই প্রচন্ড বিস্ফারণের (Big Bang) মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল। ঠিক কখন এইসব জড় পদার্থের সূচনা হয়েছিল, বিজ্ঞানের উক্ত সাক্ষ্য আমাদেরকে আনুমানিক সে সময়ও বলে দিতে পারে (এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে জানা যাবে)। অতএব বিনা তর্কেই বলা যায়, আমাদের এই মহাবিশ্বটি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকেই 'নির্দিষ্ট আইন' মেনে চলছে। অনাদিকাল থেকেই এই মহাবিশ্ব বিদ্যমান আছে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। আজকের দিনে যারা বিজ্ঞানের প্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করবেন তাঁদের অবশ্যই সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

বর্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর বয়স, চন্দ্রের বয়স, সূর্যের বয়স, উল্কাপিন্ডের বয়স, আমাদের সৌরজগতের বয়স এমনকি মহাবিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি বস্তুর আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করছে এবং বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বলাভ, তাদের বিভিন্ন প্রকরণ এবং পরিমাণ অভিব্যক্ত হতে কত সময় লেগেছে, তাও বলছে।

আমরা জানি যে, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'বোল্টজম্যান্' তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইন বা 'Law of Entropy' নামে অভিহিত আইন আবিষ্কার করার ফলে উক্ত প্রস্তাবের প্রস্তাবকগণ দারুণভাবে বিজ্ঞানী সমাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। কারণ 'Law of Entropy' প্রমাণ করে যে এ বস্তুজগত চিরন্তন নয়—আবার অবিনশ্বরও নয়। এটিকে অবশ্যই এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হতে হয়েছিল এবং এক সময় নির্ঘাত ধ্বংসও হয়ে যাবে। 'Law of Entropy' বলে যে, উত্তপ্ত বস্তু থেকে ততধিক শীতল বস্তুতে তাপ সব সময় প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাপ প্রবাহের এই নিয়মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

বিপরীতগামী করার জন্যে কখনও তাকে পাল্টানো যায় না।
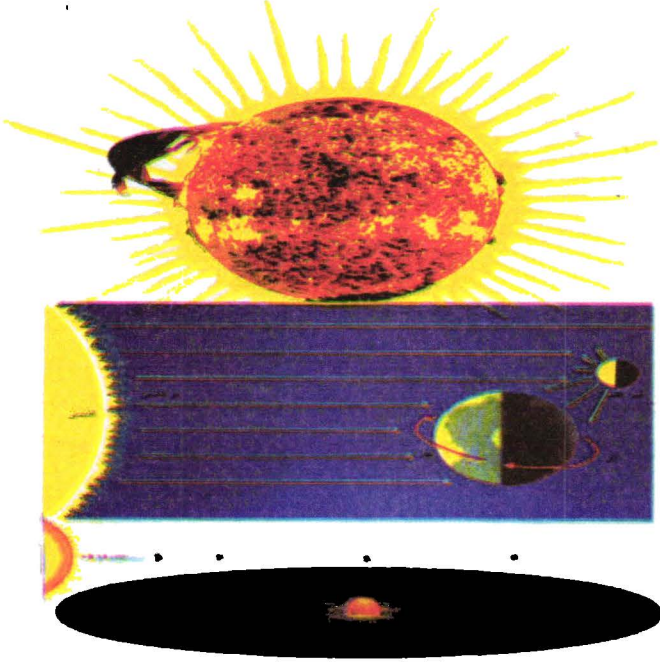
চিত্রঃ ৩৭
সৌর জগাতের কেন্দ্র 'সূর্য' প্রতি মুহূর্তে তার কেন্দ্রে উৎপন্ন প্রচন্ড তাপ শক্তিকে সৌর পরিবারের প্রান্তসীমা পর্যন্ত কম তাপীয় বস্তুতে সরবরাহ করে সবাইকে সচল রেখে চলেছে। একদিন সময় আসবে যখন সূর্য তাপ বিতরণ করতে-করতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সাথে সাথে সমস্ত সৌরজগাতের উপর নেমে আসবে অন্ধকার হিম-শীতল নীরব মৃত্যু এবং স্থায়ী ধ্বংসের এক করুণ বার্তা। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্বটি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নেই এবং অনন্তকাল পর্যন্তও টিকে থাকবে না।

মাপা শক্তির তুলনায় অমাপ্য শক্তির অনুপাত হচ্ছে 'Entropy' । যাতে করে বলা যায় যে মহাবিশ্বের Entropy সব সময়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাপ গতিবিদ্যার নিয়ম-কানুন থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে এই বিশ্ব ক্রমশঃই তাপ বিতরণ করতে করতে নিম্নতাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে এক সময় আসবে যখন নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সবাই মারাত্মক রকম নিম্ন তাপমাত্রায় উপনীত হবে। তখন তাপশক্তি বলতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। পরিনামে আর কোন রাসায়ণিক ও ভৌত-প্রক্রিয়া থাকবে না এবং সকল প্রকার প্রাণ তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এখনও পৃথিবীতে প্রাণী

বিরাজমান এবং রাসায়ণিক ও ভৌত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে আমাদের এ মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে না। অন্যথায় এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাজে লাগানো উপযোগী শক্তি বহুদিন পূর্বেই শেষ হয়ে যেত আর সেই সাথে সমগ্র প্রকৃতিও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেত। কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আমাদের এ মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিলো, আর তা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে না, এক সময় অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করার সাথে সাথে আরো একটু বাড়তি ইংগিতও দিয়ে যায়, তাহলো 'যারই সূচনা রয়েছে, সেই আপনা থেকে আরম্ভ হয়নি।' অধিকন্তু এর জন্য অবশ্যই এক চরম ও পরম পরিকল্পক পরিচালক সত্ত্বা রয়েছেন। নিঃসন্দেহে ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক 'ফ্রান্সিস বেকন' (Francis Becon) প্রায় তিন শতাব্দীরও পূর্বে সত্য উক্তি করেছিলেন; 'সামান্য দর্শন জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে। [৮.]'

'ফ্রান্সিস বেকনের' কথাটি তিনশত বৎসরের পুরনো হলেও সত্য সত্যই জ্ঞানবান সমাজকে ভাবনার খোরাক দিয়ে যায়। বিজ্ঞানের অবদানে আজকে আমরা–কি রসায়ণ, কি জৈব রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাসহ জ্ঞানের সকল বিষয়েই এমন সব তথ্য লাভ করছি, যা ভাবতে গেলে চিন্তার রাজ্য দোল খেয়ে যায় যে কি করে প্রতিটি শাখায় জ্ঞানের অবোধগম্য এত জটিল কার্যকলাপের উপস্থিতি, শৃংখলা, নিয়ম, কাজ-কারবার, সৃষ্টি ও ধ্বংসসহ শত-সহস্র বিষয়ের একসাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ না করলে তা মোটেই উপলব্ধি করা যায় না। প্রতিটি শাখায় পরিকল্পনা, নিয়ম-শৃংখলা, সমন্বয় ও ধারাবাহিকতার একটা চেইন ওয়ার্ক যেন জ্ঞানীদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এর পিছনে স্বতঃস্ফূর্ততা বা দৈব কাজ করছে না বরং মহান সৃষ্টিকৌশলী অসীম জ্ঞানের আঁধার 'এক ও একক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের' ক্ষমতাই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

১৯৬৫ সালে 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) প্রস্তাবের অন্যতম লক্ষণ 'ব্যাক-গ্রাউন্ড রেডিয়েশন' (Back Ground Radiation) ২.৭৩ কেল্‌ভিন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই তৃতীয় প্রস্তাবটি (Steady State

---

৮. চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

Theory) বিজ্ঞানীসমাজে দারুণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ 'বিগ-ব্যাংগ' থিউরির প্রস্তাবকগণ পূর্বেই দাবী করেন (১৯৪০ সালে) যে, মহাবিশ্ব হঠাৎ একটি প্রচন্ড বিষ্ফোরণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এবং বিস্ফোরণের পরবর্তী সময়ে লয়প্রাপ্ত বস্তুকণার শক্তি 'পশ্চাদপিঠ বিকীরণ' (তাপমাত্রা) হিসাবে তিন কেলভিন মহাকাশে এখনও বিরাজ করছে, এ তথ্যের ওপর
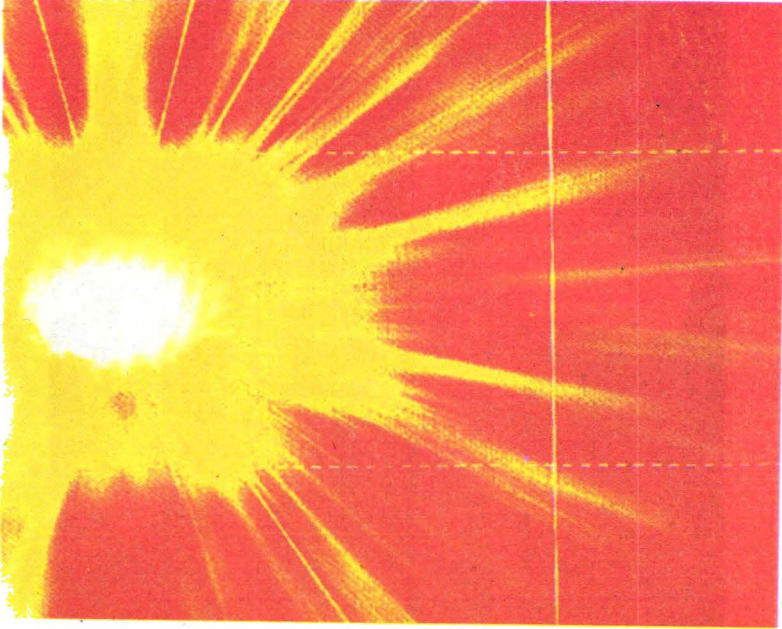
চিত্রঃ ৩৮

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুভক্ষণটি হচ্ছে আনুমানিক প্রায় ১৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পিছনে, যখন সময় প্রায় 10^{-43} sec. এবং আয়তন 10^{-32} cm. বিন্দুতে মহাবিষ্ফোরণ ঘটে মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টির সূচনা শুরু হয়ে যায়। ব্যাক-গ্রাউন্ড রেডিয়েশান 2.73k আবিষ্কৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী এ তথ্যকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়।

ভিত্তি করে বিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে অনুসন্ধান, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী 'Arno Penzies এবং Robert Wilson' -এর নিকট আকস্মিকভাবেই 'রেডিও স্ট্যাটিক' (Radio static) এবং 'টেলিভিশন স্নো' (Television snow) আকারে 'ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন' ধরা পড়ে। গোটা বিজ্ঞান জগতে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায়, এবং মানুষের কল্পনায় তৈরী মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত উদ্ভট সকল থিওরী, প্রস্তাব, ধারণা বানচাল হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে

যে, এ মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয়; বরং 'বিগ-ব্যাংগ'-এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা বিদ্যমানও থাকবে না, অধিকন্তু একটা সময় আসবে যখন সমগ্র মহাবিশ্বটি ধ্বংস হয়ে যাবে।
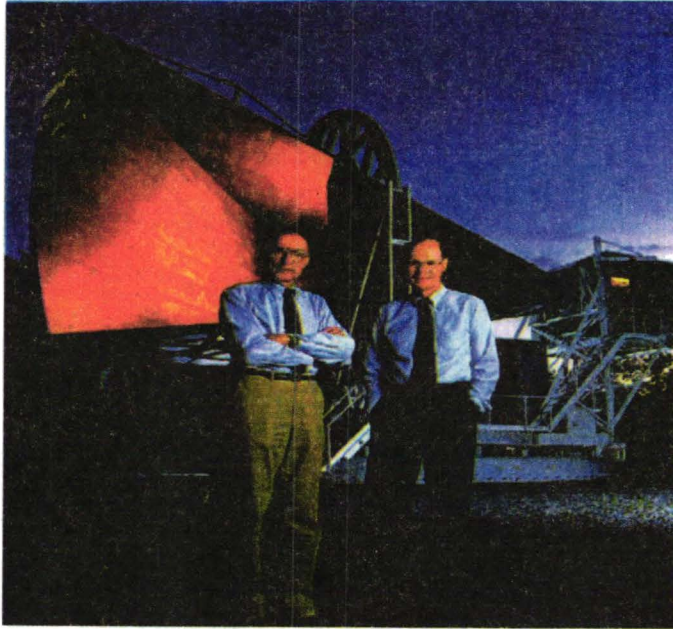
চিত্রঃ ৩৯
'Arno Penzies' এবং 'Robert Wilson' নামে উক্ত দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী ব্যাক-গ্রাউন্ড রেডিয়েশান আবিষ্কার করে 'Big Bang'-কে প্রতিষ্ঠিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় মহাবিশ্বটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং অনাদিকাল পর্যন্তও টিকে থাকবে না। কারণ যার সৃষ্টি আছে, একসময় তার ধ্বংস অনিবার্য।

অতএব 'মহাসত্যের' সামনে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের মতো তৃতীয় প্রস্তাবটিও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে কল্পিত ধারণাসমূহ সাবানের ফেনার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সত্য যখন আগমন করে মিথ্যা তখন করে প্রস্থান; যেমনিভাবে আলোর আগমনে অন্ধকার হয়ে যায় অদৃশ্য।

চতুর্থ প্রস্তাব

'যেভাবেই হোক এ মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করা হয়েছে।' বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ 'অলিভার ওয়েনডেল'-র উক্তি খুবই প্রনিধানযোগ্য। তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, 'জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সাথে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে[৯]।'

তাই যথার্থই বিজ্ঞান ঈমানের দাবীদার। যে ঈমান হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস, কার্যকারণ ব্যবস্থায় বিশ্বাস ও কর্তৃত্বে বিশ্বাস।

আজকের বিশ্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্ম এবং বিজ্ঞান একই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের দ্বারা দিনের পর দিন ধর্মীয় বিশ্বাস সমর্থিত ও সুদৃঢ় হচ্ছে ক্রমাগতভাবে। বিজ্ঞানের বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা কল্পনাবিলাসী মানুষের স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার গল্পের মত আন্দাজ-অনুমান নির্ভর মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় অবাস্তব থিউরিগুলো শুধু ছুঁড়ে দূরে নিক্ষেপই করেনি, অধিকন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, এই মহাবিশ্বটি এক চরম ও পরম শক্তিধর 'মহাজ্ঞানী স্রষ্টার নিপুণ হাতের সৃষ্টি এবং আজকের 'জোতির্বিদ্যা' সেই অতি দূরবর্তী সৃষ্টির ক্ষণ মুহূর্তটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করছে। সাথে সাথে 'পদার্থ বিদ্যা' এই মহাবিশ্বের চরম ধ্বংসের কথা ভবিষ্যৎবাণী করছে প্রকাশ্যভাবে। ফলে শত-সহস্র চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা সম্পর্কে এবং এই সৃষ্টির পেছনে প্রচন্ড শক্তিশালী মহাজ্ঞানী মনীষার উপস্থিতি, বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে এক 'স্বীকৃত সত্য' হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তাই আজকের বিজ্ঞানীমহল ধর্মকে ভ্রুকুটি তো দূরের কথা, অধিকন্তু ধর্মের পিছনে আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে ফিরতে শুরু করেছেন।

জার্মানীর স্বনামধন্য 'রাইনকি' তার 'ডাই ওয়েল্ট অ্যালস দ্যাট' (Die welt als that) - এ স্বীকার করেছেন 'শাশ্বত মনীষা' ও শাশ্বত ক্ষমতা বা শক্তি বিদ্যমান, একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

---

৯. চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'রোমানেস' কিছুকাল পূর্বে স্বীকার করে গেছেন যে, তার সমুদয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা মূলতঃ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঘোষণা করেছেন 'মহাবিশ্বকে কোন ক্রমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করে বুঝানো যায় না।' তিনি ছাড়া আরও অনেক বিজ্ঞানী জীবনের গোধূলীলগ্নে এসে শুধু একরাশ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজ কর্মের অনুশোচনা করে জগতবাসীকে জানিয়ে গেলেন তাদের বিগত জীবনের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম শুধু ভুলের উপরই রচিত হয়েছিল।

বিশ্ব বিখ্যাত ইংরেজ রসায়ণবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী 'মাইকেল ফ্যারাডের' জীবন আরেকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'মাইকেল ফ্যারাডে' আজীবন নিজস্ব থিউরি গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত তিনি

চিত্রঃ ৪০
বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী 'মাইকেল ফ্যারাডে'

দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের কোন একদিন 'মাইকেল ফ্যারাডের' মৃত্যু শয্যায় তার বন্ধু ও সহকর্মী প্রশ্ন করেন, 'ফ্যারাডে' ! এখন তোমার কি ধারণা? মৃত্যু পথযাত্রী প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলেন, ধারণা? 'না, আমার আর কোন ধারণা নেই।' আল্লাহ্ তা'য়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাকে আর কোন ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করতে হবে না। আমি কাকে বিশ্বাস করতাম

জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি সেদিন পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি তিনি সমুদয়ই সংরক্ষণ করবেন[১০]।' এভাবে অনেক বিজ্ঞানী জীবনের ক্রান্তিকালে শুধু হতাশা ব্যক্ত করেই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ধরাপৃষ্ঠ ত্যাগ করেছেন।

আজ আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি, যে সকল বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তারা বিগত অর্ধশতকে তাদের গবেষণা দ্বারা পূর্বের জড়বাদী চিন্তাধারাকে হতবাক করে দিয়েছেন। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসম্ভব সাধনা করেছেন। তাদের পূর্ববর্তীদের চাইতে তারা অনেক বেশি জ্ঞানার্জন করেছেন। অনেক বেশি জানতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারা যে শুধু নতুন নতুন তথ্যই আবিষ্কার করতে পেরেছেন তাই নয়, সেই সংগে তাদের সমস্যা বেড়েছে অনেক অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন তারা হয়েছেন। মাঝে মাঝে তাদের চিন্তার দিগন্ত একেবারে অস্পষ্টতার অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু তারা সাহস হারাননি ; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে সেইসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ফলে এক পর্যায়ে এসে তাদের সামনে সত্য-রহস্যের দরজা খুলে যায়, বিনিময়ে আমরাও আজকের দিনের আবিষ্কৃত বিস্ময়কর বস্তুসমূহ প্রাণভরে দর্শন করছি আর জানতে পারছি মহাবিশ্বের অদৃশ্য হাজারো-লক্ষ সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে, যা মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে আমাদের অলক্ষ্যেই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন বিস্ময়করভাবে। আজ আরো অবলোকন করছি যে, অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাদের গবেষণায় কত বিনয়ী হয়ে ওঠেছেন। আবার অনেকের পরিচয় পাওয়া যায়, যারা আগে থেকেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী। গবেষণার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে ততই তারা ভক্তিভরে নুইয়ে পড়তে থাকেন। তাদের অনেকেই সেই সাথে সত্য প্রাপ্তির কারণে অবর্ণনীয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। কারণ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে কুয়াশা, কুজ্‌ঝটিকা এবং অসংখ্য সমস্যাবলীর ভিতর দিয়ে তারা মহান আলোকের সন্ধান লাভ করেন, যে আলোক পরবর্তীতে তাদেরকে সত্য-সুন্দর পথে এগিয়ে যেতে আরো উৎসাহ যোগাচ্ছে। বিষয়টি উদাহরণ পেশ করেই বলা যায়। আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে ঘোষিত বিজ্ঞানী 'আইনস্টাইন' তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সকল বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেছেন 'Science without religion is lame and religion without science is blind' (ধর্ম ছাড়া

১০. চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ)। বিজ্ঞান ও কুরআন পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। কেউ কাউকে ছাড়া সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না। যেহেতু উভয়ের আগমন একটিমাত্র মহাজ্ঞানী উৎস থেকে। বর্তমান বিজ্ঞানের বদৌলতে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী সমাজ আজকে এ কথা পদে পদে অনুভব করতে শুরু করেছেন।

চিত্রঃ ৪১
বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ধর্মভীরু 'আলবার্ট- আইনস্টাইন'

আজকের বিজ্ঞান দ্বারা এই মহাবিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' আছেন এ কথা প্রমাণ করার চাইতে 'আল্লাহ্' নেই এ কথা প্রমাণ করা লক্ষ-কোটি গুণ কঠিন, বরং সম্ভবই না। প্রকৃতিতে নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধ ধর্ম আর প্রাকৃতিক আইনাবলীর অস্তিত্ব-ই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তর। বৈজ্ঞানিকদের নিকট আজকের শৃংখলাবদ্ধ মহাবিশ্বের অস্তিত্বই বার বার ধরা পড়ছে, যার পরতে পরতে জটিল থেকে জটিল ব্যবস্থাপনা অথচ কঠিন প্রাকৃতিক আইনাবলীর ভিতর দিয়ে উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসরমান এক অদৃশ্য কর্মকৌশলীর হাতের পরশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও

অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুভূত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই অদৃশ্য কর্মকৌশলীই হচ্ছেন, মহান সত্ত্বা 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন'। পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাসের প্রতি একবার চিন্তা নিবদ্ধ করুন, যে শূন্য মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে আরেকবার তার দিকে লক্ষ্য করুন এবং সবশেষে বিশ্বব্যাপী আবর্তনের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাকেও অবলোকন করুন। সব কিছুর বিশালত্বই আপনাকে আল্লাহ্র মহত্মকে নতুন করে উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে।

একটি কথা খুবই সত্য, তাহলো, যদিও মানুষ উপায় উদ্ভাবনে খুবই পটু এবং বুদ্ধিমান তথাপি সে কখনও নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমনটি ধারণা করতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির এবং মহাদেশের মানুষ ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে এবং সার্বজনীন মনোভাব নিয়ে এই বিশ্বে জীবনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য কি এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসহ বিশাল মহাবিশ্বকে বুঝতে আর বোঝাতে গিয়ে মানুষের মারাত্মক রকমের অসামর্থ্যকেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। বুদ্ধি অথবা চেতনা যা দিয়েই হোক না কেন প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রাণহীন জড় অনিয়ন্ত্রিত পদার্থের সঙ্গে দৈব ও লক্ষ্যহীন ঘটনা সম্পর্কিত কোন কল্পনাকে ঠাঁই না দিয়ে প্রায় সার্বজনীনভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে সকল দিকে পরিব্যপ্ত-পরিবেষ্টিত একজন বৃহত্তর মনীষার নিয়মাবদ্ধতা বিদ্যমান। মানুষ যখন তার বুদ্ধিমত্তার বাইরে 'অতি ইন্দ্রিয়ের' প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীন ভাবেই স্বীকার করে নেয়, তখন তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ 'সত্ত্বার' জন্য এক সুদৃঢ় প্রমাণ।

আল্লাহ্ এক আধ্যাত্মিক সত্ত্বা, আল্লাহ্ কোন অর্থেই শরীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। তবে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তিনি যে বুদ্ধি-জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত, তাঁর সৃষ্টি সে কথারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু আল্লাহ্ যেহেতু সকল চেতনার অতীত, তাই মানুষ তাঁর সর্বশেষ অভিলাষ কি তা নিরূপণ করার ক্ষমতা রাখে না। যে বিশাল মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র ও নগন্য অংশ বিশেষ, সেই মহাবিশ্বের সর্বশেষ উদ্দেশ্য কি তাও সে পরিমাপ করতে পারে না। তবে মানুষ হিসাবে আমরা পূর্বের

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি যে, মানুষও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি এবং নিশ্চয় এইসবের একটা আরম্ভ আছে, আর সে জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন। আমরা আরো উপলব্ধি করি যে, বিশ্বের এই চমৎকার ও জটিল প্রাকৃতিক বিধানাবলী কখনও মানুষের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয় না এবং প্রাণের যে রহস্য তারও একটা উৎস নিশ্চয়ই আছে, যা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত এক পবিত্র নির্দেশ শক্তি— একটি পবিত্র প্রথম আরম্ভ।

আল্লাহ্ হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আত্মিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার, তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তবুও আমরা মানুষ এবং প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের যে অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি, অনুসন্ধান করতে পারি। এসব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বিশ্বাসজনক। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মহাবিশ্বে যে শৃংখলা তা একটি সুশৃংখল মনের ফল। পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এর পশ্চাতে না থাকলে শৃংখলার পরিবর্তে বিশৃংখলাই মাথা উঁচু করতো বেশি।

আপনাকে অভিভূত করার মত সৃষ্টি সম্পর্কীয় জটিল রহস্য প্রাণীরাজ্যে এবং জৈবিক কাঠামোতে আরেক শ্রেণীর প্রমাণ বিদ্যমান। মানুষ ও জীবদেহের আকৃতি আর কাঠামোর জটিলতা সত্যই আকৃষ্ট করার মত। যদিও কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় কতিপয় কাঠামোর কাজ নতুন করে করা যায়, তথাপি দেহের যে কোন একটি অংশ আগের সৃষ্টি বা নির্মাণ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনক্ষম পূর্ববৎ সুদক্ষ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এ প্রসঙ্গে কৃত্রিম ফুস্‌ফুস্, হৃদযন্ত্র, মূত্রাশয় এবং যান্ত্রিক মস্তিষ্কের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। এরা আসল অংগের মত কাজ কখনই করতে সমর্থ হয় না। অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী মানুষের মস্তিষ্ক সম্পর্কে বলা যায় যে, মস্তিষ্ক বিদ্যুতের মত আধান (Charge) উৎপাদন ও পরিচালনা করতে পারে এবং মস্তিষ্কে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। মাংসপেশির যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্য এই মস্তিষ্ক দায়ী এবং এটা দেহযন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শ্বাস প্রক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মস্তিষ্কে আরো থাকে স্মৃতি এবং মুহূর্তের স্মরণে স্মৃতিপটে ভেসে উঠার জন্য হাজারো মানসিক প্রতিচ্ছবি এতে ধরে রাখা হয়। মস্তিষ্কের এই

একত্রিকরণের ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অথবা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান,
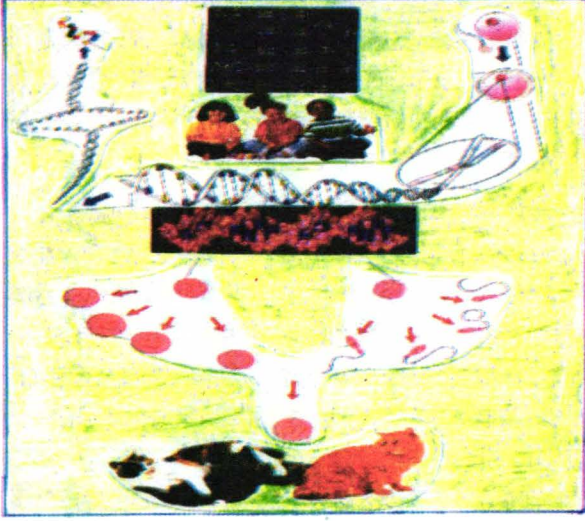
চিত্রঃ ৪২
"মানুষ কি দেখেনা আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে"। (৩৬ ঃ ৭৭) এই পৃথিবী পৃষ্ঠেজটিল থেকে জটিলতর সৃষ্টি কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রাণের যে আবির্ভাব তাও কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী সত্ত্বার উপস্থিতির প্রমাণ বহণ করছে।
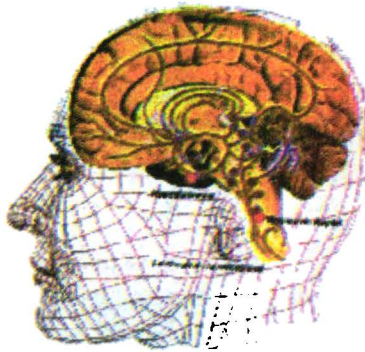
চিত্রঃ ৪৩
'মানবমস্তিষ্ক' সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যে বিস্ময়ের-বিস্ময় হয়ে বিরাজ করছে। দৈব বা বিশৃংখলার ভিতর দিয়ে কি এরূপ বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে?

উদ্দেশ্য, আকাঙ্খা স্থৈর্য্য ও শক্তির কি কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব? সৌন্দর্যকে পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করার মত রুচিজ্ঞান, প্রেমের মত অপার্থিব সত্ত্বাকে অনুভব করার মত শক্তি, আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সবকিছু একই ক্ষুদ্রাকার জীবনের মূলীভূত উপাদানের বা প্রোটোপ্লাজমের সমাবেশে গড়ে উঠা মস্তিষ্কের প্রতিদিনের কর্ম। কিন্তু প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোন ভিত্তিতে কি কেউ একে ব্যাখ্যা করতে পারে?

দেহের অনেক জটিলতার মধ্যে সারাক্ষণ দেহাভ্যন্তরে যে অযুত রাসায়ণিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, যার অনেক প্রক্রিয়াই আদৌ দেহের বাইরে ঘটানো সম্ভব নয়, তার দুর্বোধ্য নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। দেহ মধ্যস্থিত ঝাঁকুনী দ্বারা শরীর উপাদানের রাসায়ণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য পরিপূরক অবস্থা অক্ষুন্ন রাখে। এতে করে দেহাভ্যন্তরে ক্ষতিকারক কোন রোগ জীবাণু ঢুকলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে রক্তে রোগজীবাণুর প্রতিষেধক সৃষ্টি হয়, ফলে অনাক্রমনতা লাভ করা যায়। প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে যেমন প্রোটোপ্লাজম গঠনকারী রাসায়ণিক পদার্থের কাঠামো সুনির্দিষ্ট, তেমনি প্রত্যেকটি রোগের জন্য রক্তের মধ্যে রোগ জীবাণুর প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর তাই প্রত্যেকটি মানুষ একটি রাসায়ণিক স্বাতন্ত্রের অধিকারী। বলতে কি পারেন, কে এই স্বাতন্ত্র গড়ে তুলেছে? নিশ্চয়ই শুধু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

একবার হৃদযন্ত্রের কথাই ভাবুন! একটা জীবনের গোটা আয়ুষ্কাল ধরে এই ক্লান্তিহীন দেহযন্ত্রটি বিরামহীনভাবে সব দাবী মিটিয়ে চলে। তাছাড়া এটি রহস্যজনক ছন্দোবদ্ধতার অধিকারী এবং যখন দেহের সকল স্নায়ুতন্ত্রী বিকল হয়ে পড়ে তখন এই ছন্দবদ্ধতা তাকে স্পন্দিত হতে সাহায্য করে। কোন দুর্ঘটনার সময় এই বৈশিষ্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়। শারীরিক সনাতনী এই রহস্য আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যায়, তা কি ভেবে দেখার বিষয় নয়?

দেহাভ্যন্তরের কাজের এই সব অলৌকিক বিষয় প্রাণের রহস্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু দীর্ঘকালের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রাণের মূল রহস্য শুধু অজানাই থেকে গেছে। দেহের প্রত্যেকটি কোষ এত জটিল আর নাজুক যে আজ পর্যন্ত এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম মানুষের আয়ত্বের বাইরেই রয়ে গেছে। এই জীবন্ত কোষ

সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় 'কি করে' এই আণুবীক্ষণিক অথচ অত্যাশ্চর্য কার্যক্রম ইউনিট্‌টি আজকের এই রূপ নিল? অথবা কি করে এর গতি আরম্ভ হলো? কোষের বিরামহীন স্বাভাবিক কাজের মূলে কি রহস্য লুকিয়ে আছে? তাহলে জবাবে বিজ্ঞান নীরবতা পালন করবে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত মন নিজের অজান্তেই বলে ওঠবে সূচনায় এই কোষকে যিনি চালিয়ে দিয়েছেন এবং এর কার্যক্ষমতা অব্যাহত রেখেছেন, তিনি হচ্ছেন অচিন্তনীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ (মনীষা) সত্ত্বা 'আল্লাহ্' এবং তাঁর অদৃশ্য পরিকল্পনানুযায়ী এগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।
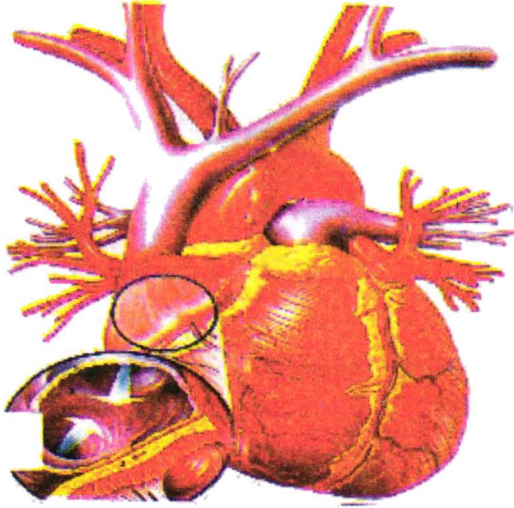
চিত্রঃ ৪৪

'হৃদপিন্ড' নামক রক্ত সঞ্চালন পাম্পটি ক্লান্তিহীন-বিরামহীনভাবে মানুষের সমগ্র জীবনভর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে; এস, এ, নোড-এ অদৃশ্য জগত থেকে পাল্‌স (Pulse) লাভ করার মাধ্যমে। বলতে পারেন কে অদৃশ্য থেকে এই পাল্‌স সরবরাহ করছে? নিশ্চয়ই এই পাল্‌স মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই আগমন করছে। জ্ঞানবান মানুষের জ্ঞানচক্ষু আবরণমুক্ত করার জন্য উল্লেখিত বিষয়টি যথেষ্ট।

আপনি যদি একবার উদ্ভিদজগতের দিকে তাকান, তাহলেও দেখতে পাবেন যে উদ্ভিদজগতও প্রমাণ করছে– মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা একজন 'আল্লাহ্' আছেন, যিনি তাঁর সৃষ্টি এই উদ্ভিদজগতের অপরিবর্তনীয় আইনসমূহের রহস্য আর বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে সারাক্ষণ নিজেকে প্রকাশ করে

চলেছেন সেই শ্রেষ্ঠ দর্শকদের জন্য যারা তাঁকে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শন করে ধন্য হতে চায়।

চিত্রঃ ৪৫
উদ্ভিদজগতের বিজ্ঞানসম্মত জীবনচক্র কি একজন মহাজ্ঞানী মনীষার উপস্থিতি প্রমাণ করে না?

যেমন দেখুনঃ

শৃংখলাঃ উদ্ভিদ কোষগুলি বর্ধিত হয়ে উদ্ভিদের যেভাবে বৃদ্ধি ও পুনঃউৎপাদন হয় তার প্রক্রিয়া এবং কোষগুলির বিভাগ ও কাজের বিশিষ্টতা যেরূপ সুশৃংখল, নিয়মিত এবং আশ্চর্য রকমের অপরিবর্তনীয় উপায়ে অগ্রসর হয়, তার প্রক্রিয়া প্রমাণ করে এর পেছনে অবশ্যই অদৃশ্য এক মহাকৌশলীর হস্ত ক্রিয়াশীল আছে।

সূক্ষ্মতাঃ একটিমাত্র সাধারণ উদ্ভিদের মধ্যে তার বৃদ্ধি এবং পুনঃউৎপাদনের মধ্যে যেরূপ জটিল-সূক্ষ্মতা বিদ্যমান, মানুষের তৈরী কোন যন্ত্রই আজ পর্যন্ত তত সূক্ষ্মতর হতে পারেনি। চাই সে কম্পিউটারই হোক বা সেটেলাইট-ই হোক।

সৌন্দর্যঃ উদ্ভিদের কান্ড, পাতা এবং ফুলে যে বেহেশ্‌তী লালিত্যময় সৌন্দর্য বিদ্যমান, তা সবসময়ই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শিল্পীর সৃষ্টিকেও ম্লান করে দেয়।

চিত্রঃ ৪৬
উদ্ভিদটি তার গঠন, আকৃতি, রং এবং সর্বোপরি সৌন্দর্য দিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

উত্তরাধিকারঃ উদ্ভিদ আবার একই রকম উদ্ভিদ জন্ম দিয়ে থাকে। কোন কারণে কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। এই উত্তরাধিকার বন্য, উদ্দেশ্যহীন, অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে কখনও অগ্রসর হয় না। গম-গমই জন্ম দেয়। সবরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রজননের পর প্রজনন ধারা চলে আসছে এই একই নিয়মে।

উল্লেখিত এই সবই বিবেকবান মানুষের কাছে অপরিসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্‌র' অস্তিত্ব প্রমাণ করে, যিনি সমগ্র মহাবিশ্বটি একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ এবং শেষ প্রস্তাবটির পর্যালোচনার ক্রান্তিকালে এসে একটি কথা বলা বোধহয় অনুচিত হবে না, তাহলো– আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন একটি ছোট শিশুর ভেতরে ও হেতুবাদের জ্ঞান জন্মলাভ করে থাকে শুধু তার সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে চেনার জন্য। তাই চার-পাঁচ বছরের শিশুটি বিভিন্ন সময় বড়দের প্রশ্ন করে, কে পাখী বানিয়েছে? কে গরু বানিয়েছে? কে চাঁদ সৃষ্টি করেছে বা কে পৃথিবী বানিয়েছে? ইত্যাদি-ইত্যাদি।

ছোট শিশুর উল্লেখিত প্রশ্নগুলোও প্রমাণ করে যে শিশু হেতুবাদের মৌলিক নীতি আবিষ্কার করেছে। এই নীতিগুলোকে 'কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত

চিত্র ঃ ৪৭
চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশুটির অভিব্যক্তি নতুন করে বিশ্বজাহানের প্রভুর পরিচয় উন্মোচন করছে। কচি মন প্রভুর তালাশে ফিরতে গিয়ে যেন মহাসত্যের সন্ধান দিয়ে যায়।

আইন' বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। 'কারণ ছাড়া কোন প্রকারেই ফল আসতে পারে না। প্রস্তুতকারক ছাড়া যন্ত্র সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য একটি করে কারণ আছে।' এই হচ্ছে কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন। এই চিন্তাধারাই 'আমার অস্তিত্ব' এবং 'পৃথিবীর অস্তিত্ব' সম্পর্কে একটা অভিমত গড়ে তোলার সংগে সংগে তারই সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় এসে পড়ে এবং তা হচ্ছে মূল কারণ হিসাবে 'মহান আল্লাহ্‌র' অস্তিত্ব। যেমনভাবে গতির অস্তিত্বের সংগে প্রধান পরিচালকের অস্তিত্ব জড়িত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সব আইন এমন যে, চার-পাঁচ বছরের গড়ে উঠা শিশুও একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে যে 'সৃষ্টিকর্তা একজন থাকতেই হবে।' যিনি এ

মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন।[১১]

সুতরাং দীর্ঘ পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বিজ্ঞান এবং যুক্তি' এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে কেবল একটি প্রস্তাবকেই (৪র্থ প্রস্তাবটি) দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে। তাহলো 'এ মহাবিশ্বটি এক ও একক সত্ত্বা 'মহান রাব্বুল আ'লামিনের' নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী অচিন্তনীয় জ্ঞান এবং শক্তির বলে সৃষ্টি হয়েছে। আবার তাঁরই অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।'

বিজ্ঞানে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তারা অবশ্যই এই চতুর্থ প্রস্তাববটিকেই কেবল 'সত্য এবং সঠিক প্রস্তাব' হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। এর কোন বিকল্প নেই, কারণ বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রযাত্রা এই ডিরেক্শানেই কেবল এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে যা বিজ্ঞানীদেরকেও হতবাক করে দিচ্ছে।

---

১১. চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

কষ্টি পাথর

আল-কুরআন

"এই লোকদের সামনে সে অবস্থা এসে গেছে, যাতে খোদাদ্রোহীতা হতে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে এবং এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার) রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে।" (৫৪ ঃ ৪-৫)

ওপরে বর্ণিত সূরা 'ক্বামার'-এর চার (৪) নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণশীল মানবগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইতোমধ্যেই তাদের সম্মুখে পূর্বের অনেক জাতির সত্য বিরোধিতার করুণ পরিণতি, বহু শাস্তিপ্রদ ঘটনা, আকাশরাজ্য ও জমিন থেকে নানান ধরনের আযাব-গজব ও ধ্বংস-যজ্ঞের বিবরণ, বহুজাতির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও জিল্লতির জীবন গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে, যে বিষয়গুলো থেকে তারা শিক্ষা নিয়ে নিজদেরকে অনুরূপ ব্যর্থতা ও বরবাদি থেকে যদি রক্ষা করতে চায়, তাহলে তাদের পক্ষে তা সর্বোতভাবে সম্ভব। কেননা অতীত এই সকল ঘটনাপ্রবাহ সার্বিকভাবেই সফলতা লাভের জন্য অফুরন্ত তথ্য ও শিক্ষার উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে বুকে ধারণ করে আছে, যা গণনা করেও শেষ করা যাবে না। শুধু অভাব যে জিনিসের তা হলো আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে সত্যের পানে এগিয়ে আসার।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন রাহ্মানুর রাহীম। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু বিধায় 'কুরআন' অবতীর্ণের সময় মানবমন্ডলীকে রক্ষার নিমিত্তে নসিহত করতে গিয়ে অতীতের এই সকল ঘটনাপ্রবাহ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন, এবং সাথে সাথে বিচারের দিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর কোন বান্দাহ্-ই যেন একথা বলতে না পারে যে, 'হে আল্লাহ্ আমরাতো কিছুই জানি না, তোমাকে অস্বীকার করলে, তোমার রাসূল, ফেরেশ্তা, কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল অবিশ্বাস করলে আমাদের ওপর তুমি অসন্তুষ্ট হও, তাতে আমাদের দুনিয়াবী জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি পরকালীন জীবনও ধ্বংস হয়। দুঃখ-লাঞ্ছনা-মুছিবত আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়, এসকল তথ্য লাভ করা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। অতএব, আমরা খোদাদ্রোহীতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারিনি। এতো আমাদের অপরাধ নয়। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা কিভাবে শাস্তি পেতে পারি? যেখানে আমাদের জন্য

উপদেশের-নসিহতের ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা কিরূপে কায়েম হতে পারে? শাস্তির ব্যবস্থা যেখানে কার্যকর, সেখানে পূর্বেই উপদেশ, নসিহত এবং দৃষ্টি আকর্ষণীতো একান্ত জরুরী বিষয়, যা কোন ভাবেই উপেক্ষা করা চলে না'! নীতিগতভাবে এ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ সফলতায় পৌঁছাবার লক্ষেই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় এমনি ধরনের উপদেশ-নসিহত এবং দৃষ্টি আকর্ষণীমূলক অতীত ঘটনাসমূহ বর্ণনার ভিতর দিয়ে মানবমন্ডলীর জ্ঞান রাজ্যকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন, যাতে করে বিবেকবান, ন্যায়চারী ও সত্যপন্থী মানুষগুলো জ্ঞানের মাপকাঠিতে মহাসত্য, অচিন্তনীয় সৃষ্টিকৌশলী ও পালনকর্তা একমাত্র 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের' ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বিদ্রোহ মূলক আচরণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারে।

উক্ত চার নম্বর আয়াতের বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, এর দাবী 'কুরআন' অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল এবং পরবর্তী সমসাময়িক কালের মানুষের উপরই বেশি প্রযোজ্য হয়ে থাকবে, যে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগত তখনো উন্মোচিত হয়নি, এবং সাধারণভাবে তখন বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের তেমন আকর্ষণবোধও ছিল না। তবে বর্তমান বিজ্ঞান জগতের মানবমন্ডলীও যে ঐ আয়াতের আওতাবহির্ভূত নয় সে কথা অনস্বীকার্য। বরং বলা যায় বর্তমান মানবমন্ডলী চার নম্বর এবং পরবর্তী পাঁচ নম্বর উভয় আয়াতের-ই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বর্তমান জগতের মানবমন্ডলীকে এক ধাপ বাড়তি নিদর্শন পেশ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন এই বলে যে 'আল্লাদ্রোহীতার' পথ ছেড়ে দিয়ে সত্য-সঠিক-সরল পথ আল্লাহ্‌র পথে চলার জন্য, 'আল্লাহ্' যে একজন আছেন যিনি মহাজ্ঞানী এবং প্রচন্ড ক্ষমতা বলে সকল কিছু সৃষ্টি করে অদৃশ্য থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে ও শৃংখলার সাথে সবকিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা জানা এবং বুঝার জন্য হাজারো বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের সামনে থালা মেলে ধরেছে। সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর প্রতিনিয়ত আশ্চর্যজনক কার্যাবলী বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। প্রায় সমগ্র বিজ্ঞানীমহল আজ একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রযাত্রার কারণে মানবসম্প্রদায় জ্ঞানের উন্নততর সোপানে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে। বলা যায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জন্য উন্নত জ্ঞান বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি নির্ধারণে এবং সকল প্রকার ভৌতিক ও

রাসায়ণিক বিক্রিয়াজনিত কাজের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাঁকে দর্শনলাভে সক্ষম হচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানের নব নব উদ্‌ঘাটন সদাচারী-ন্যায়পরায়ণ সত্যপন্থী ও জ্ঞানবান মানুষকে আল্লাদ্রোহীতা থেকে বিরত রাখার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট। তারা জ্ঞানচক্ষু দিয়ে ঠিকই বুঝতে পারে যে বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই একমুখী অর্থাৎ, একই ডিরেকশানে কেবল এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন উদাহরণ দিয়েই বলা যায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় আবিষ্কার, শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি, গ্যালাক্সী, সৌরজগত, ধূমকেতু, গ্রহাণু, উল্কা, কোয়াসার, পালসার, সুপার নোভা, নিউট্রন স্টার, ব্ল্যাক হোল, ক্লাস্টার, ইত্যাদির আবিষ্কার ও তাদের সৃষ্টি, বিবর্তনধারা ও ধ্বংস সম্পর্কীয় তথ্যের

চিত্রঃ ৪৮

"এবং এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে" (৫৪ : ৫)। মহাবিশ্বের হাজারো-লক্ষ আবিষ্কৃত বিষয় তাদের সার্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে যেন 'এক মহাজ্ঞানী প্রচন্ড ক্ষমতাশালী সৃষ্টিকর্তার' সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে এবং এক-একটি 'ল্যান্ড মার্ক' হয়ে ধরা দিচ্ছে।

পাশাপাশি ১১২টি মৌলিক পদার্থ, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর অচিন্তনীয় রহস্যাবলী, প্রাণ সৃষ্টির জটিল ক্রমধারা, জীবজগত ও উদ্ভিদ জগতের শত-

চিত্রঃ ৪৯
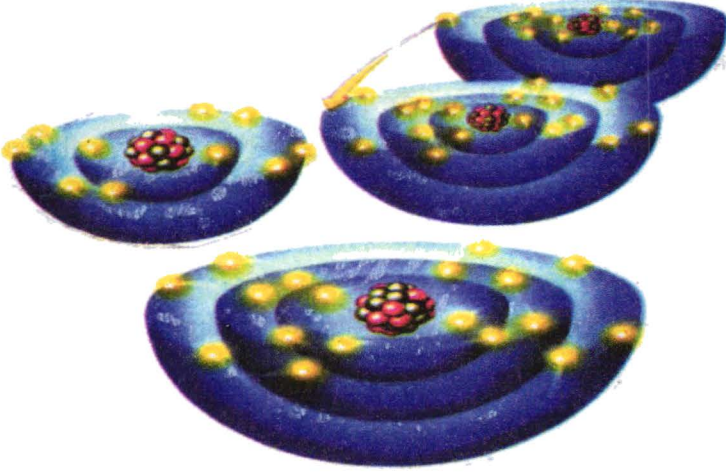
"তারা কি লক্ষ্য করেনা কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন? অত:পর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান? এটাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ !" (২৯ ঃ ১৯)
বর্তমান বিজ্ঞানের বদৌলতে মানবমন্ডলীর সম্মুখে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশের (পরমাণুর) রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গোটা বিশ্বব্যাপী মহান আল্লাহ্র মহীমা-গুণগান সগৌরবে ছড়িয়ে পড়ছে।

সহস্র জটিল ব্যবস্থাপনা রোগ-ব্যাধি ও নিরাময়,জীবকোষের ক্রমউন্নতি ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য রকমের তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে 'এক আল্লাহ্কে' বাদ দিয়ে যেন বিজ্ঞান এখন আর এক কদমও সামনে চলতে পারছে না। প্রতিটি আবিষ্কার গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে শেষবিন্দুতে এসে একটি প্রশ্নই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় যে, কে তিনি, যিনি কর্তা হিসাবে সকল ক্রিয়ার মূলে সক্রিয় অথচ অদৃশ্য? কি তাঁর পরিচয়, যিনি মহাবিশ্বের সকল কিছুকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলা ও ক্রমের ধারায় ব্যবস্থিত করে রেখেছেন, যার সামান্যতম লংঘন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের একটাই উত্তর, আর তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' একজন আছেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর অচিন্তনীয় জ্ঞান ও

শক্তির বলেই তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করে যথাযথভাবে আবার সব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। পরিশেষে সব তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছে—এর কোন বিকল্প নেই, কোন ব্যতিক্রম নেই, নেই কোন পরিবর্তন। তিনি চিরন্তন-শাশ্বত ও কালজয়ী। তিনি পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশ্য আবার গোপনীয়। তাঁর জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁকে কেউ দর্শন লাভ করতে পারে না, তিনিই সব সৃষ্টিকর্তা। মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। সকল শক্তির উৎস তাঁর হাতের মুঠোয়। গোটা সৃষ্টি জগত তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন বরং সবাই তাঁর কাছেই জবাবদিহি করতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। মহাবিশ্বকে (Universe) এক সময় তিনি গুটিয়ে নেবেন তাঁর ইচ্ছামত।

তাই পাঁচ নাম্বার আয়াতের পর্যালোচনার শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায়—'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনকে' একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য অনুযায়ী জীবননির্বাহ করার জন্য যে যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ উপদেশ-নসিহতের প্রয়োজন, তা কিন্তু ইতোমধ্যেই মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞোচিতভাবে। বিজ্ঞানের অবদানে আজ এ কথা বলার উপায় নেই যে, 'স্রষ্টা আবার কে? আমাদের কোন প্রভু আছে না-কি? আমরা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছি, আবার এমনিতেই মরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবো। আমাদেরকে সত্যই কি আবার জীবিত করা হবে? আমাদের পুনর্জন্ম কি সম্ভব? জীবন তো শুধু এই পৃথিবীতেই, আর কোথাও নয়! আমাদের সৃষ্টির পেছনে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কার্যকর আছে না-কি? এ ধরনের দু-একটি নয়, বরং হাজারো প্রশ্নের উত্তর ,ইতোমধ্যেই সেই বিজ্ঞান প্রসব করেছে, যে বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কিছু তথ্যকে ভুল বুঝে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে মহাসত্যকে অস্বীকার করে সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছেন।

ভাবতে অবাক লাগে—রাশিয়ার 'ইউরি গ্যাগারিন' পৃথিবী প্রথম প্রদক্ষিণ করে এসেই দাম্ভিকতার স্বরে সাংবাদিকদের রিপোর্ট করেছিলেন এই বলে যে, 'পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলাম কিন্তু মুসলমানদের 'আল্লাহ্কে' তো

দেখতে পেলাম না।' তিনি যদি এখন বেঁচে থাকতেন, তাহলে তার এ
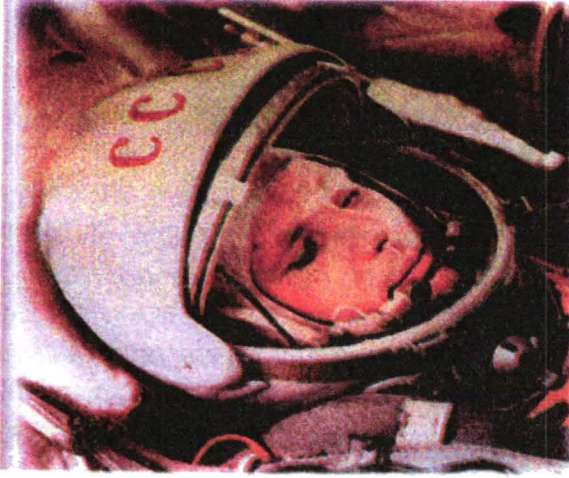
চিত্রঃ ৫০
রাশিয়ান নভোচারী 'ইউরি গ্যাগারিন'
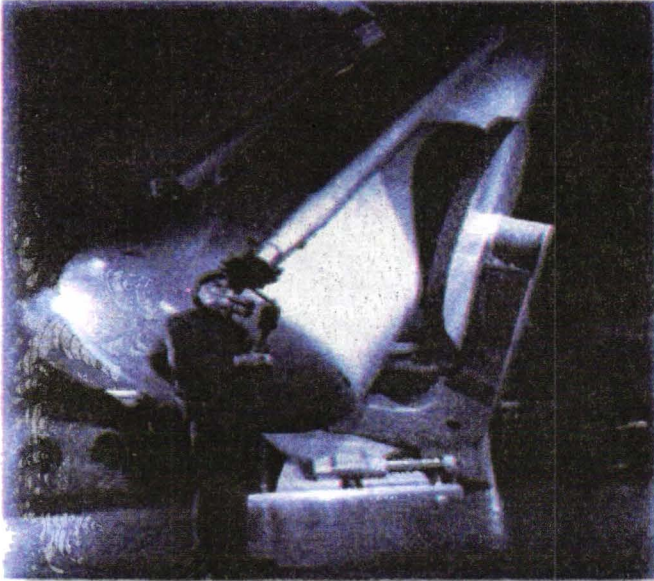
চিত্রঃ ৫১
আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ হাবেল পাওয়েল' ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশমন্ডলীর গোপন রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন। ফলে সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য সৃষ্টির কিছুটা অংশ মানুষ অবলোকন করার সুযোগ পায়।

কথার জন্য কত শতবার যে ক্ষমা চাইতেন তার কোন ইয়ত্তা থাকতো না। কারণ তখন তিনিসহ সবাই মহাবিশ্ব বলতে, আমাদের সৌরজগতসহ খালি চোখে দেখা যায় এই নগণ্য আকাশকেই মনে করতেন। এর বেশি নয়। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান ১৯২০ সালে 'টেলিস্কোপ' (Telescope) দিয়ে মানুষের জ্ঞান রাজ্যের দরজা খুলে দেয়। মানুষ হতবাক হয়ে দেখার সুযোগ পায়। খালিচোখে দেখা মহাকাশ, তা তো মূল মহাবিশ্বের মাঝে বালু-কণার মত বরং আরো ক্ষুদ্র। খালিচোখে দেখা মহাকাশ তা আমাদের গ্যালাক্সী 'মিল্কি ওয়ের'ই একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পুরোটাও নয়। আমাদের এই গ্যালাক্সী-তে প্রায় বিশ হাজার কোটির (২০,০০০ কোটি) ওপরে সূর্য (নক্ষত্র) অবস্থান করছে, যা এক লক্ষ আলোক বৎসর (প্রায়) এরিয়া ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। অর্থাৎ, আলোর গতিতে ভ্রমণ করলেও আমাদের গ্যালাক্সীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছুতে প্রায় একলক্ষ (১,০০,০০০) বছর লেগে যাবে। এ ধরনের শত সহস্র গ্যালাক্সী এখন টেলিস্কোপ দিয়ে মানুষ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় একশত কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান মানুষ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের কথামত এই একশত কোটি (প্রায়) গ্যালাক্সী তাও মহাবিশ্বের মাত্র ১০% ভাগ-এর ভেতর দেখা যাচ্ছে। মহাবিশ্বের বাকী ৯০% ভাগ মানুষ কখনই জানতে পারবে না, তা চিরদিনই অজানা থেকে যাবে। তাহলে যেখানে সৃষ্টিকে দেখেই শেষ করা
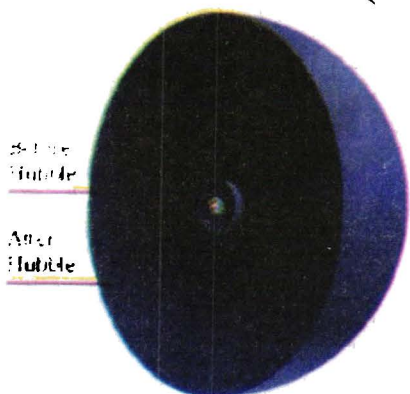
চিত্রঃ ৫২

মিঃ হাবেল পাওয়েল-এর আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ মহাবিশ্বের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র দর্শন লাভ করতো। ১৯২০ সালে মিঃ হাবেল টেলিস্কোপ দিয়ে সেই দর্শন সীমার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন। বর্তমানে উক্ত সীমা প্রায় তের হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত।

যায় না, সেখানে স্রষ্টাকে কি ভাবে দেখা যেতে পারে? সে জ্ঞান-ই বা কোথায়? প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টাকে দেখা যাবে তাঁর সৃষ্টির ভিতর। তাই বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্কারকেই আল্লাহ্ পাক সেভাবে 'মোড়কে' (ডিজাইনে) সাজিয়ে দিচ্ছেন, যেন মানুষ এর কারণ, এর কর্তা খুঁজতে গিয়েই 'আল্লাহ্‌কে' উদ্‌ঘাটন করে। আর সে কারণেই তিনি পবিত্র কুরআনের উক্ত পাঁচ নম্বর আয়াতে বলে দিলেন "আল্লাহ্‌দ্রোহীতা থেকে বিরত থাকার জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ তোমাদের সামনেই রয়েছে, যা পর্যালোচনা করে হেদায়েত লাভের জন্য শিক্ষিত সমাজের জন্য যথেষ্ট।" এর চাইতে বাস্তবভিত্তিক, উত্তম জ্ঞান হতে পারে কি? যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে লিপ্ত, সেই বিজ্ঞানের আলোতেই "আল্লাহ্" কে চেনার জন্য, তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য, তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্য জ্ঞানবান সমাজ এগিয়ে না আসার কি কোন কারণ থাকতে পারে?

চলুন তাহলে ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরবের মরুপ্রান্তরে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিজ্ঞানময় প্রস্তাব' এবং বর্তমান বিজ্ঞানের সাফল্যজনক অগ্রযাত্রায় আবিষ্কৃত বিষয়গুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করে দেখি 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সত্যতা বহন করে কি-না?

সত্যের সন্ধান

দীর্ঘ দিন থেকে কিছু সংখ্যক শিক্ষিতের মাঝে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিস্তার করে চলেছে যে, সেই 'একক স্রষ্টার' পরিচয় কি? তাঁকে সঠিকভাবে জানার মত এবং তাঁর ইচ্ছা অবহিত হওয়ার মত কোন ধর্ম, কোন গ্রন্থ বা পুস্তক ধরাপৃষ্ঠে আছে কি? যা একাধারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুক্ষ্মপরিমাপে সৃষ্টি সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে সমর্থ এবং পদার্থ বিদ্যা, গণিত, রসায়ণ, জৈব রসায়ণ ইত্যাদি জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম?

উত্তরে বলতে চাই, হ্যাঁ, আছে, 'আল্-কুরআন' মানবজাতির জন্য সর্বশেষ আল্লাহ্‌র বাণী সম্বলিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থটিতে একাধারে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, বিচার-ফায়সালা, শাসন-ব্যবস্থা, যুদ্ধ-সন্ধি, পারিবারিক-সামাজিক বিধি-বিধানসহ মানুষের জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর বর্ণনার পাশাপাশি মহাবিশ্বের সুবিস্তৃত বিজ্ঞানের তথ্যসমূহও প্রকাশ পেয়েছে, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এত ব্যাপকভাবে এবং উন্নততর পন্থায় প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি এ সম্পর্কে ফ্রান্সের ডঃ মরিস বুকাইলির মন্তব্য হচ্ছে – 'It is impossible to explain how a text produced at the time of Qur'an could have contained ideas that have only been discovered in modern times.' [১২]

একইভাবে ভারতীয় পন্ডিত ব্যক্তিত্ব 'সুখরাজ তারনেজা' (Sukhraj Tarneja) মন্তব্য করেন এভাবে – The explanation of Qur'an stands as the most astonishing Surprise to modern man.... The speculations of modern physics are drawing close to the same conclusion (as of Qur'an)...this conclusion is no longer theory but is based on scientific observation.[১৩] 'সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞান অভিজ্ঞ মানুষের কাছে অতিশয় বিস্ময়কর।... বিস্ময়কর এ জন্যে যে কুরআনের প্রস্তাবের সংগে আধুনিক

---

১২. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান – ড. ম. বুকাইলি

১৩. আল্-কুরআন ঃ দ্যা চ্যালেঞ্জ। মহাকাশ পর্ব - ১

পদার্থ বিজ্ঞান খুঁজে পাচ্ছে এক অপূর্ব মিল। কুরআনের এই সকল সিদ্ধান্ত আজ আর কোন তত্ত্ব নয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষণ নীতির অবলোকন পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। বিজ্ঞান যেভাবে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মহাবিশ্বের বিজ্ঞান বিষয়ক মহাসত্য গুলো আবিষ্কার করছে, তাতে ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরবের মরুপ্রান্তরে অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনে' বর্ণিত বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যগুলো বিশ্ববাসীর সামনে 'প্রমানিত সত্য' হিসাবে নতুন করে মেলে ধরছে।

উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার পূর্বেই আমরা মূল মহাগ্রন্থ 'আল্-কুরআনকেই' সংক্ষিপ্তাকারে একটু জানার চেষ্টা করি। কারণ কুরআন যে সত্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত, তা জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা যে থেকে যাবে, তাতে কোনই সন্দেহ্ নেই। অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর এত কদর, মিথ্যা আছে বলেইতো সত্যের দাম বেশি, রাত আছে বলেই দিনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহ বেশি। ঠিক তেমনি মানুষের তৈরী করা ধর্ম এবং পূর্বের রহিত ধর্মগুলোর অস্তিত্ব মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করছে বিধায় মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বাণী বুকে নিয়ে মহাগ্রন্থ 'আল্-কুরআন' বর্তমান মানবসমাজে 'হীরক খন্ডের' মত লোভনীয় হয়ে বিরাজ করছে। তাই এ গ্রন্থকে জানার প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে, সৃষ্টিকর্তাকে জানতে হলে – 'কুরআনকেই' জানতে হবে প্রথম।

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কুরআন-ই এমন এক অদ্বিতীয় অত্যাশ্চর্য রচনাবলী হিসাবে মানবসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে যা কুদরতী বাণী এবং একক অনন্যের অধিকারী বলে কম্পিউটার কর্তৃকও প্রমাণিত হয়েছে। কম্পিউটার (Computer) প্রযুক্তিতে গোটা কুরআনকে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে– সর্বক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এসেছে, কুরআনের ভাব, ভাষা, প্রস্তাব, আদেশ, নিষেধ, গতি, দৃঢ়তা নিয়ম-কানুন, শৃংখলা ইত্যাদি সব কিছুই প্রমাণ করে এটা মানুষের তৈরী করা কোন গ্রন্থ নয় – হতে পারে না। আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরব মরুতে সভ্যতার আলোকবিহীন গুমোট এক অন্ধকার অমানিশায় অক্ষরজ্ঞানহীন (উম্মী) নবীর উপর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়ে তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত-সহস্র মণি-মুক্তা বিছিয়ে গেছে, যা কেবল বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার পরিবেশেই মানুষ প্রথমবারের মত সর্বোচ্চ জ্ঞান

দিয়ে ঐ জ্ঞানময় বাণীগুলোর (প্রস্তাবের) আবরণ উন্মুক্ত করতে সফল হয়েছে। ভাবতে শরীর শিউরে ওঠে কি করে একজন মরুচারির পক্ষে এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানময় বাণীসমূহ প্রচার করা সম্ভব; যদি সত্যই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তাঁকে এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সরবরাহ না করে থাকবেন? এ বিষয়টি জ্ঞানবান সমাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রমাণ করে যে, 'কুরআন' সত্য-সত্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ।

চিত্র ঃ ৫৩

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর প্রযুক্তি কম্পিউটারও 'কুরআন'কে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেছে যে, কুরআনের ভাষা, ভাব, প্রস্তাব, আদেশ, নিষেধ, গতি, দৃঢ়তা, নিয়ম-কানুন, শৃংখলা ইত্যাদি সবকিছুই প্রমাণ করে এটা মানুষের তৈরী কোন গ্রন্থ নয়। "এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ।" (৪৫ঃ ২)

কম্পিউটারলব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ যদি হুবহু পবিত্র কুরআনের মত করে সমশব্দে, সমবাক্য সংখ্যায়, সমান সংখ্যক অক্ষরে অনুরূপ বৈশিষ্টের একখানা কুরআন রচনার চেষ্টা করে, তাহলে ৬২৬X $১০^{২৪}$ অর্থাৎ ৬২৬ এরপর ২৪টি শূণ্য বসিয়ে যে বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে, ঠিক তত বৎসর প্রয়োজন পড়বে, এবং ৫০০কোটি লোককে অবশ্যই উল্লেখিত বিরাট সংখ্যার সমান বৎসর জীবিত থাকতে হবে। তাহলে হয়তোবা একবারের মত একটি কুরআন রচনা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাস্তবে কি এটা সম্ভব? কক্ষণই তা সম্ভবপর নয়।

(Computer) এই কালজয়ী রায় প্রদান করার সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তার ঐ পবিত্র বাণীকেও প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়, যে পবিত্রবাণীতে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্বের মানবমন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে, "(হে মুহাম্মদ) বল, কুরআনের মত করে অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবমন্ডলী এবং জ্বীন জাতি সবাই মিলে পরস্পর সহযোগিতা করেও যদি চেষ্টা চালায়, তবু তারা তা করতে সমর্থ হবে না" (১৭ ঃ ১৮)। বিস্ময় জাগে কত নির্ভুল ও সঠিক মাপকাঠির উপর সৃষ্টিকর্তার পবিত্র বাণীসমূহ প্রতিষ্ঠিত যে মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেই কেবল তা নিরপেক্ষভাবে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত হয়ে মহাসত্যের পানে আমাদেরকে ডাক দিয়ে যায়। এ বিষয়ে অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্‌র বাণীর গাম্ভীর্যতা, মর্যাদা, ব্যাপকতা ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য 'আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিন' পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন – "বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবু আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আবারও সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনা হয় (তাও শেষ হয়ে যাবে, অথচ তখনও আল্লাহ্‌র বাণী শেষ হবে না)" (১৮ ঃ ১০৯)। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তায়ালার পবিত্র বাণী এবং মানুষের জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটার (Computer) নামক যন্ত্র বিচারকের রায় এক ও অভিন্ন।

'কথায় পটু' মানুষকে আল্লাহ্‌ তায়ালা আহ্‌বান করেছেন, যদি তাদের এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে গোটা কুরআনতো দুরের কথা, কুরআনের আয়াতের অনুরূপ ১০টি আয়াতও যদি পারে তাহলে যেন তা রচনা করে দেখায়। যদি তারা সত্যই যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে। এভাবে বেশ কয়েকবারই আহ্‌বান করা হয়েছে আরবী ভাষাভাষী অমুসলিমদেরকে। বিগত ১৪০০ বৎসর ধরে মিশরে, জর্দানে, সিরিয়ায়, ইরাকে লক্ষ-লক্ষ আরবী ভাষী অমুসলিম মনীষী, বিদ্যান – পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ বসবাস করছেন, কিন্তু পবিত্র কুরআনের এই খোলা চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে তারা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পক্ষ

থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকবে, যে কেউ ইচ্ছে পোষণ করলে যে কোন সময় এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে – কুরআন সে কথা উন্মুক্তভাবে সবার সামনে মেলে ধরেছে।

পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীসম্ভার তা এই গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পরবর্তীসময়ে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হওয়ার মধ্যদিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

ইসলামের শিশুবস্থায় বিশ্বে তখন 'সুপার পাওয়ার' ছিল 'রোমান সাম্রাজ্য' এবং 'বাইজানটাইন সাম্রাজ্য'। মদীনায় ইসলাম তখন্ হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থা। এই সময়ে ৬১৩ খৃঃ ঘটে গেল তদানীন্তন দুই সুপার পাওয়ারের মধ্যে লড়াই। এই যুদ্ধে রোমান বাহিনী ব্যাপকভাবে পরাজয় বরণ করলো এবং বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের পারসিক (অগ্নিপূজক) বাহিনী জয়লাভ করলো। ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে পড়লো যে 'আসমানী' কিতাবধারীদের পরাজয় ঘটলো – অগ্নিপুজক ও মূর্তিপুজকদের কাছে।' এ সংবাদে মদীনায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের মন দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়লো। তারা নিজেদের ভিতরেই কোনঠাসা হয়ে যেতে লাগলো। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন মুসলমানদের মনে সাহস এবং হিম্মত সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্ববাণী সম্বলিত ওহী প্রেরণ করলেন মানবসমাজের সামনে, যেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়া হলো ঐ দুই বাহিনী সম্পর্কে যা পবিত্র কুরআনের সূরা 'রোম' – এ সন্নিবেশিত হয়েছে। "রোমান বাহিনী নিকটবর্তী ভূমিতে (ইরানে) পরাজয় বরণ করেছে, এবং তাদের এই পরাজয় বরণের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র-ই আর সেইদিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে।" (৩০ ঃ ২,৩,৪)

ইতিহাস সাক্ষী, 'History of The Byzantine State' – এ উল্লেখিত হয়েছে, যে রোমান বাহিনী ৬১৩ খৃঃ পরাজয় বরণ করেছিল পারসিকদের নিকট এবং সকল ফ্রন্টে পারসিকদের প্রচন্ড দাপট পরিলক্ষিত হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ ভেবেছিল পারসিয়ানদের আর কেউ পরাজিত করতে পারবে না এবং তারা ঐ সময় ইয়েমেন পর্যন্ত নিজেদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ৬২২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বকে চমক লাগিয়ে, নয় (৯) বছরের মাথায়ই রোমান বাহিনী পূনর্গঠিত হয়ে পারসিক সাম্রাজের অন্তর্গত 'আর্মেনিয়ার' মাটিতে প্রচন্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে

পারসিয়ানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং সমগ্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

তদানীন্তন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত 'সুপার পাওয়ার' সম্পর্কে মহান রাব্বুল আ'লামিনের নয় (৯) বৎসর পূর্বের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী কাঁটায়-কাঁটায় বাস্তবে প্রমাণিত হয় এবং তাতে মদীনার মুসলমানদের ঈমান শত-সহস্রগুণে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করার সুযোগ পায়। এই যুগান্তকারী ভবিষ্যৎবাণী কি প্রমাণ করে না যে, মহান সৃষ্টিকর্তা– প্রভু 'আল্লাহ্' একজন আছেন এবং তাঁর প্রেরিত 'রাসূল' ও 'পবিত্র কুরআন' পুরোপুরি সত্যমন্ডিত? যেখানে মানুষের এক সেকেন্ড পূর্বের কোন কথা অকস্মাৎ ফলে গেলে তার জন্য আবেগে আপ্লুত হয়ে মানুষ উৎসব পালন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, সেখানে মহান আল্লাহ্র নয় বৎসর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখেও কি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মানুষ কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় অন্তরে পোষণ করতে পারে?

অনুরূপ আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা সুরা 'কাউসার' এ উল্লেখিত হয়েছে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াতের প্রথমদিকে মক্কায় যখন তাঁর সন্তান এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কাফের সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়ার নিমিত্তে এবং উত্যক্ত করার জন্য 'মূলকাটা' বা 'জড়কাটা' বলে সম্বোধন করতো এবং এ বিষয়ে তাঁর সামনেই হাঁসি-তামাশা করে মজা লুটতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন এ অবস্থায় তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং কাফেরদের এ জঘন্য কাজের পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ করেন যা কাফের সম্প্রদায়ের জন্য ফাইনাল নোটিশের মত পরবর্তীতে কাজ করে। "(হে নবী), আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। কাজেই আপনি নিজের রবের জন্যই নামাজ পড়ুন ও কোরবানী করুন। আপনার দুশমনরাই মূল কাটা।" (১০৮ ঃ ১-৩)

এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না, বরং এটা ছিল একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। যখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তখন মক্কায় লোকেরা নবী করীম (সঃ)-কে জড়কাটা বা শিকড়কাটা (অবতার) মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারেনি যে কুরাইশদের বড় বড় সর্দাররা আবার কেমন করে শিকড়কাটা হয়ে যাবে? তারা কেবল মক্কায় নয় সারা দেশেই খ্যাতিমান ছিল, তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও

সন্তান-সন্ততির অধিকারীই ছিল না; সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও হজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ম সনে 'আহ্যাব' যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদী গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিকে পরীখা খনন করে প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হলো। এর মাত্র তিন বছর পর ৮ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন দশ (১০) হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করলেন, তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য-সহযোগীতা দানকারী ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাদেরকে অস্ত্র সমর্পন করতে হলো। এরপর মাত্র এক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব দেশ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর করতলগত হয়ে গেলো। সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে তাঁর পবিত্র হাতে বাই'য়াত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্য-সহায়হীন হয়ে পড়লো। তারপর ক্রমান্বয়ে তাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে গেল এমনভাবে যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল, আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শত্রুদের সন্তান। আর কেউ জেনে থাকলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়।

বিপরীতপক্ষে রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)-র পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পড়া হচ্ছে এবং তাঁদের পরকালীন মান-মর্যাদা প্রতিদিন আরো বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা হচ্ছে। কোটি-কোটি মুসলমান শেষ নবীর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ববোধ করছেন। লাখো-লাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার-পরিজন এমনকি তাঁর সাথীদের পরিবার-পরিজনের সাথে সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করেন। এখানে কেউ সাইয়্যেদ, কেউ কাদেরী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দীকী, কেউ উসমানী, কেউ যবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) শিকড়কাটা বা মূলকাটা নন; বরং তাঁর

শত্রুরাই প্রকৃত পক্ষে শিকড়কাটা, মূলকাটা।[১৪] এ ধরনের অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র কুরআনের পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে, যা মেঘমুক্ত আকাশে প্রখর সূর্যের আলোর মত ঘোষণা করছে– সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' আছেন একথা সত্য, তাঁর রাসূল সত্য ধর্ম নিয়েই এসেছেন এবং পবিত্র কুরআন সত্যবাণী নিয়েই ধরার বুকে আগমন করেছে।

পবিত্র কুরআনের অগণিত মু'জেজার (Miracle) মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোটা কুরআনময় '১৯' সংখ্যাটির কল্পনাতীত সংশ্লিষ্টতা যা শাব্দিক বুননে, সংখ্যার বুননে, আপনাকে প্রতিমুহূর্তেই করবে বিমোহিত। আপনি ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলবেন যে ২৩টি বছরের দীর্ঘ সময়ে প্রায় ২৪,০০০ বার জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক আনীত আল্লাহ্‌র বাণীর পরতে পরতে এই '১৯' সংখ্যার যাদুময়ী প্রভাব অক্ষুন্ন রাখা কি করে সম্ভব? আপনার মন আপনারই অজান্তে বলে উঠবে নিঃসন্দেহে এ কুরআন মানুষের তৈরী হতে পারে না, বরং সর্বকালদ্রষ্টা সর্বকালেই যিনি বর্তমান, সকল বিষয়ে যিনি মহাজ্ঞানী, কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব এ ধরনের অচিন্তনীয় একখানা গ্রন্থ সৃষ্টি করা বা রচনা করা।

বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনের যে দিকটি বহুল আলোচিত হচ্ছে তাহলো তাতে '১৯' সংখ্যাটির প্রয়োগ, সামঞ্জস্যতা ও তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন কুরআনের ৭৪ নং সূরার ৩০নং আয়াতে বললেন "ইহার ওপরে আছে '১৯'।"

এই '১৯ সংখ্যাটির মাহাত্ম বের করার জন্য লেবাননের অধিবাসী ডঃ রশীদ খলিফা মিসরী সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্ভূলভাবে কম্পিউটারে সেট্ করেন। তারপর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে তিনি প্রমাণ করলেন–কুরআনের বিন্যাসে, বিভাগে ও কাঠামো রচনাতে '১৯' এর বিবেচনা অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কুরআন সংরক্ষণের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে এগুলো প্রমাণিত সত্য। সর্বপ্রথম 'হেরা গুহায়' মুহাম্মদ (সঃ) উপর যে অহী অবতীর্ণ হয়, তা ছিল সূরা 'আলাক' এর প্রথম ৫টি আয়াত, যে সূরাটি পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে ১৯টি আয়াতেই

১৪. তাফ্হীমুল কুরআন।

সম্পন্ন হয়েছে। আবার কুরআনের শেষের দিক থেকে সূরাটির অবস্থান হচ্ছে ১৯তম।

চিত্রঃ ৫৪
মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' মহাগ্রন্থ 'আল্‌-কুরআন'-র মধ্য দিয়ে নিজেকে জ্ঞানবান সমাজের নিকট প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় তাঁর নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শন করার পর তাঁর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দায়িত্ব সম্মানিত পাঠকের নয় কি?

এরপর পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সূরা 'ফাতিহা' (The Opening)। যার প্রথম হচ্ছে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' এবং এই বিখ্যাত আয়াতটির অক্ষর সংখ্যাও হচ্ছে সর্বমোট ১৯, আবার এই আয়াতের মধ্যে ৪টি মূল শব্দ – ইসম, আল্লাহ্, রহ্‌মান ও রাহীম ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলো আল-কুরআনে যে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেকই '১৯' দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। (اسم) 'ইসম' শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯ বার (১৯X১=১৯)। (الله) 'আল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ২৬৯৮ বার (১৯ X১৪২=২৬৯৮)। (الرحمن) 'আর-রাহ্‌মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৫৭ বার (১৯X৩ = ৫৭)। (الرحيم) 'আর-রাহীম' শব্দটি সর্বমোট ১১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে (১৯ X ৬ = ১১৪)।

তারপর পবিত্র কুরআনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি, যা '১৯' সংখ্যাটি দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াতটি ১১৩টি সূরার প্রথমেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল সূরা 'তাওবা'-তে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু অন্য এক সূরাতে দুই বার ব্যবহৃত হওয়াতে আয়াতটির সর্বসাকুল্যে সংখ্যা হচ্ছে ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

ডঃ রশীদ খলিফা পবিত্র কুরআনের হরফে 'মুয়াত্তালাত'-আলিফ, হা, বা, সীন, সোয়াদ, তোয়া, আইন, কাফ, ক্কাফ, লাম, মীম, নুন, হা, ইয়া (ا ب ح س ص ط ع ك ق ل م ن ه ي) এই ১৪টি বর্ণে গঠিত আলিফ লাম মীম, আলিফ লাম রা, হা মীম, তোয়া সীন, ইয়া সীন, তোয়া হা, সোয়াদ, নুন, ক্কাফ, আলিফ লাম মীম সোয়াদ, আইন সীন ক্কাফ তোয়া সীন মীম, ক্কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ, আলিফ লাম মীম রা,

(الم – الر – حم – طس – يس – طه – ص – ن – ق – المص - عسق طسم – كهيعص – المر)

এই ১৪টি সেটে মোট ২৯টি সুরায় ব্যবহৃত বিষয়টি যোগ করলে (১৪+১৪+২৯)=৫৭, যা '১৯' দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন–কোন একটি সূরা কোন একটি বিশেষ অক্ষর বা তার কথামত কোডের দ্বারা যখন শুরু হয়, তখন সেই সুরাতে সেই কোডের অক্ষর বা অক্ষরসমূহ যতবার আসে, সে সংখ্যাটি পৃথকভাবে সকল সময়ই '১৯' দ্বারা বিভাজ্য এবং সমষ্টিগতভাবেও '১৯' দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

৫০নং সূরায় 'কাওমে লুত' সম্পর্কে ১২টি স্থানে কথা আনা হয়েছে। সূরার ১৩নং আয়াতে 'ইখওয়ানে লুত' শব্দটির ব্যবহার খুবই চমকপ্রদ। বাকী ১১টি আয়াতে 'কাওমে লুত' ব্যবহার করা হয়েছে। ১৩নং আয়াতেও যদি 'কাওমে লুত' শব্দটি ব্যবহার করা হতো, তাহলে পুরো সূরাটিতে 'ক্কাফের' (ق) সংখ্যা ৫৮ হয়ে যেতো যা '১৯' দ্বারা নিঃশেষে বিভাজনে সম্ভব হতো না। ভেঙ্গে পড়তো '১৯'-এর মাহাত্ম, ছিন্ন হয়ে যেত '১৯'-এর অলৌকিকত্ব। নিঃশেষ হয়ে যেত অলৌকিক সুসামঞ্জস্যতা। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটি কি এক মহাজ্ঞানী সত্ত্বার উপস্থিতির স্বাক্ষর বহন করে না?

উক্ত '১৯' সংখ্যাটি এবং কুরআনী কোড-অক্ষর গুলোর মাঝে অনুরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত কুরআনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠকের সচেতনতাকে জাগ্রত করার জন্য এ ব্যাপারে আর কেবল একটি উদাহরণ পেশ করছি। ৭নং সুরার ৬৯নং আয়াতটিতে ব্যবহৃত 'বাসতাতান' (بَصْطَةً)

শব্দটি আরবী ব্যাকরণ রীতিবিরুদ্ধ। এই শব্দটি লিখবার কথা 'ছিন' 'س' দিয়ে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের 'ص' দিয়ে লিখা হয়েছে। এই ৭নং সূরার কুরআনী কোড হলো 'আলিফ লাম মীম সোয়াদ' (المص) । তাই এই সূরার এই আয়াতটির উল্লেখিত 'বাস্‌তাতান' শব্দটি যদি 'س' দিয়ে লিখা হতো, তাহলে কোড অনুযায়ী 'ص' -র সংখ্যা ৭, ১৯ ও ৩৮ নং সূরার সম্মিলিত সংখ্যা হয়ে পড়তো ১৫২টির স্থলে ১৫১টি যা ১৯ দ্বারা অভিবাজ্য। ফলে ছিন্ন হয়ে পড়তো '১৯'-র মাহাত্ম। হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত যে সাহাবীগণ এই আয়াতটি লিখার সময় হুজুর (সঃ) (س) এর স্থলে 'ص' দিয়ে লিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। জবাবে সাহাবীগণ এটা আরবী রীতিবিরুদ্ধ বলে জানালে হুজুর (সঃ) বললেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিবরাইল কর্তৃক বিশেষ নির্দেশ বিধায় 'ص' দিয়েই লিখতে হবে, আর তখন থেকেই এভাবে লিখিত হয়ে আসছে। বাস্তব এ ঘটনাটি আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে এক মহাজ্ঞানী মনীষার অস্তিত্বের ছোঁয়া কি দোলা দিয়ে যায় না?

'১৯' সংখ্যাটিতে মূল ১০টি সংখ্যার (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০) মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা ১ এবং ৯ বিদ্যমান। ফলে সংখ্যার শুরু এবং শেষ এতে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যা আল্‌-কুরআনের নিরাপত্তার প্রকাশ হিসাবে বিরাজ করছে "কোন মিথ্যা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাদ দিক হইতে" (৪১ ঃ ৪২)[১৫]। সাথে সাথে এও বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে পবিত্র কুরআনে এই '১৯' সংখ্যাটির অসংখ্য মো'জেজা (Miracle) কম্পিউটার (Computer) সমৃদ্ধ ১৯ শতকের পরেই কেবল সম্ভব হয়েছে, পূর্বে নয়। এখানেও '১৯'-র আশ্চর্যজনক খেলা। এ যেন দুর্বোধ্য '১৯' সংখ্যার 'চেইন অফ মিরাকলস' (Chain of Miracles) যা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না।

উল্লেখ্য বিষয়টি ব্যাপক জ্ঞানসম্পন্ন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যাপার। যা একটু গবেষণার সুযোগ হলে অবিশ্বাসীদের অন্তরের বদ্ধ কপাট খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

---

১৫. আল্‌-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ – মহাকাশ পর্ব - ১
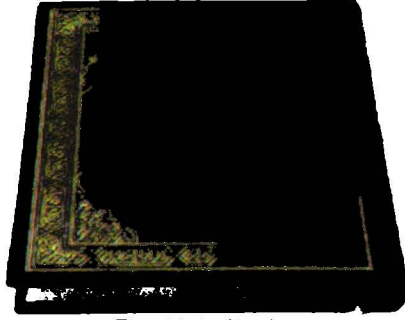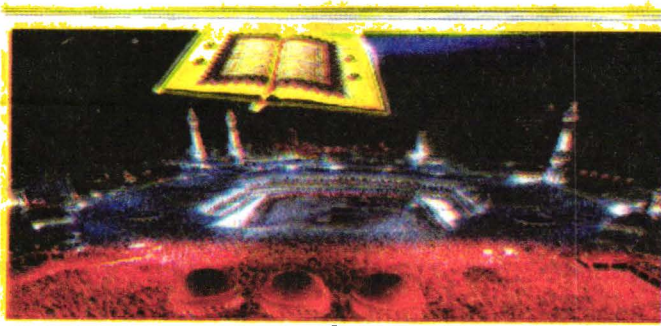
চিত্রঃ ৫৫

"এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা (রহ্মত)" (৪৫ ঃ ২০)

"সুতরাং তারা কুরআন এর পরিবর্তে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (৭৭ ঃ ৫০)

দেখা যাবে, ১৪০০ বৎসর পূর্ব হতে চলে আসা এমন কোন পুস্তক বা গ্রন্থ ধরা পৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার উপর যুগে যুগে মানুষের হাত পড়েনি, ফলে একই গ্রন্থ বিকৃত হয়ে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে লিখিত হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থ 'আল্-কুরআন'। যার ওপর এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের হাতের সামান্য আঁচড় পর্যন্ত পড়তে পারেনি। কারণ এ যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং তিনিই এর হেফাজতকারী! তাই কুরআন এখনও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে।

চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম জার্মানীর 'মিউনিখ ইউনিভার্সিটি' সিদ্ধান্ত নেয় তারা বিশ্বময় গবেষণা চালিয়ে দেখবে পৃথিবীতে কোন ধর্মগ্রন্থটি 'সত্যাবস্থায়' অবিকৃত আছে। এজন্য তারা প্রথমেই হাতে নেয়

পবিত্র 'কুরআন শরীফ'কে। পৃথিবীর যেখানে যেখানে কুরআনের কপি পাওয়া গেল, তা হাতের লেখাই হোক আর প্রিন্টেড কপিই হোক সব জায়গা থেকেই হাজার-হাজার কুরআনের কপি সংগ্রহ করে আনা হলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা শুরু হলো—হাতের লেখা কুরআন, প্রিন্টেড কুরআন সব তন্ন তন্ন করে অক্ষর, আয়াত, দাড়ি, কমাপর্যন্ত পরস্পর মিলিয়ে দেখা হলো। সারা দুনিয়ার পুরাতন, নতুন, হাতেরলেখা, ও প্রিন্টেড কপির একটির মধ্যেও কোথাও চুল পরিমাণ পার্থক্য, সংযোজন-বিয়োজন কোন কিছুরই অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। সকল কপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন বলে প্রমাণিত হলো।

এরপর ঐ কমিটি প্রাচীন সভ্যতার ধারক হিসেবে বাইবেলের পুরাতন সংস্করণের (Old Testament) কপি সংগ্রহ করে তাদের কাজ শুরু করলেন। তাতে তারা দেখতে পেলেন শুধু গ্রীক কপিগুলোতেই ছোটখাট পার্থক্য গণনাতীত, শুধু বিষয়ভিত্তিক পার্থক্যই দুই শতের (২০০) উপরে বিদ্যমান। এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে তারা তাদের কাজকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। যুদ্ধের সময়ই তারা তাদের তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। বাইবেলের পুরাতন সংস্করণ বা তাওরাতের (Old Testament) এই দুর্গতির কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইউরোপিয়ান লেখকের মত হলো "That the Original Manuscript were destroyed with Solman's temple and the Ezra made a fresh set from such copies be found (The story of Bible)" প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে ৫৮৬ খৃঃ পূর্ব অব্দে ব্যবিলনীয় বাদশাহ্ 'বখ্‌তে নাছার' জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে। এতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-র পবিত্র মসজিদ ধ্বংসের সাথে সাথে 'তাওরাত'(Old Testament) ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মূল কপির অবর্তমানে বিভিন্ন স্থান থেকে যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তা দিয়েই নতুন একটি কপি দাঁড় করানো হয়। ফলে মানুষের হাত পড়ে বাইবেলের ওপরে এবং বিভিন্ন সময় মতানৈক্যের অজুহাতে একাধিক কপি একাধিক গ্রুপের মাধ্যমে লিখিত হয়ে বিকৃত হয়ে পড়ে। যার জন্য বিশ্বজুড়ে তাওরাতের এই করুণ অবস্থা।

অনুরূপভাবে 'New Testament' সম্পর্কে তার লেখকও উল্লেখ করেছেন যে এই গ্রন্থটির মূল কপি অন্যান্য দলিলপত্রসহ 'লেলিন গ্রাড' মিউজিয়ামে রাখা আছে। একে 'ছায়ানাইট' লিপি বলা হয়। এটি লেখা হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে। ফলে এই ৪০০ বৎসরের ভিতর মানুষের মুখে মুখে

বিকৃত হতে হতে তার মৌলিকত্বই হারিয়ে ফেলে। যার ফলে 'বাইবেলের' নতুন সংস্করণও তার আসল রূপে পৃথিবীতে বর্তমান নেই।

আবার রোমান ঐতিহাসিক–'প্লিনীর' মতে জেরোস্তারের ওপর নাজিলকৃত কিতাব 'জিন্দাবেস্তা' মোট বার হাজার গরুর চামড়ার ওপর সোনালী কালিতে লিপিবদ্ধ করে পারসিয়ানদের তদানীন্তন রাজধানী 'পার্সেপলিসের' বিখ্যাত লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছিল। গ্রীক সম্রাট 'আলেকজান্ডার' যখন উক্ত রাজধানী দখল করে পুড়িয়ে দেয় তখন ঐ কিতাবখানাও পুড়ে যায়। ফলে আসল 'জিন্দাবেস্তা' দুনিয়ার মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

একইভাবে বলা যায়–হিন্দুদের পবিত্রগ্রন্থ বেদ-বৈদিক যুগের অনেক পরে মহাভারতীয় যুগে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়) 'বৈদব্যাস মুনী' কর্তৃক সংকলিত হয়। ইতিহাসবিদদের মতে বেদ হযরত ঈসা (আঃ)-র জন্মের প্রায় ৭/৮ শত বৎসর পূর্বের রচনা।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটকের' তৃতীয় পিটকখানা বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বৎসর পর মহামতি 'অশোকের' নেতৃত্বে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উল্লেখিত বিভিন্ন ধর্মের মূলগ্রন্থগুলো বিভিন্ন কারণে মানুষের হাতে যুগে যুগে সংযোজন ও বিয়োজন হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু পবিত্র কুরআন-ই বর্তমানে একমাত্র গ্রন্থ। যা মানুষের হাতে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজনের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে অবস্থান করছে। তাই সমগ্র পৃথিবীজুড়ে সব কুরআনের কপি একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে। এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের একমাত্র দাবীদার 'আল্-কুরআন'।

এছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যে যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সকল ভাষাসমূহ এখন পৃথিবীতে মৃত ভাষায় শামীল হয়েছে। ঐ ভাষাগুলোতে এখন আর মানুষ কথা বলে না। অথচ পৃথিবীর একটা বিরাট ভৌগোলিক এলাকার মাতৃভাষা হচ্ছে কুরআনের ভাষা–আরবী ভাষা। লক্ষ-লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে।

উপরের আলোচনাটি বিশ্বব্যাপী মহান 'আল্লাহ্‌র' সেই অমোঘবাণীকেই কেবল স্মরণ করিয়ে দেয় "নিশ্চয় এ কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই-এর হেফাযত করব" (১৫ ঃ ৯)। এবার আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'কুরআনের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ' এবং 'বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কার' পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক পর্যালোচনায় প্রবেশ করবো।

সৃষ্টি তত্ত্বঃ (Big-Bang)

আল্-কুরআনঃ

"তারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা নিজেরাই কি নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?"। (৫২ ঃ ৩৫)

"অথবা তারাই কি এই গগণমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?"। (৫২ ঃ ৩৬)

"তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন?"। (২৯ ঃ ১৯)

"বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কেমন করে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান"। (২৯ ঃ ২০)

"তোমার প্রতিপালক মহাশক্তিবান ও মহাক্ষমতাশালী"। (১১ ঃ ৬৬)

"তিনিই আকাশমন্ডল ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) ছয়টি সময়কালে সৃষ্টি করেছেন"। (৫৭ ঃ ৪)

"তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়"। (৬ ঃ ৭৩)

"এগুলিই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য"। (৩১ ঃ ৩০)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটা এক মহা সাফল্য"। (১০ ঃ ৬৪)

"তারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী"। (২২ ঃ ৭৪)

ওপরে বর্ণিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতগুলো গভীর উপলব্ধি সহকারে এক নজর দেখলে মনে হবে যেন–উক্ত আয়াতগুলো এখনি বুঝি অবতীর্ণ হল। আসলে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন মানুষ বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান রাখতনা, সেই অন্ধকার, অনুন্নত, জ্ঞানের

আলোহীন পরিবেশেই আরব মরুতে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় বাণীবাহকের কাছে এই পবিত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যেহেতু তাঁর পরিকল্পনায় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনিই এর পরিচালনাসহ যাবতীয় কাজ অদৃশ্যজগত থেকে নীরবে সম্পাদন করে চলেছেন, তাই তিনি ভালো করেই জানেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মহাবিশ্বসহ সকল কিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো হাজারো প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজতে থাকবে। আবার সৃষ্টিকর্তার গোলামী সম্পর্কেও কিছুসংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও তাঁর (সৃষ্টিকর্তার) উপস্থিতি প্রমাণ করতে চাইবে। এই অবস্থায় স্রষ্টার উপস্থিতি এবং তাঁর কাজের সরাসরি লক্ষণসমূহ যদি মানুষের জ্ঞানের সীমায় না পৌঁছে, তাহলে তারা বিভ্রান্ত হওয়ারই সুযোগ পাবে বেশি। আল্লাহ্‌পাক মানবমন্ডলীকে এই ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে নিজকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্নভাবে প্রশ্নের আকারে সৃষ্টি সম্পর্কীয় কথা বলার পর মূল মহাবিশ্বের সৃষ্টির তথ্য উপস্থাপন করলেন খুবই নিখুঁত, সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তিপূর্ণভাবে। ঘোষণা করলেন – দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত আকাশজগত এবং পৃথিবীসহ সকল কিছুই (মহাবিশ্ব) তিনি তাঁর অসীম অকল্পনীয় মহাজ্ঞান ও প্রচন্ডশক্তি বলে ছয়টি (৬) সময়কালে (Period) সৃষ্টি করেছেন, যদিও মানুষ তাঁর প্রভাব এবং মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চায় না। আর এত বড় বিরাট-বিশাল কাজটি করতে তাঁকে শুধু এতটুকুনই করতে হয়েছে যে, ইচ্ছা পোষণ করে বলতে হয়েছে 'হও'। সাথে সাথেই সব তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি হয়ে সু-সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বললেন – 'যদি বিশ্বাস করতে না চাও, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে মহাশূন্যে-মহাকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাও, সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ তোমরা লাভ করতে পারবে যা আমি চিহ্ন স্বরূপ তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছি।' কী আশ্চর্য যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার কথামতো বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বের মানুষ 'পশ্চাদপট বিকীরণ' (Back ground radiation) ২.৭৩ কেলভীন (যা সৃষ্টিলগ্নে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা) প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রমাণ করলো এই মহাবিশ্ব আজ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) -র মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে। 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বিষয়ে আজ প্রায় সকল বিজ্ঞানী এই 'Big Bang' থিউরী মেনে নিয়ে মাথা নুইয়ে দিয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌পাক

বললেন যে, মহাবিশ্বের এই সৃষ্টি সম্পর্কীয় কাজটি ছয়টি সময়কালে (ছিত্তাতি আইয়াম) বা ছয়টি ধাপে সম্পন্ন করেছেন। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে একটি সময়কালেই তা সম্পন্ন করতে পারতেন, যেহেতু তিনি স্রষ্টা হিসেবে তাঁর সকল কাজেই একটা নিয়ম-শৃংখলা এবং পদ্ধতি মেনে চলেন বিধায় এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির ব্যাপারেও ছয়টি সময়কাল পরিকল্পনায় এনে তারপর পদ্ধতিগতভাবেই সু-সম্পন্ন করেছেন। বিজ্ঞানীগণ যুগ যুগ ধরে এই 'Big Bang' কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে আবারো আশ্চর্য করার মত কেবল ছয়টি সময়কালই (Period) চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানের সকল বক্তব্য আজ এই ছয়টি সময়কালকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে 'ইয়াওম' শব্দের ব্যবহার এক অতি সূক্ষ্ম ও কৈশিক সময়মান হতে মধ্যম সময় কিংবা অতি বৃহৎ সময় ইত্যাদি সকল দৈর্ঘ্যের কাল পর্যায়কে প্রকাশ করতে দেখা যায়। ৫৫ ঃ ২৯ ও ১০ ঃ ৯২ আয়াত দু'টি যেখানে একটি সূক্ষ্ম সময়ের ধারণা দেয়, সেখানে ২২ ঃ ৪৭ ও ৩২ঃ ৫ আয়াত দু'টি হাজার বছর ও ৭০ঃ ৪ আয়াতটি 'ইয়াওম' শব্দে ৫০ হাজার বছরের তথ্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ, 'ইয়াওম' শব্দটি কুরআনের পরিভাষায় নির্দিষ্ট ও স্থির কোন অর্থ প্রকাশ করে না। অতি অল্পক্ষণ হতে শুরু করে অতিশয় প্রশস্ত যে কোন সময়কাল এই পরিধির আওতাভুক্ত। তাই 'ছিত্তাতি আইয়াম' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র 'ছয়দিন' করলে ভুল হবে, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও গ্রহণীয়তা পাবে না, কুরআনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতো নয়ই। পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে যথাযথ অবস্থায় নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রহের দিনের হিসাব আসতে পারে না, আবার সকল গ্রহেরই দিনের হিসাবের তারতম্য কল্পনাতীত। কারো দিন আমাদের কয়েক দিন আবার কারো কারো আমাদের কয়েক দিন থেকে কয়েক শত দিনে একদিন হয়, তাই 'ইয়াওম' অর্থ দিন না হয়ে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট আয়াতে 'সময়কাল' হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

যখন পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সম্বলিত পবিত্র বাণীগুলো পৃথিবীতে অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন মানুষের সমাজে কত অদ্ভুদ ও বিচিত্র কল্প-কাহিনী এই 'সৃষ্টিতত্ত্ব' কে নিয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরছিলো। এ কাহিনীগুলোতে না ছিল সত্যতা আর না ছিল বাস্তবতা।

প্রাচীন যুগের ব্যাবিলনবাসীদের কাছে ছিল সকল দেবতাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'বেলমারদুক' আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। দেবতাদের মাঝে একটানা

যুদ্ধ বিগ্রহ ,লেগে থাকার কারণে একবার 'তিয়ামত' নামক দেবতা 'বেলমারদুক দেবতার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে এক পর্যায়ে 'তিয়ামত' যুদ্ধে পরাজিত হলে 'বেলমারদুক' তাকে কেটে দুই টুকরা করে এক অংশে আকাশ এবং অপর অংশে পৃথিবী সৃষ্টি করে।

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'তিত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' অনুযায়ী প্রজাপ্রতি ব্রহ্মা আদিম জলে ডুব দিয়ে মাটি তুলে আনলেন, পরে সেই মাটি তিনি ছড়িয়ে দিলেন জলের উপর ভাসমান পদ্মপাতায়। আর তা থেকেই পৃথিবী বেরিয়ে এলো।

প্রাচীন মিশরীয়দের মতে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে আদিসমুদ্র 'নূ' (NU) হতে।

পলিনেশিয় পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী 'ঈশ্বর ট্যাংগোরা' বড়শি দিয়ে পৃথিবীকে মাছ যেভাবে তোলে, তেমনিভাবে সমুদ্র থেকে টেনে তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর বড়শির সুতা ছিঁড়ে যায়। এতে ইতোমধ্যে যে অংশটুকু ভাসতে পেরেছিল সেইটুকু পানির উপরে থাকলো স্থলভাগ হয়ে, বাদ বাকী অংশটি সমুদ্রের জলের নিচে পড়ে থাকলো।

চীনাদের মতে 'ইন' এবং 'ইয়ান' অর্থাৎ, স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ এই দু'টো মূলনীতি হয়ে পরবর্তীতে তাদের পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার ফলে স্বর্গ, নরক, মর্ত্য ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।

জাপানীদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র 'কোজিকী'-র মতে কোন এক দেবতা ও 'ইজান্যামী' নামে এক দেবী এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। দেবতার ডান চক্ষু হতে সূর্য, বাম চক্ষু হতে চন্দ্র ও নাসিকা হতে অসংখ্য তারকার জন্ম হয়।

হিব্রু কাহিনী অনুযায়ী আদি 'টেহোম' ঈশ্বরের আদেশে দুই ভাগ হয়ে একভাগ উপরে উঠে যায় এবং স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করে। অন্যভাগ নিচে পৃথিবীকে ধারণ করে। উপরের ভাগকে বলা হয় ঊর্ধ্বজল এবং নিচের ভাগকে বলা হয় নিম্নজল। স্রষ্টার স্বর্গীয় আসন এই ঊর্ধ্বজলে পাতা ছিল। এই জলের নিম্নে অবস্থান করতো নক্ষত্রখচিত আকাশ।

হিব্রুদের এই ধারণা পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের ধর্মপুস্তকেও একই ধারায় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, যা অন্যান্য পুস্তকে বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া আরো শত শত বর্ণনা যা বিজ্ঞান সম্মত নয়, অথচ মানবসমাজে মুখরোচক গল্প হয়ে এখনও আলোচিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানঃ

এবার আমরা বর্তমান সাফল্যমন্ডিত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কীয়' তথ্যের পর্যালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবো, যা পরবর্তীতে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে খুলে দিতে সহায়ক হবে এবং 'সত্য'কে আমাদের নাগালের মধ্যে পাওয়া সহজ হবে।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমান সৃষ্টিতত্ত্ব বিশারদগণ (Cosmologists) কর্তৃক তৈরী বিস্তারিত চিত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে পিছনের দিকে সৃষ্টির সেই শুরুর মুহূর্তে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই চিত্রগুলো 'Standard model of Big Bang' নামে পরিচিত। তাদের সেই তত্ত্ব অনুযায়ী এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (যা অনুমান সাধ্যও নয়) প্রচন্ড ক্ষমতার অজ্ঞাত কোন উৎস হতে আশ্চর্য্য রকম এক সূক্ষ্ম সময়কালে বর্ণনাতীত ব্যাপক-বিশাল শক্তির ঘনায়ন ঘটে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের হিসাব মতে 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটির' অর্থাৎ, আদিমহাবিশ্বের শুরুতে ব্যাস ছিল $১০^{-৩৩}$ সেঃমিঃ। এক লিখে তার পিঠে ৩৩টি শূণ্য বসিয়ে যে বিরাট সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তা দিয়ে ১সেঃমিঃ দৈর্ঘ্যকে ভাগ করলে কল্পনাতীত যে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে তার সমান। অর্থাৎ, একটি পরমাণুর এক হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগ মাত্র। এই মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুরু হতে সময় লেগেছিল $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১ সেকেন্ডের ১০ কোটি কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ভাগের ১ভাগ কাল। আর ঐ সময় ঘনায়নের কারণে অকল্পনীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল $১০^{৩২}$ K (কেলভিন) বা ১০,০০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ডিগ্রি কেলভিন।

ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন এমনি একটি বিন্দুতে ($১০^{-৩৩}$সেঃমি) প্রচন্ড ($১০^{৩২}$k) তাপমাত্রায় এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে ($১০^{-৪৩}$সেঃ) অনুমানের অসাধ্য অকল্পনীয় শক্তির ঘনায়নে হঠাৎ করে 'Big Bang' নামে পরিচিত মহাবিস্ফোরণটি সংঘটিত হয়। আর বিষ্ফোরণের সাথে সাথেই আশ্চ্যর্য রকম গতিতে (Astonishing rate)-এ মহা সম্প্রসারণ শুরু হয়ে যায়।
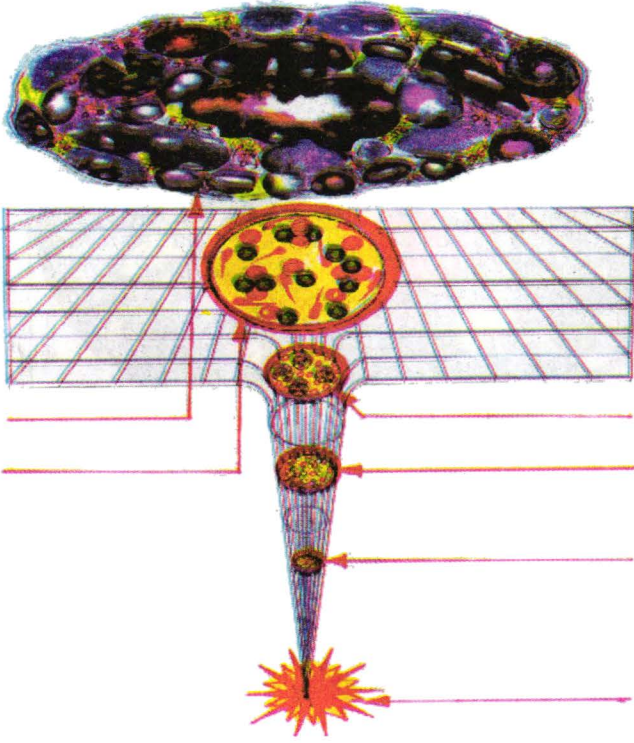
চিত্রঃ ৫৬
'Big-Bang' নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয়ে মোট ৬টি পর্যায়কালে (ইয়াওম) তা সম্পন্ন হয়, যা মহাজ্ঞানী স্রষ্টার বিস্ময়কর কীর্তিই বটে।

ফলে প্রচন্ড শক্তি ঘনায়িত সেই মহা সূক্ষ্মবিন্দুটি ($১০^{-৩৩}$সেঃমিঃ) বাতাসে ফুলতে থাকা বেলুনের ন্যায় ক্রমাগত শুধু বর্ধিত হয়ে মহাবিশ্বের রূপ নিয়ে এখনও মহাসম্প্রসারণের নেশায় ছুটে চলেছে অজানা কোন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, সেই সৃষ্টির ক্ষণ মুহূর্ত হতে। বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির ক্ষণমুহূর্তটির নাম দিয়েছেন Plank Time বা Time Zero. যে আদি সূক্ষ্ম বিন্দু হতে মহাবিশ্বের জন্ম শুরু হয়েছিল তার নাম দিয়েছেন 'Primordial fire ball' । উক্ত সময়ে চারটি মৌলিক শক্তি (Basic four forces) একত্রিত শক্তি হিসেবে (Unified force) বিরাজমান ছিল।
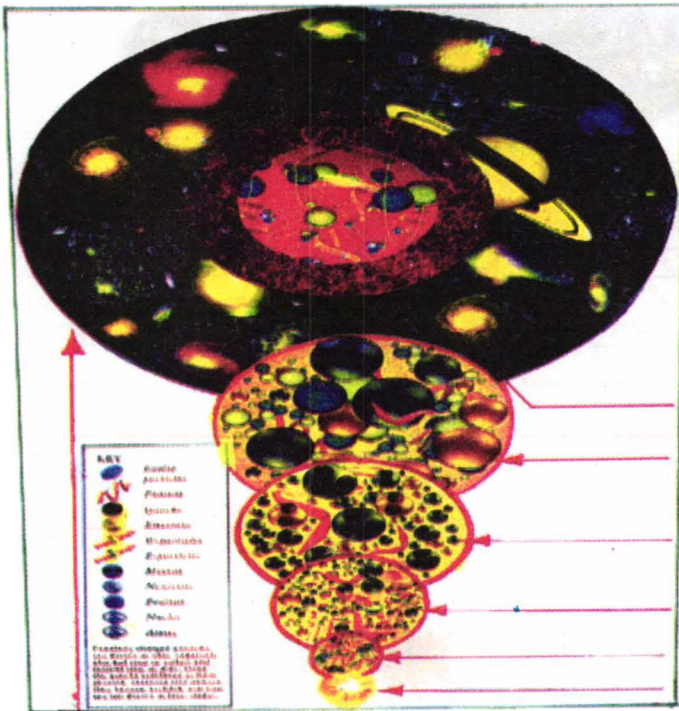
চিত্রঃ ৫৭

"ওহে মানুষ ! তোমরা তো ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে ,তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না"?(৫৬ ঃ ৬২)

এরপর সময় গড়িয়ে যখন ১০$^{-৩৫}$ সেকেন্ড হতে ১০$^{-৩২}$ সেকেন্ড তখন প্রথমদিকে তাপীয় অবস্থা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০^{২৮}k এবং মহাবিশ্বের ব্যাস দাঁড়ায় ১০$^{-২৮}$ সেঃ মিটার। এই সময়ে Gravitation (মহাকর্ষবল) অন্যান্য শক্তির বন্ধনমুক্ত হয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। উক্ত সময় কালের (Period) শেষদিকে তাপমাত্রা আরো কমে গিয়ে নেমে আসে ১০^{১৭}k-এ এবং মহাবিশ্বের ব্যাস বেড়ে গিয়ে ১০$^{-২৪}$ সেঃমিঃ-এ উপনীত হয়। এই অবস্থায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ কোয়ার্কের (Quark) আবির্ভাব হয় এবং বিকীরণ শক্তির (Radiant energy) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে। উক্ত সময়কালের (Period) নাম দেয়া হয় 'Inflation Period'.

তারপর সময় যখন আরো বাড়তে থাকে এবং বাড়তে-বাড়তে ১০^{৬} সেকেন্ড, তখন তাপমাত্রা নিচে নেমে ১০^{১৩}k এবং মহাবিশ্বটি বিন্দুর অবস্থা থেকে সৌরজগতের আকৃতির সমান বর্ধিত হয়ে পড়ে। এ সময় কোয়ার্ক

এবং এন্টিকোয়ার্কের মাঝে সংঘর্ষ (Annihilation) শুরু হয়ে যায়। Strong nuclear force তার সাথে বন্ধনযুক্ত Electro weak force থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই Period -র নাম দেয়া হয় 'Annihilation Period'

সময় যখন পূর্ণ এক সেকেন্ড তখন তাপমাত্রা আরো কমে গিয়ে $১০^{১০}$k -এ নেমে আসে। মহাবিশ্বের ব্যাস কয়েকটি সৌরজগতের রূপ নেয়। মেটার এবং এন্টিমেটার সংঘর্ষে বেঁচে থাকা উদ্বৃত্ত কোয়ার্ক সৃষ্টি করতে থাকে ইলেকট্রন, নিউট্রন এবং Hadrons (Protons and Neutrons)। এই অবস্থায় Electro magnetic force তার বন্ধন যুক্ত Weak force থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই সময়কালের নাম 'Protons and Neutrons period'.

পরবর্তীতে সময় গড়িয়ে যখন তিন (৩) মিনিট, তখন মহাবিশ্বটি কয়েক আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা কমে $১০^{৯}$k চলে আসে। এই সময় প্রোটন এবং নিউট্রন মিলিত হয়ে 'Atomic nuclei' গঠন করতে থাকে, যেমন Deuterium এবং Helium, এই সময়কালকে বলা হয় 'Atomic nuclei period'.

এরপর সময় যখন গড়িয়ে প্রায় ১০,০০০ বৎসর তখন 'Atomic nuclei' ইলেকট্রন ধারণ করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়, সময় যখন প্রায় ৩০০,০০০ বৎসর তখনই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নিউক্লি (Hydrogen and helium nuclei) পূর্নরূপে ইলেকট্রন ধারণ করে 'Stable atoms' সৃষ্টি করে এবং Radiation (বিকীরণ) পদার্থ থেকে পৃথক হয়ে পড়ায় 'ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা' (Dense fog) যা Radiation এবং পদার্থের মিশ্রনে সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়। পরক্ষণেই গোটা মহাবিশ্ব সৃষ্ট 'Stable atoms'-এর আবর্তিত Gas cloud দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় 'সময়' এবং 'মহাবিশ্বের আয়তন' ব্যাপকভাবে বাড়ার কারণে তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০k-এ নেমে আসে। সময় যখন বেড়ে দুই বিলিয়ন বৎসর তখন মহাবিশ্বে আবর্তিত Gas cloud -এর ভিতর পাতলা সূতার মত লম্বা 'Strand' আবির্ভূত হয়ে 'Gas cloud' কে গুচ্ছ-গুচ্ছ ভাবে ঘনিভূত করতে থাকে ব্যাপক-বিশাল মহাশূন্যে। তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে আরো কমতে থাকে। এই অবস্থায় গুচ্ছ-গুচ্ছভাবে বিভক্ত gas cloud পূর্বের তুলনায় আরো দ্রুত আবর্তিত হতে থাকলে ক্রমান্বয়ে আরো

বেশি ঘনীভূত হয়ে 'প্রোটো-গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসার' জন্ম দেয়। সময় এভাবে আরো বেড়ে যখন প্রায় চার বিলিয়ন বৎসর তখন পূর্ণ গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহসমূহ প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মহাবিশ্ব আরো বর্ধিত হয়ে আজ প্রায় ১৫,০০০ বিলিয়ন থেকে ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত ব্যাপক-বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

উপরে বর্ণিত পর্যায়গুলো বর্তমান বিজ্ঞানজগতে 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' আবিষ্কার হিসাবেই সর্বত্র স্বীকৃত। এখন আমরা এই পর্যায়গুলোকে কুরআনে বর্ণিত ৬টি সময়কালের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করব। আপনি দেখতে পাবেন কুরআন এবং বিজ্ঞান একই সূতায় গাঁথা মালার মত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই, নেই কোন ভিন্নতা, মনে হবে কুরআন এবং বিজ্ঞান একই উৎস থেকে যেন উৎসারিত। আসলেও বিষয়টি তাই।

(ক) প্রথম 'ইয়াওম'ঃ 'প্লাঙ্ক টাইম' বা 'টাইম জিরো'। মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে এক্ষণটি ছিল ১ সেকেন্ডকে ১ মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে তাকে আবার বিলিয়ন দিয়ে পরে ট্রিলিয়ন দিয়ে এবং সর্বশেষে জিলিয়ন দিয়ে ভাগ করলে যে অতিক্ষুদ্র কল্পনাহীন সময়মান পাওয়া যাবে, মাত্র তার সমান। এই ক্ষুদ্র সময়ের অস্তিত্ব বাস্তবে আমাদের বোধগম্য নয়। এটা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই প্রকাশ করা যেতে পারে। 'পদার্থ বিদ্যা' এই সময় যাত্রা শুরু করে। মহাবিশ্বের আকার তখন $১০^{-২৮}$ সেঃমিঃ। অকল্পনীয় প্রচন্ড শক্তির ঘনায়ন ঘটে ঐ সময়ে এই মহাসূক্ষ্ম বিন্দুবত অবস্থানে। ফলে তাপমাত্রা আশ্চর্যজনকভাবে (Incredibly) $১০^{৩২}$k এ উঠে যায়। সংগে সংগেই ঘটে যায় মহাবিস্ফোরণ। ফলে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুবত মহাবিশ্বটি বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের মত চতুর্দিকে বর্ণনাতীত গতিতে ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং এখনও সেই সম্প্রসারণ অব্যাহত আছে। এই সময় মৌলিক চারটি শক্তি (Basic four forces) একত্রিত অবস্থায় (Unified force) বর্তমান ছিল। এই 'পর্যায়' বা Period টি প্রথম 'ইয়াওম'।

চিত্রঃ ৫৮
প্রথম ইয়াওম ('প্লাঙ্ক টাইম' বা 'টাইম জিরো')

(খ) দ্বিতীয় 'ইয়াওম'ঃ `Inflation` (স্ফীতকরণ) সময়কাল। সময় যখন বেড়ে গিয়ে ১০$^{-৩৫}$সেকেন্ড হতে ১০$^{--৩২}$ সেকেন্ড, তখন মহাবিশ্বের ব্যাস বেড়ে গিয়ে ১০^{২৮} সেঃমিঃ -এ দাঁড়ায় যা উত্তপ্ত নরম অগ্নিগোলকের রূপ নিয়ে বাড়তে থাকে। এই সময় মহাকর্ষবল (Gravitation) পৃথক হয়ে যায়। বস্তুর ক্ষুদ্রমত অংশ হিসাবে কোয়ার্কের আবির্ভাব হয়। বস্তু এবং রেডিয়েশান মিশ্রিত অবস্থায় টগবগ করতে থাকে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১০^{২৮}k থেকে সর্বনিম্ন ১০^{১৭}k পর্যন্ত বিরাজ করে এবং মহাবিশ্বের ব্যাস বেড়ে ১০-^{২৪} সেঃমি-এ উপনীত হয়।
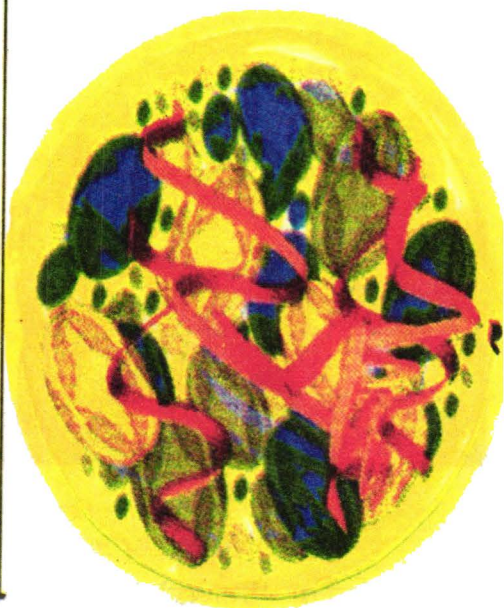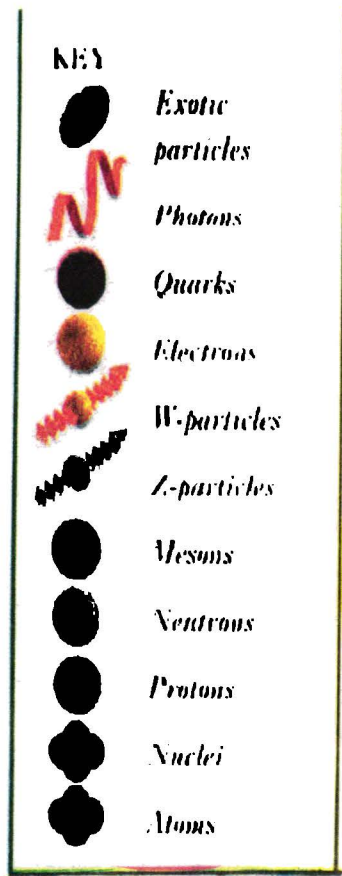
চিত্রঃ ৫৯

দ্বিতীয় ইয়াওম বা 'ইনফ্রেশান পিরিয়ড'।

(গ) তৃতীয় 'ইয়াওম' ঃ এই সময়কালের নাম 'Annihilation Period', বস্তু এবং প্রতিবস্তুর সংঘর্ষে ধ্বংসসাধনকাল। মহাবিশ্বটি এই সময়কালে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় আমাদের সৌরজগতের আকার ধারণ করে। ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে $১০^{১৩}$k -এ নেমে পড়ে। Strong nuclear force

এই সময় পৃথক হয়ে যায়। সংঘর্ষে উদ্বৃত্ত বস্তু ও রেডিয়েশানের (Radiation) মিশ্রন ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশায় রূপ নিতে থাকে।
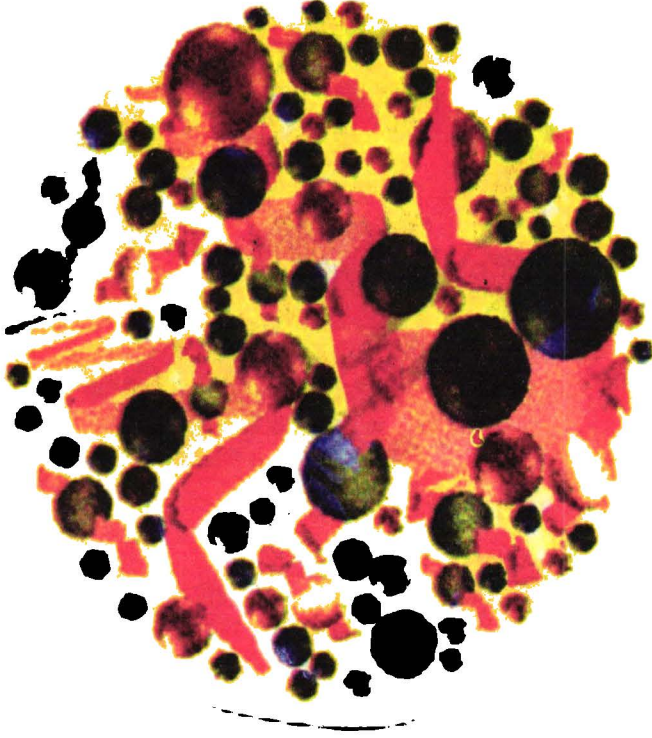
চিত্রঃ ৬০
তৃতীয় ইয়াওম বা 'এ্যানিহিলেশান পিরিয়ড'।
(বস্তু এবং প্রতিবস্তুর মধ্যে সংঘর্ষকাল)

(ঘ) চতুর্থ 'ইয়াওম': এই সময় মহাবিশ্বটি বর্ধিত হয়ে কয়েকটি সৌরজগতের রূপ ধারণ করে। ফলে তাপমাত্রা কমে ১০^{৯}k চলে আসে। Weak nuclear force এবং Electro magnetic force পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। সংঘর্ষে উদ্বৃত্ত কোয়ার্ক-ইলেকট্রন, নিউট্রিনো ও হেড্রনস্ (প্রোটন এবং নিউট্রন) সৃষ্টি করতে থাকে। বস্তু এবং রেডিয়েশান এর মিশ্রণ

ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা (Fog) রূপে বিরাজমান। এই পর্যায়টি 'Protons and Neutrons period' নামে পরিচিত।
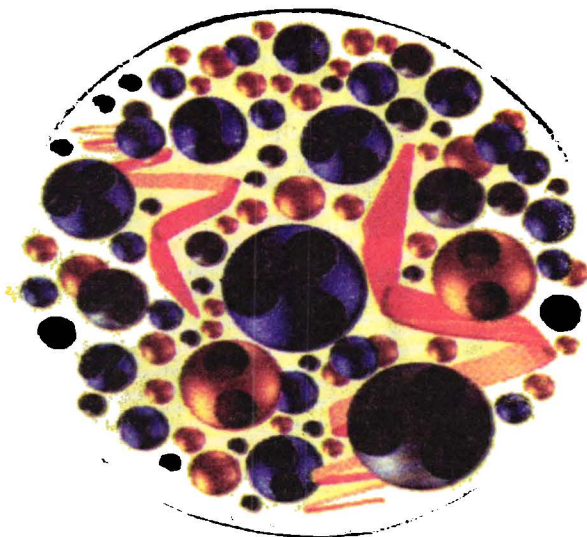
চিত্রঃ ৬১
চতুর্থ ইয়াওম বা 'প্রোটন্‌স ও নিউট্রন্‌স পিরিয়ড'।
(প্রোটন্‌স ও নিউট্রন্‌স সৃষ্টিকাল)
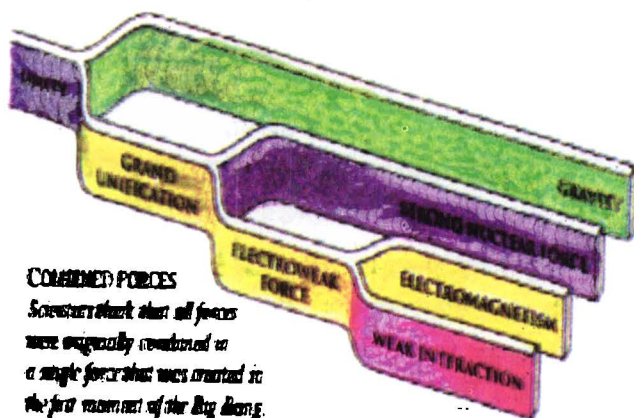
মহাবিশ্বে কার্যরত মূল চারটি শক্তি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান।

(ঙ) পঞ্চম 'ইয়াওম'ঃ এই পর্যায়কে 'Atomic nuclei period' বলা হয়। এই সময় প্রোটন এবং নিউট্রন মিলিত হয়ে 'Atomic nuclei' গঠন করতে থাকে। বিস্ফোরণের ৩ মিনিট পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই অবস্থায় মহাবিশ্বটি কয়েক আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ফলে তাপমাত্রা $১০^{৬}$k -এ নেমে আসে। মেটার (Matter) এবং রেডিয়েশানের (Radiation) মিশ্রণজনিত ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা তখনও বিরাজ করছে।
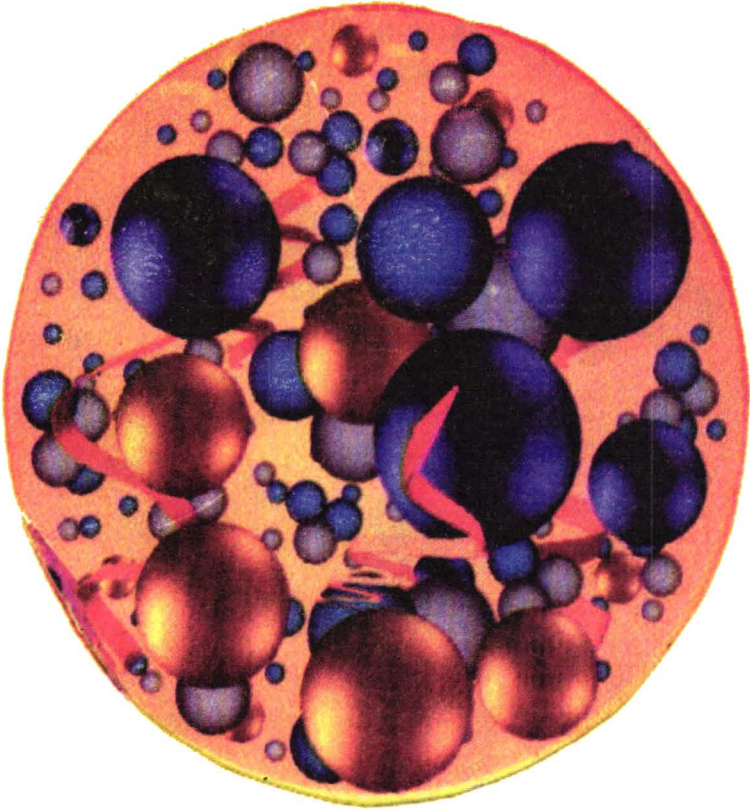
চিত্রঃ ৬২
পঞ্চম ইয়াওম বা 'এ্যাটমিক্ নিউক্লি পিরিয়ড'।
(নিউক্লিয়াস গঠনকাল)

(চ) ষষ্ঠ 'ইয়াওম' ঃ সময় গড়িয়ে যখন ১০,০০০ বৎসর অতিক্রম করে, তখন 'Atomic nuclei' ক্রমান্বয়ে 'Stable atom' সৃষ্টির দিকে এগুতে থাকে। সময় যখন প্রায় ৩০০,০০০ বৎসর তখন 'Hydrogen' এবং 'Helium nuclei' (Atomic nuclei) 'electron' কে ধারণ করে Stable atoms সৃষ্টি করে, এবং পদার্থ (বস্তু) থেকে রেডিয়েশান (Radiation) পৃথক হয়ে পড়ায় ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা (Rog) দূরীভূত হয়।
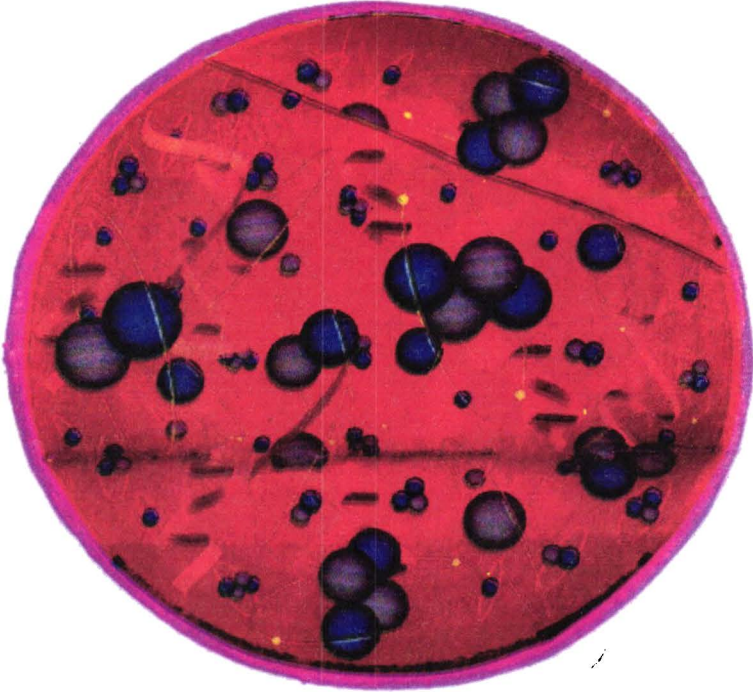
চিত্রঃ ৬৩
ষষ্ঠ ইয়াওম বা 'এ্যাস্‌টেবল এ্যাটম্‌স পিরিয়ড'

সাথে সাথেই Stable atoms -র আবর্তিত Gas cloud দিয়ে মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই সময় মহাবিশ্ব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর বিশাল রূপ নিয়ে মহাশূণ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তাপমাত্রা কমতে কমতে ৩০০০k এ নেমে যায়। পরবর্তীতে যখন সময় চার বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায় তখন তাপমাত্রা কমে ২.৭৩ k- এ উপনীত হয় এবং গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ

ইত্যাদি জন্ম নিতে থাকে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সময় যেতে যেতে বর্তমানে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানে মহাবিশ্বটি বর্ধিত হতে হতে প্রায় ১৫,০০০ বিলিয়ন থেকে ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (Light year) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। উক্ত পর্যায় কালকে বলা হয় 'Stable atoms period'. (অটল পরমাণু গঠনকাল)।

এখন সৃষ্টিতত্ত্বের উক্ত ৬টি সময়কালকে ছকে ধারণ করলে দাঁড়ায়ঃ

Epoch	Corresponding time	Details
1. Plank Time	10^{-43} Second	Temp. 10^{32}k. Physics Starts, Basic four forces are unified. Size of universe 10^{-28} cm. diameter across, incredibly hot energy.
2. Inflation Period	10^{-35} Second to 10^{-32} Second	Temp. 10^{17}k. Gravity broken free, size of Universe 10^{-24}cm. diameter across to a soft fire ball, Quarks appear, matter, antimatter, radiation are a bubbling opaque stew.
3. Annihilation Period.	10^{-6}Second	Temp. 10^{13}k. Universe size like our solar system, strong nuclear force separated out leaving the Electro weak force, existence of matter over antimatter after annihilation, matter and radiation were thoroughly mixed up in a dense fog.
4. Protons and Neutrons Period	1 Second	Temp. 10^{10}k. Quarks had formed electrons, neutrinos and grouped together in triplets to make hadrons (protons and neutrons), Universe size many solar system. Weak nuclear force and electromagnetic force

		split, high energy dense fog continue.
5. Atomic Nuclei Period	3 Minutes	Temp. 10^9k. Protons and neutrons began to stick together to from atomic nuclei, size of Universe many light year diameter across, high energy dense fog continue.
6. Stable atoms Period	From 300,000 years to up to now.	Temp. 3000k. to 2.73k, nuclei captured electrons and form stable atoms, radiation separated from matters, fog cleared, primordial gas cloud soon filled the Universe, gradually appears Quasars, Galaxies, Nebulae, Stars, Planets, Satellites etc. Size of Universe 15,000 to 20,000 billion light years diameter across.

পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয় সম্পর্কে যে ৬টি সময়কাল বলে দেয়া হয়েছিল, বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেই কেবল মহাবিশ্বের সৃষ্টি সহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মানুষ তার নিজের ব্যাখ্যায় সেই ৬টি সময়কালকে (Period) চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর এই আশ্চর্য আবিষ্কার বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে একমাত্র কুরআন-ই যে সত্য ধর্ম গ্রন্থ এবং তা যে সকল কিছুর স্রষ্টা ও সকল কাল দ্রষ্টা এক ও একক প্রভু "আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের" নিকট থেকে অবতীর্ণ, সে কথা না বললেও নিজ থেকেই তা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। অথচ বিজ্ঞান জগতও হাবুডুবু খেয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই 'সৃষ্টি তত্ত্ব' নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে চলতে থাকে তর্ক বিতর্ক, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি ইত্যাদি দিয়ে, কিন্তু কুল-কিনারা করতে পারেনি ১৯৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত।

প্রথম দিকে 'স্যার জেমস্ এইচ জেইন' মত ব্যক্ত করেন যে, দৈবক্রমে বিশৃংখলার ভিতর দিয়েই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এর জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন

হয়নি। এই থিউরি প্রথম দিকে গোটা বিশ্বকে দখলে রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে বেলজিয়ামের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ 'জর্জ ল্যমেইটর'

চিত্রঃ ৬৪
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'Big-Bang' প্রস্তাব ১৯৩৩ সালে সর্বপ্রথম পেশ করেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী 'জর্জ ল'মেইটর'। ১৯৬৪ সালে back ground radiation 2.73k আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে Big-Bang বর্তমান বিশ্বে সত্য ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(Jorge Lemaitre) উল্লেখিত থিউরিকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন প্রস্তাব 'Big Bang'-কে প্রকাশ করেন। এভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের টানাপোড়নে চলতে থাকা অবস্থায় ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী থমাস গোল্ড, হারম্যান বন্ডি, ফ্রেড হোয়েল, সহ অনেকেই 'Steady state' মতবাদ প্রস্তাব করেন, যার-মুলবক্তব্য হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিও নেই এবং ধ্বংসও নেই, অনাদিকাল থেকে মহাবিশ্ব বিরাজমান আছে এবং অনন্তকাল অবদি তা থেকেও যাবে। এই থিউরি 'Big Bang' র স্থান দখল করে নেয়। Big-Bang-র হিসাবে সামান্য ভুল থাকায় এই সময় তা বানচাল হয়ে পড়ে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ১৯৫০ সালে রেডিও এ্যস্ট্রোনমি (Radio

Astronomy) এসে Steady State প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। পরে ১৯৬০ সালে 'দুর্বল বেতার ধ্বনি' (Feeble Radio Hiss) Big Bang থিউরিকে আবারো জোরালো করে তুলে ধরে এবং ১৯৬৪ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী 'Arno Penzias' এবং 'Robert Wilson' পশ্চাদপট বিকীরণ (Back ground radiation) ২.৭৩k. (কেলভিন)

চিত্রঃ ৬৫

বিজ্ঞানী 'জর্জ ল'মেইটর' কর্তৃক প্রস্তাবিত সৃষ্টিতত্ত্ব 'বিগ-ব্যাংগ' ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো' সমর্থন করেন এবং ম্যাথমেটিক্যালী প্রমাণ করে দেখান যে, 'বিগ-ব্যাংগ' সত্য ঘটনা এবং তার অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা প্রায় তিন (৩) কেলভিন এখনও মহাবিশ্বে বিরাজ করছে, যা ১৯৬৪ সালে মার্কিন দু'জন বিজ্ঞানী উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন।

আবিষ্কার করে বিজ্ঞান বিশ্বে Big Bang প্রস্তাবকে দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই অবস্থায় অন্যান্য প্রস্তাবগুলো কোন ভিত্তি না পেয়ে ক্রমান্বয়ে নির্মূল হয়ে যেতে থাকে।[১৬]

---

১৬. আল্-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব - ১)

তাই বর্তমান পরিবেশে দাঁড়িয়ে বলা যায়, একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্ব Big Bang-র অনুকূলেই বিজ্ঞানীদের হাতে অজস্র প্রমাণ মওজুদ রয়েছে এবং তারা এই প্রস্তাবের বাস্তবতার আলোকেই কেবল সৃষ্টির বিষয়সমূহ, জটিলতা ও পরিবেশসমূহ্কে আ᠎শ্চর্য রকমভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, যা অন্য কোন প্রস্তাব দিয়ে সম্ভব ন।

আজকের যুগে যেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিতত্ত্ব এই 'Big Bang' মহান সৃষ্টিকর্তার মহা সৃষ্টি সম্পর্কীয় পবিত্র বাণীসমূহকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে এবং মানুষের তৈরী করা কাল্পনিক ও ভ্রান্ত তথ্য, প্রস্তাব মিথ্যা প্রমাণিত করে প্রত্যাখ্যান করছে, সেখানে সত্য প্রমাণগুলো জানার পরও কি আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলবে না?

সৃষ্টিতত্ত্বঃ বিষয়ক অধ্যায়ের পুরো পর্যালোচনার সারাংশকে এবারে আমরা 'এক নজরে' আনছি।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা নিজেরাই কি নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে"? (৫২ ঃ ৩৫)	(১) বর্তমান বিজ্ঞান দৈবক্রমে, বিশৃংখলা কিংবা নিজে-নিজেই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণাকে পরিত্যাগ করেছে এবং 'Big Bang' নামক এক সহজ, সরল, নিয়ম-শৃংখলার ভিতর দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছে।
(২) "পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কিভাবে কেমন করে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (২৯ ঃ ২০)	(২) শতাব্দীর পর শতাব্দী বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সকল উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে Back ground radiation 2.73k. আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির সূচনা ঘটে 'Big Bang'

	নামক এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, প্রায় ১০$^{-৩৩}$ সেঃমিঃ মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে এবং ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড মহাসূক্ষ্ম সময়ে, ১০^{৩২}k প্রচ[illegible]তাপমাত্রায় কথিত এই মহাবিস্ফো[illegible] ভিতর দিয়েই মহাবিশ্ব [illegible] হয়ে এখনও মহাসম্প্রসার[illegible] নিয়োজিত আছে।
(৩) "ওহে মানুষ ! তোমরা তে[illegible] ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" (৫৬ ঃ ৬২) "তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন?" (২৯ ঃ ১৯)	(৩) ১৯৬৪ সালে 'Big Bang' সৃষ্টিতত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীগণ ওটার খুঁটিনাটি অনেক তথ্যই প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাতে দেখানো হয়েছে যে, মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তুভর বর্ণনাতীত, অকল্পনীয় প্রচন্ড এক শক্তির মহাসঙ্কোচনের ফলে ১০$^{-৩৩}$ সেঃমিঃ-এ (প্রায়) 'Singularity' ধারণ করে (সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে), যার অস্তিত্ব প্রায় শূণ্যের কোঠায় এবং তাত্ত্বিকভাবেই কেবল তা মেনে নেয়া যায়। বাস্তবে এর কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব বোধগম্যের সম্পূর্ণ বাইরে।
(৪) "তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতএব হে মানুষ! বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় ফিরে চললে?" (৪০ ঃ ৬২)	(৪) বর্তমান বিজ্ঞান তার সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মহাকাশে দৃষ্টির সর্বশেষ প্রান্তসীমা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান দিয়েছে এবং বলেছে এই সকল কিছুই 'Big Bang' নামক মহাবিস্ফোরণ থেকেই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে।

(৫) "তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।" (৬ ঃ ৭৩)

"তারা কি নিজেদের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য"। (৩০ ঃ ৮)

(৫) বর্তমান বিজ্ঞানীগণ 'Big Bang'-র উপর ব্যাপক গবেষণা করে রীতিমত আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর তথ্যাদি জানিয়ে আল- কুরআনের বক্তব্যকেই যেন উজ্জল থেকে উজ্জ্বলতর করে চলেছে। তাদের কথামত 'Big Bang'-র শুরুতে আদি অগ্নি গোলক (Primordial fire ball) -এর সৃষ্টির মধ্যে এসেছে এক অতি বিস্ময়কর ও সংকটপূর্ণ পরিমাপমিতি। এই আদি অগ্নি গোলকের মধ্যে বস্তু ও অবস্থার যে অণুপাত প্রাথমিক অবস্থায় নির্ধারিত হয়েছিল, তার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরিমাণ ব্যতিক্রম যদি হতো, তাহলে মহাবিশ্বকে বর্তমান চেহারায় দেখতে পেতাম না। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীতে ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়ামের নির্দিষ্ট যে অনুপাত দেখতে পাই, তা আদি অগ্নি গোলকের প্রকৃতিতে সামান্য পরিবর্তন ঘটলে আর বজায় থাকতো না। যদি কোন পারমাণবিক শক্তি অন্য একটি হতে সামান্য একটু বেশি হতো, তাহলে তখন সমস্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের আইসো-টোপে পরিণত হতো। নক্ষত্রসমূহ হয়ে পড়ত বিস্ফোরণমুখ পদার্থস্তূপ, সূর্যের মত কোন নক্ষত্র কখনও জন্মলাভ করতো না। ঘটতো না জীবনের উন্মেষ। ১৯৭৩ সালে

"আল্লাহ্‌র বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাপ"। (১৩ ঃ ৮)	বিজ্ঞানী 'স্টীফেন হকিংস' ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, আদি অগ্নি গোলকের সম্প্রসারণ যদি অযুত কোটি ভাগের এক ভাগ (One part in a million million) বেশি হতো, তবে মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু এতদিনে ধ্বংস হয়ে যেত। মহাকর্ষবল কখনোই গ্যাসমালা একত্রিত করে নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সির জন্ম দিতে সক্ষম হতো না। যদি এই সম্প্রসারণ অযুত কোটি ভাগের এক ভাগ কম হতো তাহলে মহাকর্ষবল মহাবিশ্বকে ১ বিলিয়ন বৎসর বয়সকাল হওয়ার পূর্বেই ধ্বংস করে ফেলতো। These things are to me immensely strange. Is it not extra ordinary that the possibility of taking here this afternoon depends on events which were very narrowly determined over 10,000 million years ago in the very earliest moments of the Universe? স্যার বার্নাড লোভেলের দেয়া এই সব তথ্য হতে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাই যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালে সূক্ষ্ম পরিমাপ-পরিমাণমিতি জ্ঞানের বিস্ময়কর বিষয়টি, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে

	আজকের এই বর্তমান মহাবিশ্ব।
(৬) "তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি সময়কালে সৃষ্টি করেছেন"। (৫৭ ঃ ৪)	(৬) সৃষ্টিতত্ত্বঃ Big Bang প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে 'অটল পরমাণুসমূহ' (Stable Atoms) সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত ৬টি পর্যায় বা সময়কাল (Period) অনুমোদন করে। যেমনঃ- ১) প্লাঙ্ক টাইম (Plank Time). ২) ইনফ্লেশান পিরিয়ড (Inflation Period). ৩) এ্যানিহিলেশান পিরিয়ড (Annihilation Period). ৪) প্রোটনস্ এবং নিউট্রনস পিরিয়ড (Protons & Nutrons Period). ৫) এ্যাটমিক নিউক্লি পিরিয়ড (Atomic Nuclei Period). (৬) এ্যাস্টেবল এ্যাটমস্ পিরিয়ড (Stable Atoms Period).
(৭) মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কীয় 'কুরআনের' উক্ত বক্তব্যসমূহ প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বের, যা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোহীন এক অন্ধকার মরুপ্রান্তরে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানরত এবং আগত মানবমন্ডলীর জন্য, প্রেরিত সর্বশেষ রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।	(৭) বিংশ শতাব্দীতে–১৯৩৩ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী 'জর্জ-ল'মেইটর' সর্বপ্রথম 'Big Bang' প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানী মিঃ গামো উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং অঙ্ক কষে দেখান যে Big Bang বিস্ফোরণে মেটার এবং এন্টি মেটার সংঘর্ষে ধ্বংস

	প্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back ground radiation) 3K এখনো মহাবিশ্বে সম্ভবত ছড়িয়ে আছে, যা পর্যবেক্ষণে হয়তো বা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। পরে ১৯৬৪ সালে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী 'Arno Penzias' এবং 'Robart Wilson' একপ্রকার হঠাৎ করেই তাদের Radio telescope দিয়ে উক্ত Back ground radiation 2.73k আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন সৃষ্টিতত্ত্ব 'Big Bang' সত্য ঘটনা।
(৮) "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এ এক মহা সাফল্য"। (১০ ঃ ৬৪)	(৮) এক এক করে দীর্ঘ প্রায় ১৪০০টি বৎসর অতিক্রম করে হাজারো-লক্ষ-কোটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তবেই কেবল মানবসম্প্রদায় শুধু কুরআনের বক্তব্যের অনুসরনেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়। একটা দীর্ঘ সময় পূর্বেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কীয় যে বক্তব্য পেশ করেছিল আল্‌-কুরআন, পরবর্তীতে তাই হয়ে গেলো পুরোপুরি বিজ্ঞান।
(৯)"এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য" (৩১ ঃ ৩০)	(৯) মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং জটিল থেকে জটিলতর প্রতিটি পর্যায় এর পিছনে

	বুদ্ধিদীপ্ত এক মহাজ্ঞানী ও প্রচন্ড ক্ষমতা এবং প্রভাবশালী সত্ত্বার উপস্থিতি প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত হচ্ছে, যা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সুতরাং মানব সভ্যতা তার সর্বোচ্চ অগ্রগতির চূড়ান্ত পর্যায়ে আবিস্কৃত সকল উৎকৃষ্ট প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে সর্বশেষ যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা পুরোপুরিভাবে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ 'আল-কুরআনের' সৃষ্টি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহকে 'সত্য' প্রস্তাব হিসেবে প্রমান করেছে। ফলে কুরআনের সাথে সাথে কুরআন অবতীর্ণকারী হিসেবে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপস্থিতিও স্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, যা অস্বীকার করার সকল পথ কার্যত জ্ঞানী সমাজের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য ও বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রার কারণে প্রতিটি আবিষ্কারই এখন এক ও একক সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্'-র পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছে। চলুন সামনের দিকে, বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে জ্ঞানের আঙ্গিনায় দর্শন লাভ করার সুযোগ মিলবে।

আলো থেকে সৃষ্টি

আল্-কুরআনঃ

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী" (২ ঃ ২২৮)

"তিনি ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান"। (৩০ ঃ ৫৪)

"তবু তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী"। (১৩ ঃ ১৩)

"তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী"। (২২ ঃ ৭৪)

"বলো! আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও এর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪)

"আমি (আল্লাহ্) আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে এবং আমি সম্প্রসারণ করছি।" (৫১ ঃ ৪৭)

"সে সত্ত্বাই আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায়। তিনি যখন ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।" (৬ ঃ ৭৩)

"আমার (আল্লাহ্‌র) আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়, একবার ব্যতীত নয়।" (৫৪ ঃ ৫০)

"আল্লাহ্‌র নূরে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী উদ্ভাসিত .... আলোর উপর আলো.............।" (২৪ ঃ ৩৫)

"তারা কি লক্ষ্য করে না কিভা[illegible]ল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে দান করেন?" (২৯ ঃ ১৯)

"বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি[illegible] কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কেমন করে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ ক[illegible]।" (২৯ ঃ ২০)

"এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ[illegible]।(৩১ ঃ ৩০)

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ ঃ ৭৩)

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌পাক নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন– সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী রূপে, যাঁর সমকক্ষ তুলনাতো দূরের কথা – কল্পনারও তা অতীত। এমন এক চিরঞ্জীব, চিরন্তন, শ্বাশত- কালজয়ী, মর্যাদাশালী মহান সত্ত্বা তিনি, যাঁর নূরের আলোর মধ্যে গোটা সৃষ্টিজগৎ ভাসমান। প্রতিনিয়ত সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি করেন যদিও মানুষ তাঁর সঠিক মর্যাদা বুঝতে চায় না। তাঁর প্রচন্ড ক্ষমতার সামনে সমস্ত সৃষ্টিজগৎ ভয়ে সন্ত্রস্ত। তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু 'হও' বলতেই ঝলকের ন্যায় সৃষ্টি হয়ে অস্তিত্ব ধারণ করে। এর সামান্যতম ব্যতিক্রম হয় না।

শেষের দিকের আয়াতগুলোতে এই বিশ্বজাহানের 'গোড়াপত্তন' কিভাবে হয়েছে, সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন – 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করো কি পদ্ধতি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অবলম্বন করা হয়েছে প্রারম্ভিক সৃষ্টিকার্যে'। এ সম্পর্কে তিনটি আয়াতে সংক্ষিপ্তাকারে 'প্রারম্ভিক সৃষ্টি কৌশল' সম্পর্কে হালকা স্পর্শ (Soft touch) করে 'তথ্যের ভান্ডার'-এর মুখ খুলে দেয়া হয়েছে, জ্ঞানের মহাসাগরে চিন্তার ঢেউ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে করে ভূ-পৃষ্ঠের মানবসম্প্রদায় পরবর্তীতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে 'একদম শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির' বিষয়টি প্রমাণ করে মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতি যে এর পিছনে কার্যকর, তা যেন বিশ্বাসের সাথে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে। লক্ষ্য করুন, ২৪ঃ৩৫ নং আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আকাশমন্ডল ও পৃথিবী 'আলোকশক্তি' (নূর) দিয়ে সৃষ্টি," এবং এই আলোকের ঘনীভূত অবস্থা হচ্ছে কল্পনাতীত-ধারণাতীত, ভাষায় প্রকাশ বহির্ভূত অবস্থা 'আলোর ওপরে আলো' (নূরুন আ'লা নূর)। মানুষ সকল সময়ই এই অবস্থার প্রকৃতরূপ ব্যাখ্যা করতে অপারগ। এরপর ১১ঃ৬৬ নং আয়াতটিতে পূর্বের আলোচিত ২৪ঃ৩৫ নং আয়াতের শেষের অংশের প্রতি আরও জোর সৃষ্টি করা হয়েছে এই বলে যে, 'তিনি মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী' (কাভিউন আজিজ) অর্থাৎ, তাঁর ক্ষমতার অবস্থা হচ্ছে যেন 'শক্তির উপরে শক্তি', মানবীয় জ্ঞানে যে শক্তির না ব্যাখ্যা দেয়া যায়, না পরিমাপ করা যায়, এমন এক ধারণাতীত মহাক্ষমতা দিয়েই তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাজ শুরু করেন।

তারপর ৫১:৭৪ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– "আমি আকাশমন্ডলী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছি শক্তির বলে এবং আমি সম্প্রসারণ করছি" (৫১ : ৭৪)। এই আয়াতে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য অল্পকথায় আকর্ষনীয়ভাবে পেশ করা হয়েছে। আকাশমন্ডলীকে শক্তিবলে সৃষ্টি করার কথা পেশ করে আমাদের ওপরের আলোচনাকে দৃঢ় করা হয়েছে, এবং সম্প্রসারণের কথা বলে মহাবিশ্বের গোড়া পত্তনের প্রারম্ভিক পর্যায়টিকে ব্যাখ্যার দিক থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো হয়েছে। অর্থাৎ, মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করে
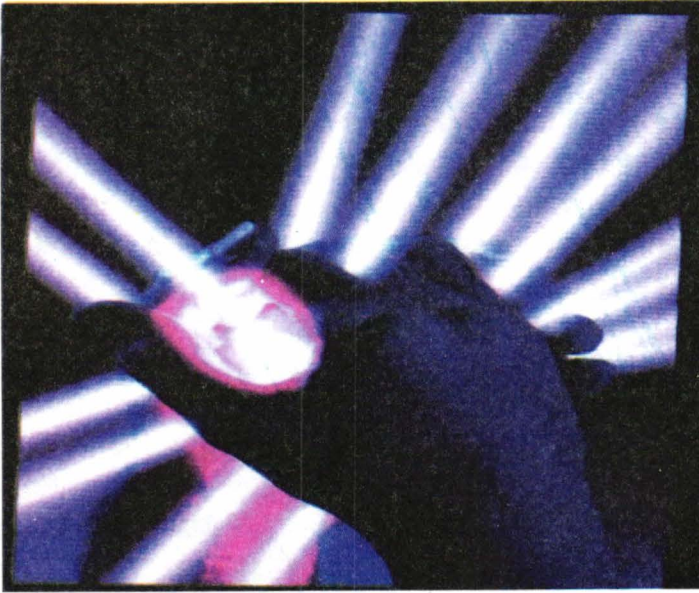
চিত্রঃ ৬৬
'মহাবিশ্ব' সৃষ্টির সূচনা হয় অকল্পনীয় 'আলোকশক্তির' উৎস থেকে।

তিনি তাকে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত রেখেছেন। তাহলে ঠিক সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে মহাবিশ্ব নামক শক্তির আধারটিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর মহাজ্ঞান ও প্রচন্ড ক্ষমতা দিয়ে জ্ঞানের অবোধগম্য ব্যাপক বিশাল বর্ণনাতীত 'আলোর ওপরে আলোক শক্তিকে' (নূরুন আ'লা নূর) এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনীভূত করেছেন। পরক্ষণেই ঐ আলোকশক্তি হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে তাকে মহাসম্প্রসারণের পথে প্রবাহিত করেছেন। এই সম্প্রসারণের বিষয়টি 'নিউটনের থার্ড-ল' মনে করিয়ে দেয়, 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একটা দীর্ঘ সময় পরও যেভাবে কেবল এগিয়ে যাচ্ছে– তাতে

প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান বর্ণনাতীত পরিমাণ 'আলোকশক্তিকে' একটা মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনীভূত করে থাকবেন। ফলে অবিশ্বাস্য পরিমাণ তাপ এবং চাপের কারণে প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে পূর্বের সঙ্কোচনের (ঘনায়নের) বিপরীতে এখন সমানুপাতিকভাবে মহাসম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে কেবল এগিয়ে যাচ্ছে।

এবার আমরা পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আলোচিত বিষয়টি গুছিয়ে আনলে, মহাবিশ্বের তথা সৃষ্টির গোড়াপত্তন সম্পর্কিত প্রারম্ভিক সৃষ্টি কৌশল দাঁড়ায় এইভাবে যে, 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর মহাজ্ঞান এবং প্রচন্ড ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির গোড়াপত্তনের সময় প্রারম্ভিক পর্যায়ে ব্যাপক-বিশাল বর্ণনাতীত পরিমাণ 'আলোকশক্তিকে' এক মহা সূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনীভূত করেন। পরক্ষণে সেই ঘনীভূত শক্তি থেকে সৃষ্টির সূচনা করেন এবং সৃষ্ট মহাবিশ্বকে ঐ ক্ষণমুহূর্ত হতে মহাসম্প্রসারণে ব্যাপৃত রাখেন।' এই মহাসম্প্রসারণটি, মহাসঙ্কোচনেরই যে সমানুপাতিক, তা ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আর 'আল্লাহ্' সত্য এবং বাস্তব বিধায় তাঁর বাণী অবশ্যই সত্যে পরিণত হয়। কোন ব্যতিক্রম হয় না।

বিজ্ঞানঃ

এখন আমরা একদম শূন্য অবস্থায় 'আলোকশক্তি' থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বসমূহ নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়াস পাবো। পূর্বে যদিও এই বিষয়টি বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানীমহলে বেশি সাড়া জাগাতে পারেনি; কিন্তু অধুনা আশ্চর্য করার মত Back ground radiation আবিষ্কৃত হওয়ায় Big Bang Model-এর মাধ্যমে আজকের অপ্রতিরোধ্য বিজ্ঞান একদম শূন্যাবস্থা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিষয়টিকে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় চোখে দেখে থাকে। বিশ্বজোড়া প্রযুক্তিগত বিস্ময়কর উৎকর্ষতার সাথে মানবসম্প্রদায় এখন 'শূন্য হতে মহাবিশ্বের সৃষ্টির' দুর্লংঘ প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছে সম্ভাবনায় এবং বাস্তবতায়।

১৯৩৩ সালে অফিসিয়ালি একজন বেল্‌জিয়াম মৃত্তিকা বিজ্ঞানবিদ 'জর্জ ল্যা' মেইটর' (Joerge Lemaitre) সর্বপ্রথম একদম শূন্য হতে শক্তির মহাবিস্ফোরণ–জাত ঘটনায় জন্ম নেয়া মহাবিশ্বের ধারণা পেশ করেছিলেন। তার সেই প্রস্তাবে পৃথিবীর বয়সের চেয়ে মহাবিশ্বের বয়স ভুলক্রমে কম হওয়ায় প্রস্তাবটি অনেক জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে 'Steady

State' তত্ত্বের প্রস্তাবক দ্বারা বানচাল হয়ে যায়। এরপর ১৯৫০ সালে 'রেডিও এ্যাস্ট্রোনমি' এসে অসংখ্য ভুলসমৃদ্ধ 'Steady state' তত্ত্বকে সরিয়ে দেয়। ১৯৬০ সালে 'দুর্বল বেতার ধ্বনি' এবং ১৯৬৪ সালে Back ground radiation (পশ্চাদপীট বিকীরণ) ২.৭৩k. আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে 'Big Bang' তত্ত্বের সত্যতা ধ্রুবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিজ্ঞানজগত এক নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছে যায়[১৭]। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একমাত্র এই 'Big-Bang model'-ই করতে পারে আর কোন তত্ত্বই সঠিক ব্যাখ্যা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বজোড়া খ্যাতির শীর্ষে অবস্থানকারী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের এ সম্পর্কীয় সমীকরণ $E = mc^2$ একদিকে যেমন একদম শূন্য অবস্থা হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কীয় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে, অপরদিকে তেমনি একই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে ব্যাপকভাবে 'সত্যবাণী' রূপে স্বীকার করে। উক্ত সমীকরণ অনুযায়ী ১ কেজি ভরে নিহিত শক্তির পরিমাণ হলো ঃ

$$E = mc^2$$
$$= 1 \times (3 \times 10^8)^2 \text{ ধ্রুবক } c = (3 \times 10^8)^2 m/\text{second}$$
$$= 9 \times 10^{16} \text{ Joules}$$
$$= 90,000,000,000,000,000 \text{ Jules}$$

অর্থাৎ- 90^{16} Jules পরিমাণ শক্তিকে ঘনায়ন করলে প্রায় ১ কেজি পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এই সমীকরণটি বিশ্বে প্রমাণিত সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় পুরো বিষয়টি ধর্মীয় এবং বিজ্ঞান উভয় প্লাট্‌ফরম থেকে বুঝতে একেবারেই সহজ হয়ে পড়েছে।

$$E = mc^2$$
$$M = \frac{E}{C^2}$$
অথবা $\frac{E}{C^2} = M$

Source Of Energy 10^{16} Joules → $\frac{E}{C^2} =$ M 1kg

Wastage level zero

১৭. আল্-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব - ১)
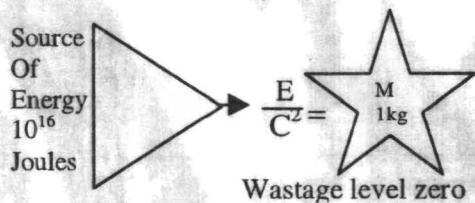
মহাবিশ্বে যা কিছু আছে বিজ্ঞানীরা তাদেরকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন–পদার্থ এবং শক্তি রূপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের পূর্বের ধারণা পাল্টে যায়, এবং সকল

চিত্রঃ ৬৭
পারমাণবিক বোমায় সন্নিবেশিত ভারী পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে গিয়ে ভিন্ন পদার্থের এবং প্রচন্ড বিকীরণের সৃষ্টি করে। এতে মোট বস্তুভর সামান্য কমে যায়। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ঐ বস্তুভর-ই পরক্ষণে রূপান্তরিত হয়ে প্রচন্ড শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ফলে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তর প্রমাণিত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞানী একবাক্যে স্বীকার করেন যে–যুগপৎভাবে শক্তি পদার্থে আবার পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পারমাণবিক বোমার মধ্যে ইউরেনিয়াম – ২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম–২৩৯ নামক যে ভারী পদার্থ রয়েছে, প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে তাদের নিউক্লিয়াসে যখন ভাঙ্গন শুরু হয়, তখন সেই বিক্রিয়ায় মোট বস্তুভর সামান্য কমে যায়, এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বস্তু-ভরই বিস্ফোরণের প্রচন্ড শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ফলে এতে প্রমাণিত হয়ে গেল যে বস্তু একটা পদ্ধতিগতভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা অস্বীকার করার বাস্তব কোন উপায় নেই। একই দৃষ্টান্ত ঘট্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্যের ভিতর, সেখানেও প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬০০ মিলিয়নটন হাইড্রোজেন–হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটিতে প্রায়

৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ভর অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই হারিয়ে যাওয়া ভরটি পরিণত হয় তাপ ও অন্যান্য বিকীরণ শক্তিতে যা পরবর্তীতে গোটা সৌরজগতকে তাপ শক্তিতে ভাসিয়ে রাখে।
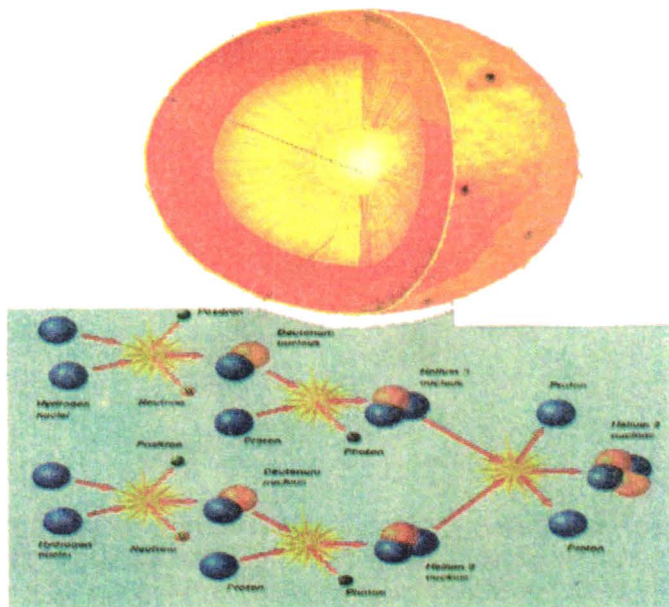
চিত্রঃ ৬৮
আমাদের সূর্যের কেন্দ্রে প্রতিমুহূর্তে প্রায় চার মিলিয়ন টন 'হাইড্রোজেন' বস্তুভর অদৃশ্য হয়ে তাপ ও অন্যান্য বিকীরণ শক্তিতে রূপান্তরীত হচ্ছে এবং সৌর ব্যবস্থাকে সেই শক্তির মাধ্যমেই টিকিয়ে রাখছে। এ তথ্য আজ প্রমাণিত সত্য।

এ পর্যন্ত এসে বলতে পারেন যে, 'বস্তু থেকে শক্তিতে রূপান্তর' তা মেনে নিলাম; কিন্তু শক্তি থেকে বস্তুতে বাস্তবে রূপান্তর কি সম্ভব? উত্তরে বলতে হচ্ছে, হাঁ, আজকের বিজ্ঞানজগতে শক্তিকেও পদার্থ হিসাবে রূপান্তরিত করার বিষয়টিও আর কল্পকাহিনী নয়; বরং বাস্তবতার আলোকেই তা প্রমাণিত সত্য হিসাবে ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীগণ ল্যাব্‌রেটরীতে 'গামা রশ্মি' থেকে 'পজিট্রন–ইলেকট্রন' জোড় উৎপত্তির ঘটনায় এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সৃষ্টি করেছেন। 'গামা রশ্মি' এক ধরনের শক্তি-আলো, এক্স-রে

ইত্যাদি সমজাতীয়। পরীক্ষাগারে পদার্থের সঙ্গে 'গামা-রশ্মির' সংঘাত ঘটিয়ে দেখা গেল যে, ঐ রশ্মির শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে আর একই সাথে 'ইলেকট্রন—পজিট্রনের জোড়' জন্ম নিয়েছে। এই জোড়ের দুটি কণায় যে
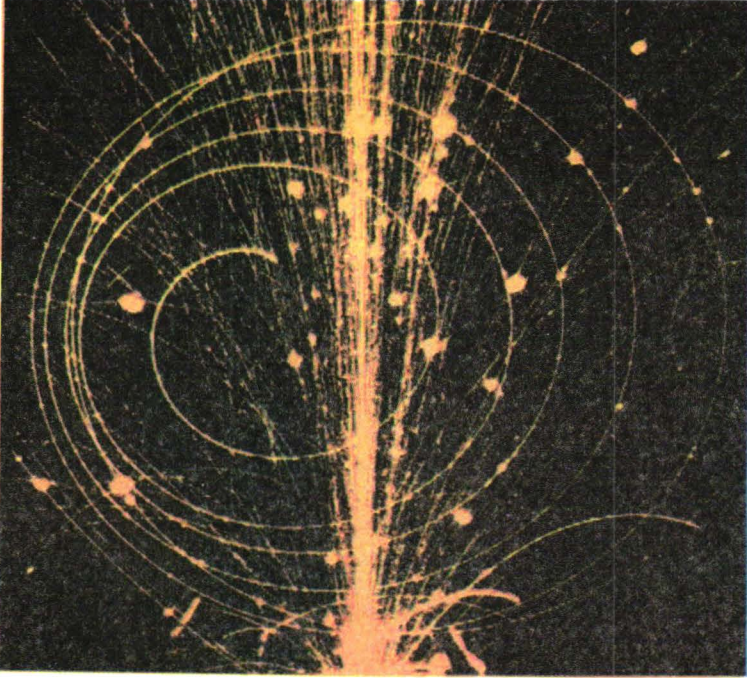
চিত্রঃ ৬৯

মহাবিশ্বে 'গামা-রশ্মির' ফোয়ারা থেকে পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। 'আলোক শক্তি' হতে পদার্থ সৃষ্টি বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয়, যা মহাবিশ্বের বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীকূলকে মহাসত্যের দিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে। গামা-রশ্মি মূলতঃ-ই 'High energy radiation'.

মোট ভর, গামা রশ্মির 'ফোটনে' (আলোর ক্ষুদ্রতম অংশ) তার সমতুল্য শক্তির সমান শক্তি বা তার চেয়ে বেশি শক্তি থাকলেই এই জোড়ের উৎপত্তি সম্ভব। এই শক্তি যদি বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত শক্তি প্রকাশ পায় উৎপন্ন শক্তির কণা দুটির কোন একটির গতিশক্তিরূপে। একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের মোট ভরের সমতুল্য শক্তি হলো ১.০২ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। অর্থাৎ, ১০.২ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। সিজিয়াম -সি নামক তেজস্ক্রীয় পদার্থ থেকে নির্গত 'গামা-রশ্মির' ফোটনে থাকে ২.৬২ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট

শক্তি। এই রশ্মি থেকে ইলেকট্রন পজিট্রনের জোড়ের সৃষ্টি হলে অতিরিক্ত শক্তির পরিমাণ হয় (২.৬২−১.০২)=১.৬ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট।
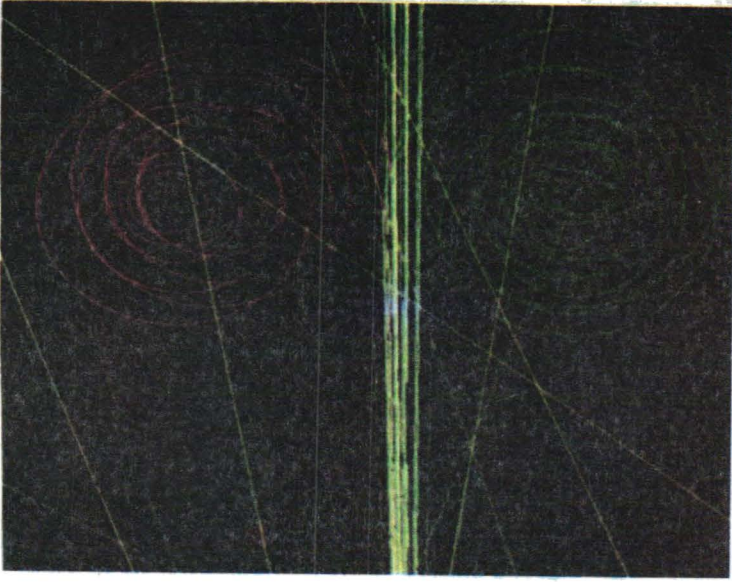
চিত্রঃ ৭০
"তিনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান"। (৩০ঃ৫৪)
'Burst of Gamma-ray' (হলুদ) থেকে Particle বা Electron (সবুজ)-এর সাথে সাথে Antiparticle বা Positron (লাল) জোড় সৃষ্টি হচ্ছে।

পরীক্ষায় দেখা যায় যে উৎপন্ন পজিট্রনের গতির সর্বোচ্চ শক্তির পরিমাণ ১.৬ মেগাইলেকট্রন ভোল্ট। ১৯৫৫ সালে 'বিভট্রিন' নামক ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটনগুচ্ছকে অত্যন্ত গতিশীল করে এবং সেই শক্তি-সম্পন্ন প্রোটনগুচ্ছকে তাম্র খন্ডের উপর নিক্ষেপ করে চেম্বারলেন, সেগ্রে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখান যে, প্রোটন– এন্টিপ্রোটন জোড় উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। পরবর্তীকালে আরো শক্তিশালী প্রোটনগুচ্ছ ব্যবহার করে উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে 'ডিওটেরণ–এন্টিডিওটেরণ' জোড়। ডিওটেরণ হলো, হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, ডিওটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস যা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত একটি স্থায়ী পদার্থ। এভাবে বিজ্ঞানাগারে প্রমাণিত

হলো 'শক্তি' ও পদার্থরূপে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া শক্তি ও যে ভরসম্পন্ন তা প্রমাণিত হয়েছে প্রায় শতবৎসর পূর্বে। 'Prof. Pn. Lebedev' কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছিল আলো যখন পদার্থের উপর পতিত

চিত্রঃ ৭১

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর কিভাবে আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন"। (২৯ ঃ ২০)
'ল্যাবরেটরীতে' বিজ্ঞানীগণ 'পদার্থ থেকে শক্তি' এবং 'শক্তি থেকে পদার্থ' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে ভূ-পৃষ্ঠে মানবসমাজ কর্তৃক এ এক অনন্য আবিষ্কার।

হয়, তখন তা পতিত ক্ষেত্রতলে চাপের সৃষ্টি করে। দেখা গেছে অতি পাতলা ধাতব পাতের উপর আলোর ঝলক ফেললে পাতটি সামান্য স্থানচ্যুত হয়। রৌদ্রোজ্জল দিনে প্রতি বর্গমিটারে এই চাপের পরিমাণ .00047gm. 'This Experiment led to the indispute conclusion that a flux of light had mass'অর্থাৎ, এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে আলোর ঝলকও ভরসম্পন্ন শক্তি। বিজ্ঞানীগণ এই পরীক্ষায় আরো সিদ্ধান্ত পেলেন 'Light is a form of matter in motion' আলো চলমান

বস্তুরই প্রতিরূপ মাত্র। ব্যাপক অর্থে– 'The whole material world matter in motion, exist in two principles, mutually related forms as of moving particles of matter and as light'অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টিতে বস্তুভর হয় চলমান কণা বিস্তার কিংবা আলোক হিসাবে বিরাজ করে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে 'কোয়ার্ক' এবং আলোর
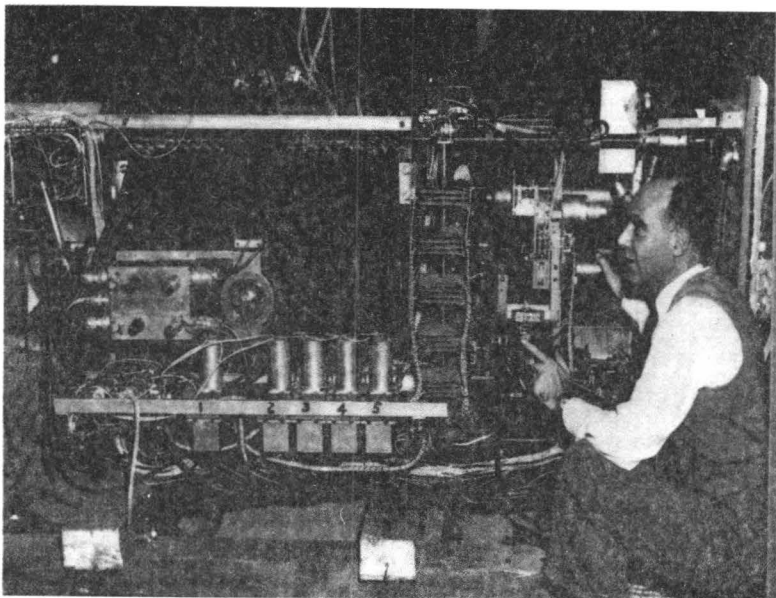
চিত্রঃ ৭২
"তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন"।
(২৯ ঃ ১৯)

ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে 'ফোটন' কণা। আবার 'কোয়ার্কের' পর পদার্থের রূপটি আর পদার্থ থাকে না। তখন প্রকাশ ঘটে 'ফোটন' কণায়। পুরো বিষয়টিকে এক কথায় সাজালে বলা যায় – পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে ভাংতে ভাংতে এগুতে থাকলে এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা আর পদার্থ পাব না, পাব শুধু 'আলো আর আলো'। এই তথ্য বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পরম সত্য ঘটনা।

সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞানের বদৌলতেই কেবল বলা যায় যে – শক্তি, আলোকরশ্মি অথবা বিকীরণ শক্তি হতে পদার্থ তথা বিপুল শক্তি হতে বিপুল পরিমাণ পদার্থ সৃষ্টির বিষয়টি একটি বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা বহন করে। বস্তুগত অস্তিত্ব হিসাবে একদম শূন্য অথচ শক্তিগত অস্তিত্ব হিসাবে বিপুল কোন
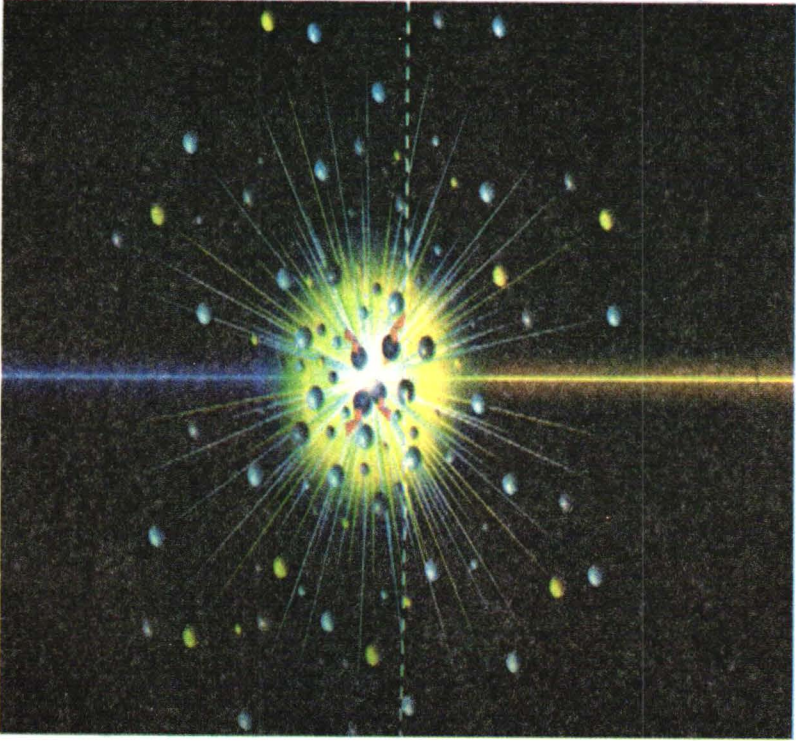
চিত্রঃ ৭৩

"আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আণয়ন করেন এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটান"। (১০ ঃ ৩৪) মহাশূন্যে 'আলোক শক্তি' হতে পদার্থ সৃষ্টি হয়ে মহান স্রষ্টার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে সগৌরবে। স্রষ্টার এই বিস্ময়কর কীর্তিকে কিভাবে মানুষ অস্বীকার করতে পারে?

শক্তিকে বস্তুতে রূপান্তর করা যায়–এ বিষয়টি বিজ্ঞান অনুমোদিত ও প্রমাণিত সত্যও বটে। যেহেতু মহাবিশ্বের আদি পদার্থ সম্পূর্ণ শূন্য হতে

একটি বস্তুগত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে–সেহেতু অবশ্যই আমাদেরকে মেনে

চিত্রঃ ৭৪

"তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী"। (১৩ ঃ ১৩)

'আলোর ফোয়ারা ' যে, মহাবিশ্বে পদার্থ কণিকা সৃষ্টির মূল ভূমিকায় সক্রিয় রয়েছে, তা প্রমাণ করে The Fermi National Accelerator Laboratory, America.

নিতে হবে যে, এই বিতর্কিত পদার্থ একটি আদি শক্তি হতে উদ্ভূত, অন্যথায় কোনভাবেই তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যায় পৌঁছা সম্ভব নয়, এবং $E=mc^2$ এই সমীকরণ ও ভেংগে পড়বে ব্যাখ্যাহীনতার কারণে।

বিজ্ঞানের উল্লেখিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই Big Bang Model নামক মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক প্রস্তাবটি সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় Big Bang-র শুরুতে ১০$^{-৩৩}$সেঃমিঃ ব্যাসের মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ১০$^{-৪৩}$সেকেন্ড মহাসূক্ষ্ম এক সময়ে কোন মহাশক্তির উৎস থেকে প্রচন্ড-ব্যাপক-বিশাল বর্ণনাতীত শক্তিপুঞ্জের এত তীব্র ঘনায়ণ ঘটে যে,

সীমাহীন তাপ এবং চাপের কারণে মুহূর্তেই ঘটে যায় প্রচন্ড মহাবিষ্ফোরণ, আর সাথে সাথেই মহাবিশ্বের গোড়া পত্তন হয়ে শুরু হয়ে যায় বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের ন্যায় মহাসম্প্রসারণ। ঐ সময় শিশু মহাবিশ্বে তখন বিরাজ করছিল আলো আর আলো, আলোর বন্যায় ভাসছিল গোটা সৃষ্টি, সেই আলোর ঘনত্ব ছিল পদার্থের ঘনত্বের চাইতে অনেক বেশি।
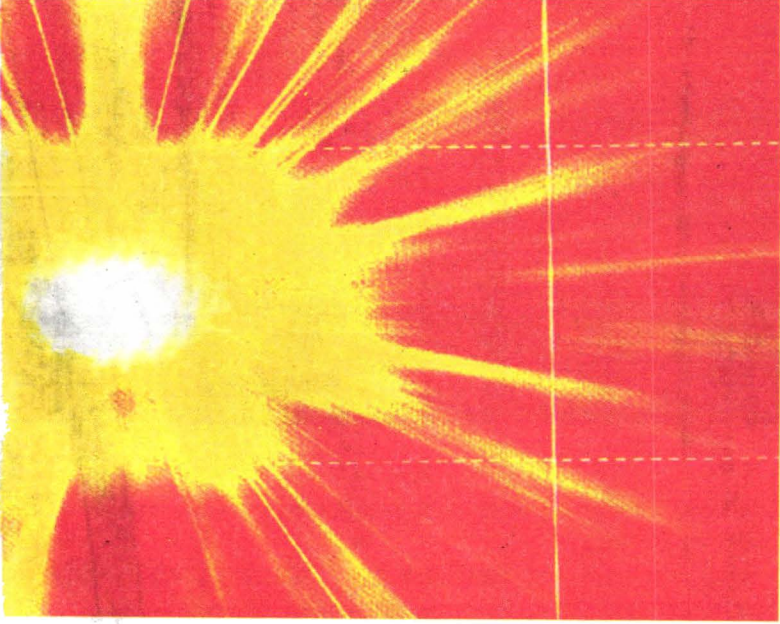
চিত্রঃ ৭৫

"আল্লাহ্‌র নূরে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী উদ্ভাসিত........ আলোর উপরে আলো....."। (২৪ ঃ ৩৫)

"তাঁর মহাবাণী (আল্-কুরআন) অবশ্যই সত্য"। (৬ ঃ ৭৩)

'Big-Bang' নামক মহাবিষ্ফোরণ এবং তার পরবর্তী কলাটি 'আলো আর আলো' দিয়ে উদ্ভাসিত। আর সেই আলো থেকেই ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব অস্তিত্ব ধারণ করে।

পরবর্তীতে এই আলোকশক্তি থেকেই সৃষ্টি হয় পর্যায়ক্রমে ফোটন, কোয়ার্ক, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং শেষে Stable atoms বা অটল-পরমাণুসমূহ। সব শেষে অটল-পরমাণুসমূহ (Stable atoms) হতে জন্ম নেয় 'মহাবিশ্ব'।
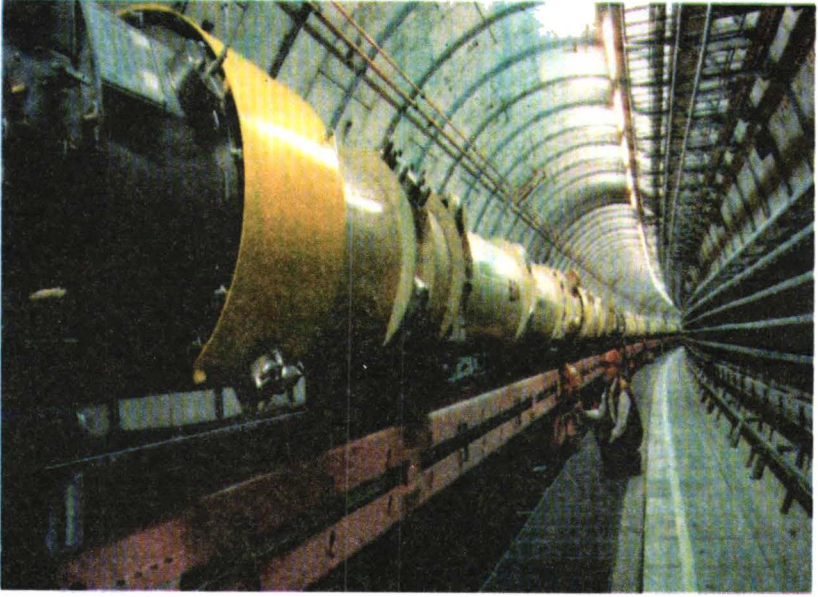
চিত্রঃ ৭৬
"এ সমস্তই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে, তা মিথ্যা"। (৩১ ঃ ৩০)
'আলো থেকে পদার্থ' এবং 'পদার্থ থেকে আলো' সৃষ্টির বিষয়টি বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছে The 'DESY' Laboratory, Hamburg, Germany-তে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বহুল আলোচিত 'একদম শূন্য হতে পদার্থ সৃষ্টি' বিষয়ে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে জ্ঞানের আলোহীন মরু প্রান্তরে পবিত্র কুরআনের বাণী সম্ভার যে মণি-মুক্তা ছড়িয়ে গেছে, তা আজকের বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাফল্যময় পরিবেশেই কেবল প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল, যার কারণে প্রায় একটি শতাব্দির পুরো সময়টিতেই বিজ্ঞানীমহল মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে রীতিমত হিম-সীম খেয়েছেন, হাজারো সমস্যা মোকাবিলা করেছেন, বিরাট-বিপুল সম্পদ এর পিছনে ব্যয় করেছেন। পরিশেষে সৃষ্টির পিছনে লুকায়িত 'মূল রহস্য' উদ্‌ঘাটনে সফলতা লাভ করেছেন। "এই সমস্তই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য" (৩১ ঃ ৩০)। অধ্যায়ের পুরো বিষয়টি এবার 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "বলো, আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আণয়ন করেন ও উহার পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪) "তিনি ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।" (৩০ ঃ ৫৪) "আমি আকাশমন্ডলী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছি শক্তিবলে।" (৫১ ঃ ৪৭)	(১) বিংশ শতাব্দীতে এই 'মহাবিশ্বের' সৃষ্টি বিষয়ক 'Big Bang' আবিষ্কার, এক বিস্ময়কর ঘটনার উপর থেকে যেন আবরণ উন্মোচন। এতে প্রমাণ হয় যে, প্রায় $১০^{-৩৩}$সেঃমিঃ মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে কল্পনাতীত, ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব এমন এক মহাবিস্তার শক্তিকে প্রচন্ডরূপে ঘনায়ণের মাধ্যমে আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্র রচনা করা হয়। সৃষ্টি পর মুহূর্ত থেকে এই প্রচন্ড ঘনায়নের বিপরীতে মহাবিশ্বটি মহাসম্প্রসারণে কেবলই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।
(২) "তিনি যখন ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়।" (৬ ঃ ৭৩) "আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায় একবার ব্যতীত নয়।" (৫৪ ঃ ৫০)	(২) 'সৃষ্টি তত্ত্ব' Big Bang-র মতে $১০^{-৩৩}$ সেঃমিঃ মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে বিপুল-বিশাল পরিমাণ শক্তির মহাসংকোচনের এক পর্যায়ে মহাসূক্ষসময় প্রায় $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডে সময়ে কল্পনাতীত প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি লাভ করে। অর্থাৎ, বর্তমান প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত মহাবিশ্বটি $১০^{-৩৩}$ সেঃমিঃ স্থান থেকে সৃষ্টির সূচনা হতে সময় নেয় মাত্র $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড, যার দৃষ্টান্ত হতে পারে চোখের দৃষ্টির ঝলকই শুধু।
(৩) "আল্লাহ্র নূরে	(৩) বিজ্ঞান বিশ্ব আমাদের এই

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী উদ্ভাসিত............'আলোর উপরে আলো'......... (২৪ ঃ ৩৫) (বিপুল আলোক শক্তির প্রচন্ড ঘনায়ণ) "তারা কি লক্ষ্য করেনা, কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? (২৯ ঃ ১৯)	মহাবিশ্বের সৃষ্টির পিছনে যে শক্তি মৌলিকভাবে কার্যকর ছিল, তা উদ্ঘাটন করার চেষ্টায় প্রায় বিগত ২টি শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে এ রহস্য উন্মোচনে সফলতা লাভ করে। Computer এ Big Bang Simulation -এ প্রমাণিত হয় ব্যাপক 'আলোক শক্তি' মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনীভূত হয়ে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করে। ল্যাবরিটরীতেও 'Gamma-ray' (গামা রশ্মি) থেকে পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৩২ সালে Cosmic-ray থেকে Positron প্রথমবারের মত সৃষ্টি করে বিজ্ঞানী 'Paul Dirac' ১৯৩৩ সালে Nobel Prize লাভ করেন।
(৪) "তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ ঃ ৭৩) "এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)	(৪) বিজ্ঞান তার নিরপেক্ষ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ দিয়ে কুরআন অবতীর্ণের প্রায় ১৪০০ বৎসর পরে প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে, এ মহাবিশ্বের যাত্রার সূচনা ঘটে কল্পনাতীত, বিপুল-বিশাল, সীমা-পরিসীমাহীন 'আলোকশক্তির' উৎস থেকে।

সুতরাং যে বৈজ্ঞানিক তথ্য **'ওহী'** আকারে মানবমন্ডলীর মাঝে দীর্ঘ ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রেরিত, সেই একই বক্তব্য বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানের বদৌলতে চূড়ান্তভাবে **প্রমাণিত**।

'মহাজাগতিক তার' (Cosmic String)

আল্-কুরআনঃ

"তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ঃ৮)

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয়ই তিনি (অজ্ঞানতা হতে) অতি পবিত্র"। (১০ঃ১৮)

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান রাখে না।" (২৭ঃ৬৫)

"আল্লাহ্ ঊর্ধ্বাদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন অবলম্বন (খুঁটি) ব্যতীত। তোমরা কি তা দেখছো না?" (৩১ঃ১০)

"শপথ ঐ আকাশসমূহের যা মহাজাগতিক তারের (Cosmic String) অত্যন্ত দক্ষতার বুননে ধারণকৃত।" (৫১ঃ৭)

এ সমস্তই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে, তা মিথ্যা।" (৩১ঃ৩০)

উপরে উল্লেখিত পবিত্র বাণীগুলোর প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌পাক আমাদের জানাচ্ছেন যে, মহাবিশ্বের পরতে পরতে তিনি নানান ধরনের অসংখ্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নেই। আর আকাশমন্ডলে হোক কিংবা ভূ-পৃষ্ঠেই হোক কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের অদৃশ্য বস্তুসমূহের যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রকাশিত করেন, তখন কেবল ততটুকুই আমরা অবহিত হতে পারি। এর বেশি কিছু জানা মানুষ হিসাবে আমাদের সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ্‌পাক আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের ঊর্ধদেশে অবস্থিত আকাশমন্ডলী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন–কোন খুঁটি বা অবলম্বন ছাড়াই– কি পদ্ধতিতে তিনি মহাশূন্যের মাঝে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন, তা-কি আমাদের নজরে পড়ে না? আমরা কি কখনও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি

না? নিঃসন্দেহে বিষয়টিতে চিন্তা-গবেষণার খোরাক নিহিত রয়েছে—তাদের জন্য যারা জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টার দর্শন লাভ করতে চায়। এখানে জোর দেয়া হয়েছে এই বলে যে, কোন খুঁটি বা অবলম্বন ছাড়াই যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই অন্য কোন উন্নতর পদ্ধতির মাধ্যমে অবশ্যই যথাযথভাবে কায়েম করা হয়ে থাকবে। সেই উন্নততর পদ্ধতিটি কি হতে পারে, তা মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে অনাবৃত করা প্রয়োজন। এতটুকন জানার অধিকার আল্লাহ্পাক মানুষের আয়ত্বের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন।

তার পরের ৫১:৭ আয়াতটিতে আল্লাহ্পাক খুঁটিবিহীন আকাশমন্ডলী সৃষ্টির পিছনে পদ্ধতিগত যে আশ্চার্যজনক মূল রহস্য বর্তমান, নিজেই তার ওপর থেকে আবরণ উন্মুক্ত করলেন, বললেন 'আমি শপথ করছি সেই (আশ্চর্যজনক) আকাশমন্ডলীর যা সৃষ্টির পর্যায়ে মহাজাগতিক সূতা বা তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।' ঐ তারের অবর্ণনীয় গুণাবলীয় ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়েই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে মহাশূন্যের মাঝে ব্যবস্থিত হয়ে অবস্থান করছে। ৫১:৭ আয়াতটি অল্প কথায় যেভাবে আকাশ সংগঠন (মহাবিশ্ব বা গ্যালাক্সীসমূহ) সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয়, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অটল পরমাণুসমূহ (Stable Atoms) সৃষ্টি হওয়ার পর যখন মহবিশ্বটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (Matured) অবস্থায় আগমন করে তখন গ্যালাক্সী, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য কোন এক প্রকার মহাজাগতিক সূক্ষ্ম তার বা সুতা বা রশি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সূক্ষ্ম তার বা সূতা-ই পরবর্তীতে পদার্থের গ্যাসীয় মেঘ বা ধূয়াঁরকুন্ডলীকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত করে নিয়েছে। অত:পর একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঐ গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে পড়া পদার্থের ধূঁয়া বা গ্যাসীয় কুন্ডলী থেকে পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি শৃংখলাবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই হচ্ছে ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থ 'কুরআনের' প্রস্তাবিত মহাজাগতিক তারের (Cosmic String) ধারণা এবং কার্যপ্রণালী।

বিজ্ঞানঃ

বিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশকে 'মহাজাগতিক তার' বা Cosmic String বিজ্ঞান জগতে আত্মপ্রকাশ করে তথ্যের প্রবাহ্ সৃষ্টি করে। সর্বত্র হৈ-চৈ পড়ে যায় বিষয়টি নিয়ে। Big Bang Model-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করতে গিয়েই বর্তমান বিজ্ঞানীগণ Cosmic String-র উপস্থিতি এবং আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তার যাদুময়ী কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকেন। এই মহাজাগতিক সূক্ষ্ম তার বা Cosmic String গুলো লম্বায় লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ বা তার চাইতেও বেশি লম্বা। কিন্তু ব্যাস এত সূক্ষ্ম যে কল্পনা করাও দুরূহ ব্যাপার বৈকি। গাণিতিকভাবে প্রকাশ করলে দাড়ায় $১০^{-৩০}$সেঃমিঃ প্রায়, অর্থাৎ, ১সেঃমিঃ দৈর্ঘ্যকে একশত কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তার সমান। একদল কণা পদার্থ বিজ্ঞানী ফের্মীন্যাশনাল অ্যাকসেলারেটার গবেষণাগারে 'সুপার কম্পিউটার চক্র-২' কাজে লাগিয়ে Cosmic String –র ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান যে, এই তারের ব্যাস এত সূক্ষ্ম যে, তা পরমাণুর প্রোটনের চাইতেও $১০^{১৭}$ভাগ ক্ষুদ্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি পরমাণু এবং একটি Cosmic String কে যদি একই অনুপাতে পাশাপাশি বিবর্তন করা যায় এবং বিবর্তন এর কোন এক পর্যায়ে যদি পরমাণুটি বিবর্তিত হয়ে সৌরজগতের আকার ধারণ করে, তখন বিবর্তিত Cosmic String বা মহাজাগতিক তারের চওড়াটাকে মনে হবে একটি ভাইরাসের সমান মাত্র। এই মহাজাগতিক তারের আকৃতি কোথাও কুন্ডলীর মত, কোথাও আংটির ন্যায়, কোথাও সর্পিল, আবার কোথাও দেখতে কটিবন্ধের মত। মহাজাগতিক তারের পদার্থ ভর অকল্পনীয়, বিরাট-বিশাল, মাত্র কয়েক কিলোমিটার তারের ভর-ওজন সমগ্র পৃথিবীর ভরের চাইতে অনেক বেশি হবে। এই তারগুলো খুবই শক্তিশালী এবং এদের ঘনত্ব ব্ল্যাক হোলের (Black Hole) ঘনত্বের চাইতেও অনেক অনেক বেশি। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীরা জানান যে মহাজাগতিক তারের ঘনত্ব হলো 10^{21}gm/cc. (অর্থাৎ, 1 cu. cm. তারের ভর হলো ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০gms.)

'ব্রিটিশ এ্যাসট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশান' এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং 'লন্ডন মলিকুল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী 'কলিন রোনান' (Colin Ronan), টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিশ্ব বিষয়ক বিজ্ঞানী 'আলেক জান্ডার ভিলেনকীন' এবং 'টম বিকল' সহ আজকের বিজ্ঞান বিশ্বের অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীগণও বিশ্বাস করেন যে, মহাজাগতিক তার (Cosmic String) গুলিই সৃষ্টিতে প্রথম গ্যালাক্সীর বীজ বপণ করেছিলো। তাদের ধারণা মতে Big Bang Model এর Stable atoms period এ যখন

পূর্ণ পদার্থ সৃষ্টি হলো তখন Radiation পদার্থ থেকে পৃথক হয়ে পড়ায় পূর্বের সৃষ্ট ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা (Fog) দূরীভূত হতে থাকলো এবং পূর্ণ
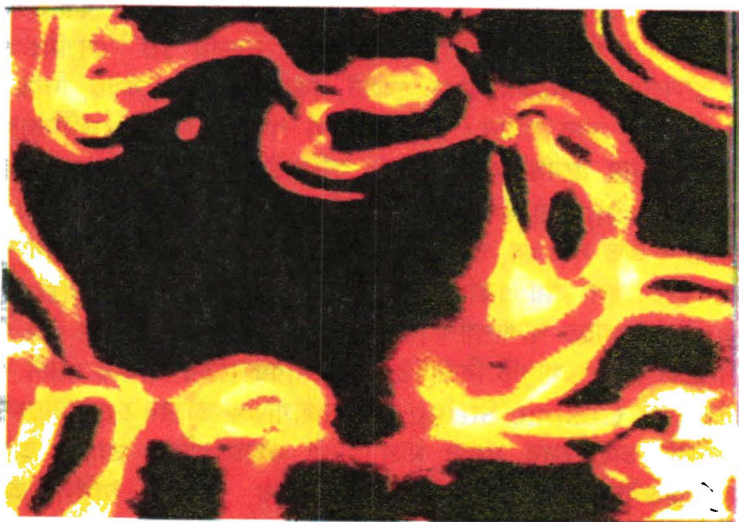
চিত্রঃ ৭৭
"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করেন"।
(২৭ : ২৫)
বিজ্ঞানীগণ Terrestrial Laboratory-তে Liquid crystal ব্যবহার করে মহাজাগতিক তার (Cosmic string)-এর Formation কিভাবে হয় তা Computer Simulation-এ প্রত্যক্ষ করেন। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে – 'A single infinitely long cosmic string could contain 10^{15} times the mass of the Sun, equivalent to the mass of 10,000 galaxies. সময়ের সাথে সাথে এদের (মহাজাগতিক তার) অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে অবশিষ্ট দুই একটি এখনও গ্যালাক্সীদের ভিতর থেকে Gravitational waves প্রেরণ করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

পদার্থের গ্যাসীয় ঘন মেঘ (Gas cloud) সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব পূর্ণ হতে লাগলো। এভাবে মহাবিশ্বটি পদার্থের গ্যাসীয় ঘন মেঘে পূর্ণ হয়ে গেলে এক পর্যায়ে আবির্ভূত হয় মহাজাগতিক তার (Cosmic String) এবং গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে তারগুলি ছড়িয়ে পড়ে। মহাজাগতিক তারগুলি কল্পনাতীত

প্রচন্ড মহাকর্ষবলের অধিকারী হওয়ায় পরবর্তীতে প্রত্যেকেই নিজের দিকে প্রবল মধ্যাকর্ষণ বলের মাধ্যমে মহাজাগতিক
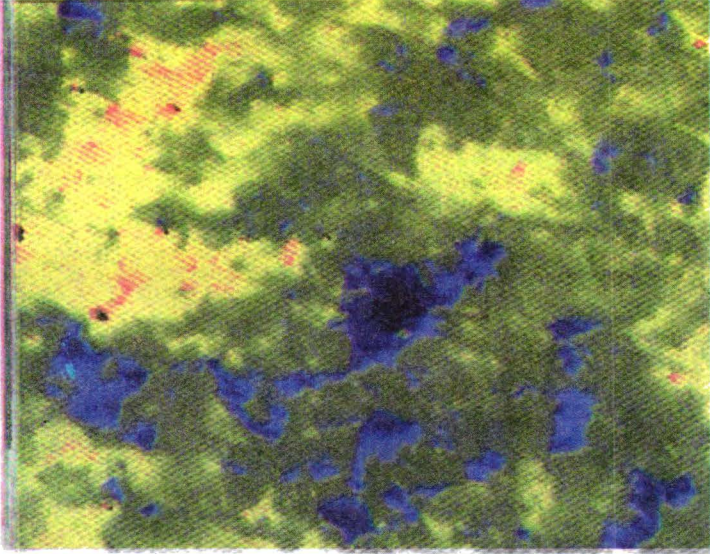
চিত্রঃ ৭৮

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহের খবর রাখে না"। (২৭ ঃ ৬৫)

Computer simulation-এ মহাজাগতিক তারের (Cosmic string) আগমন পরবর্তী সময়ে গুচ্ছাকৃত ধূলা-বালির মেঘপুঞ্জের তাপমাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে। নীলাভো রং অত্যধিক তাপমাত্রা এবং লাল রং একেবারে নিম্ন তাপমাত্রা প্রদর্শন করছে।

গ্যাস ও ধূলি-কণাকে আকর্ষণ করতে থাকে। এই আকর্ষণে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলি-কণাসমূহ প্রচন্ড গতিতে তারের দিকে ছুটে এসে জমতে থাকে চারপাশে। এভাবে জমতে জমতে এক পর্যায়ে মহাবিশ্বটি গুচ্ছ গুচ্ছ পদার্থের গ্যাসীয় মেঘখন্ডে রূপ নেয়। এরপর সময় যখন গড়িয়ে প্রায় দুই বিলিয়ন বছর পার হয়ে যায়, তখন মহাজাগতিক তার কর্তৃক বিভক্ত
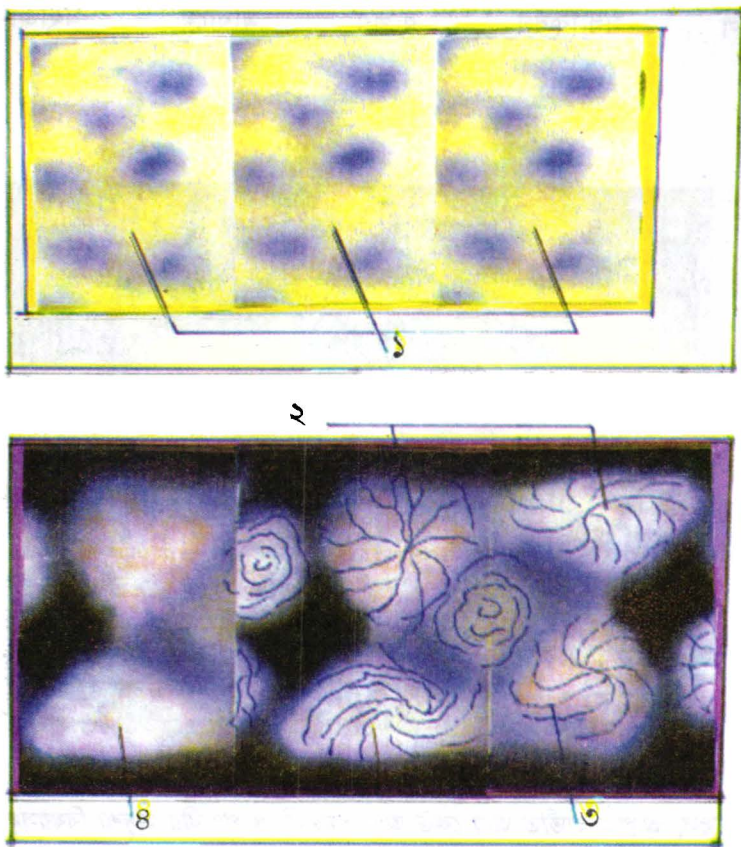
চিত্রঃ ৭৯

"এতদভিন্ন তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল 'ধূঁয়ায়' পরিপূর্ণ। অনন্তর তিনি তাকে (আকাশমন্ডলীকে) ও পৃথিবীকে বললেন, ' তোমরা উভয়েই আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়'। তারা বললো, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে'"। (৪১ ঃ ১১)

১. *পদার্থ এবং রেডিয়েশানের মিশ্রনে সৃষ্ট 'ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াশা' (Fog)।*

২. *মহাজাগতিক তার (Cosmic String)।*

৩. *গ্যাসীয় ঘন মেঘের ভিতর মহাজাগতিক তার।*

৪. *ধূলা-বালির বা অটল পরমাণুসমূহের গ্যাসীয় ঘনমেঘ।*

১

২
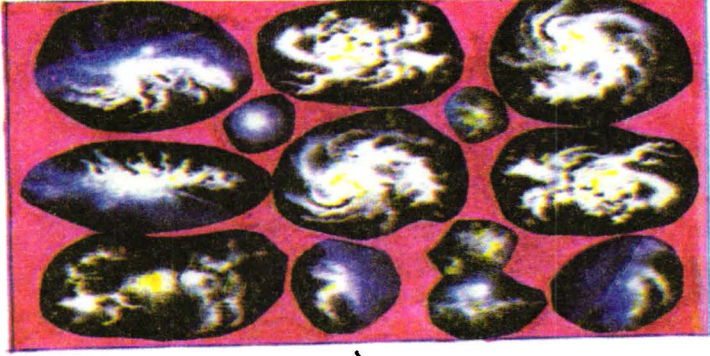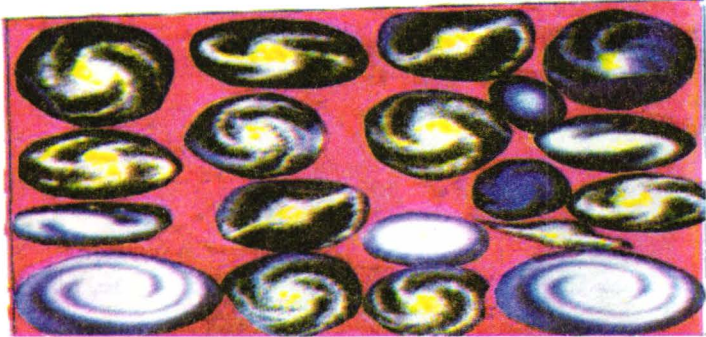
চিত্রঃ ৮০

"আল্লাহ্ উর্ধাদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন অবলম্বন (খুঁটি) ব্যতীত। তোমরা কি তা দেখছো না"? (৩১ ঃ ১০)

১. 'মহাজাগতিক তার ' গ্যাসীয় ঘনমেঘকে মহাকর্ষবলের মাধ্যমে নিজের সাথে জড়িয়ে নিয়ে নিজ কলেবর বৃদ্ধি করছে।

২. পরক্ষণে পদার্থের গ্যাসীয় ঘনমেঘ মহাজাগতিক নিয়মে আবর্তনগতি লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে পরবর্তীতে পূর্ণ গ্যালাক্সীর রূপ ধারণ করছে।

পদার্থের এই গ্যাসীয় মেঘখন্ডগুলি মধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে মহাবিশ্বে আবর্তন করতে শুরু করে। এই আবর্তন প্রক্রিয়ায় (Cosmic string) মহাজাগতিক তারগুলো চতুর্দিক থেকে আরো বেশি করে পদার্থের ধূলি-কণা ও গ্যাসীয় মেঘ আকর্ষণ করে নিজেদের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকে। এই পদ্ধতিতে সময় গড়িয়ে যখন প্রায় চার বিলিয়ন বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন
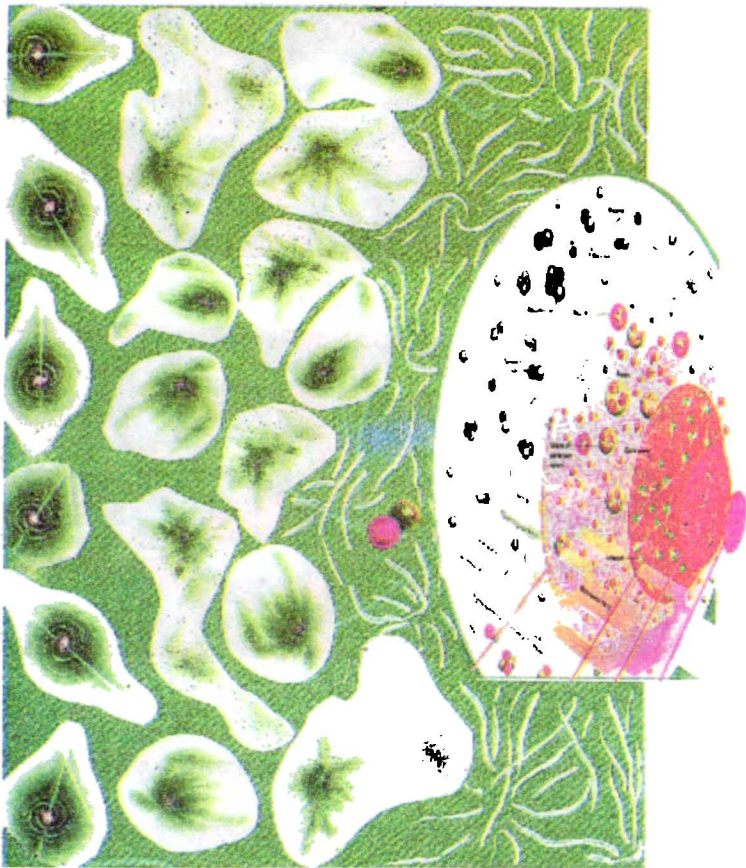
চিত্রঃ ৮১

"তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮) 'বিগ-ব্যাংগ' নামক মহাবিস্ফোরণের পরে এক পর্যায়ে (Stable atoms সৃষ্টি হওয়ার পর) আবির্ভূত 'মহাজাগতিক তার'গুলি-ই গ্যালাক্সীসমূহ সৃষ্টির বীজ মহাকাশে বপণ করেছিল। 'আল্-কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান' কত সুন্দর ভাবেই না সে তথ্য পেশ করেছে।

লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত এই গ্যাসীয় মেঘখন্ডগুলি প্রবল থেকে প্রবল বেগে আবর্তন সম্পন্ন করার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম গ্যালাক্সী, কোয়াসার, ক্লাস্টার, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদিতে পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রকাশ

করতে থাকে। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীদের গঠন এবং গ্যালাক্সী গুচ্ছ বা ক্লাস্‌টার যে মহাজাগতিক তারের অবদানে সৃষ্ট এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীমহলে আজ কোন মতবিরোধ নেই।

চিত্রঃ ৮২

"শপথ ঐ আকাশসমূহের (মহাবিশ্বের) যা মহাজাগতিক তারের (Cosmic string) অত্যন্ত দক্ষতার বুননে ধারণকৃত"। (৫১ ঃ ৭)

প্রতিটি গ্যালাক্সীর গঠনাকৃতির দিকে তাকালে এখনো মহাজাগতিক সূতা বা তারের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়, যা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। মহান স্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি এই গ্যালাক্সীজগত এক অন্যতম জ্ঞানময় নিদর্শন, যার তের দিয়ে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সামনে নিজকে প্রকাশিত করেছেন। সমাজের জ্ঞানবানরাই শুধু তাঁকে দেখতে পারেন তাঁর কাজের ভেতর দিয়ে নিজ সৌভাগ্যের কারণে।

কুরআনে প্রস্তাবিত প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন 'শপথের' আকারে অবতীর্ণ করেছেন। এটা সম্ভবত গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণেই হয়ে থাকবে। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো—বিজ্ঞান যদি সত্য-সত্যই

কোন সঠিক বিষয় উদঘাটনে সফলতা লাভ করে থাকে, তাহলে তা ঐ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বাণীকেই Highlight করবে বেশি, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

অধ্যায়ের সমাপ্তি রেখা টানার পূর্বে বিষয়টি 'এক নজরে' দেখে নেই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮) "তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫) "বল! আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান রাখে না।" (২৭ঃ৬৫)	(১) মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথায় কোন বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, কার কি কাজ বা কার কি পরিণতি তার সরাসরি কোন জ্ঞান পূর্ব থেকেই বিজ্ঞানের ছিল না। বিজ্ঞান তার চলার পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন যতটুকুন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে, কেবল ততটুকুনই বলতে পারে। এর বাইরে বিজ্ঞান পুরোপুরি অন্ধ। এমনকি কোন বস্তু কখন আবিষ্কার হবে তাও সে জানে না।
(২) "শপথ ঐ আকাশসমূহের, যা মহাজাগতিক তারের (Cosmic String) অত্যন্ত দক্ষতার বুননে ধারণকৃত।" (৫১ঃ৭)	(২) সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ 'Big Bang' নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের গোড়া পত্তন হয়ে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে যখন অটল পরমাণু (Stable atoms) সৃষ্টি হল তখন পদার্থের গ্যাসীয় মেঘ খন্ডের ভিতর এক প্রকার মহাজাগতিক তার

	(Cosmic String) নামে সূক্ষ্ম সূতার (Strand) বা তারের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে ঐ তারের মধ্যে প্রবল মধ্যাকর্ষণবলের প্রাদুর্ভাব হলে তারগুলি চতুর্দিকে পদার্থের গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে নেয়। ফলে মহাকাশ জুড়ে বিরাট বিরাট গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। পরে মধ্যাকর্ষণবলের প্রভাবে মেঘপুঞ্জ ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে আবর্তন (Motion) করতে থাকায় গ্যালাক্সী, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।
(৩) "আল্লাহ্ ঊর্ধ্বাদেশে আকাশ মন্ডলী স্থাপন করেছেন খুঁটি ব্যতীত। তোমরা কি তা দেখছো না"? (৩১ ঃ ১০)	(৩) মহাবিশ্বের বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র সবাই মহাকর্ষ বলের কারণে গতিশীল অবস্থায় (Motion-এ) মহাশূন্যের মাঝে পরিভ্রমনরত ভাসমান অবস্থায় ভারসাম্য সৃষ্টি করে টিকে আছে। ফলে কোথাও কোন অবলম্বন বা খুঁটির প্রয়োজন হচ্ছে না। মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনায় সবাই প্রয়োজনমত ব্যবস্থিত হয়ে আছে উক্ত পদ্ধতিতে।
(৪) "এই সমস্তই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে তা মিথ্যা।" (৩১ ঃ ৩০)	(৪)বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই বিজ্ঞান তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে লাভ করে মনে হয় যেন সঠিক যৌবনপ্রাপ্ত প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে নিত্য-নতুন আবিষ্কার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানীদের নিকট ধরা দিচ্ছে। আর তাতে সর্বত্র একই প্রশ্ন

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, আর মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ঃ৮১)	উত্থিত হচ্ছে–কে-সে, যিনি অদৃশ্য থেকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ নিদর্শন পেশ করে চলেছেন? কি তাঁর পরিচয়?

সুতরাং যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন বিজ্ঞান দিন দিন কুরআনের প্রতিচ্ছবি হয়ে, কুরআনের অনুকূলেই এক এক করে সব আবিষ্কার করে চলেছে। মনে হয় কুরআন যে 'সত্যগ্রন্থ' তা প্রমাণ করাই যেন তার একমাত্র কাজ হয়ে পড়েছে।

মহাকাশের গঠন ও স্তর বিন্যাস

আল্-কুরআনঃ

"অতিশয় উচ্চ মর্যাদাময় তিনিই, সেই মহান আল্লাহ্, যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন গ্যালাক্সীসমূহ, সূর্য এবং চন্দ্র"। (২৫ ঃ ৬১)

"আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দূর্গ সদৃশ্য গ্যালাক্সীসমূহ; তাকে আমরা সজ্জিত করেছি তাদের জন্য যারা প্রকৃত দর্শক"। (১৫ ঃ ১৬)

"শপথ আকাশ জগতের, যা 'দূর্গ'সমূহ দিয়ে সমুন্নত"। (৮৫ ঃ ১)

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপরে অসংখ্য 'স্তর' সৃষ্টি করেছি"। (২৭ ঃ ১৭)

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ঊর্ধে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য 'স্তর' বিশিষ্ট আসমান"। (৭৮ ঃ ১২)

"আকাশ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নেই এবং তা'হতে ক্ষুদ্রতম এবং তদাপেক্ষা বৃহত্তর কিছু নেই যা সুস্পষ্ট ও জ্ঞানময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই।" (১০ ঃ ১৬)

"তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮)

"তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করবে"। (৮৪ ঃ ১৯)

"আকাশসমূহ ও ভূ-মন্ডলের আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র"। (২ ঃ ১১৬)

"তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।" (২ ঃ ১৬১)

"(হে মানুষ) তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্মকে কেন স্বীকার করছো না"? (৭১ ঃ ১৩)

উল্লেখিত বাণীগুলোর ওপর চোখ বুলাতেই আপনার জ্ঞানরাজ্যে নিঃসন্দেহে আকাশমন্ডলের একটা কাল্পনিক ছবি উঁকি মারবে। বাণীগুলোর স্পষ্টতা, নিখুঁত বর্ণনা এবং সহজ-সরল গতিময়তার কারণেই এটা হওয়া স্বাভাবিক।

প্রথম পর্যায়ের আয়াতগুলোতে মহাকাশের গঠনপ্রণালী এমন বৈজ্ঞানিক পন্থায় অল্প কথায় তুলে ধরা হয়েছে যে, যখন মহাকাশ বা মহাবিশ্ব বলতে মানুষ রাতের বেলায় মাথার ওপরে দৃশ্য কয়েক হাজার তারকা সমৃদ্ধ উর্ধ্ব এই যৎসামান্য আকাশকেই বুঝতো। এর বাইরে কোন বস্তুর ধারণা ১৯২০ সালের পূর্বে মানুষ কল্পনায়ও আনতে পারেনি। খালিচোখে দেখা মহাকাশের এই ভগ্নাংশকেই মহাবিশ্ব ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঐ পরিবেশেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যার প্রতিটি বালু-কণা তাঁর অফুরন্ত মহাজ্ঞানের সীমানায় বর্তমান। মহাবিশ্বকে তিনি নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নেবুলা, মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ করে দূর্গের আকৃতি দিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে সংস্থাপন করেছেন। যে দূর্গগুলি একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিরাট-বিশাল স্থান জুড়ে সৃষ্টি হওয়া দূর্গসমূহ আকাশজগতে এক একটি বিরাট স্তর ছাড়া আর কি! যার মাত্র একটি স্তরের সীমানা অতিক্রম করার মত জ্ঞান এবং প্রযুক্তি এখনও মানুষ লাভ করতে পারেনি। মহাবিশ্বে এই স্তরগুলিই সবচেয়ে বড় সংগঠন। এদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের ভবিষ্যৎ ইংগিত ৮৪ঃ১৯ আয়াতটিতে আমরা পেয়ে যাই। আমাদেরকে অদৃশ্য এই দূর্গ সম্পর্কে তথ্য প্রদানের পর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, এমন এক সময় অতিবাহিত হবে, যখন আমরা (মানুষ সম্প্রদায়) জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ঐ অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারবো। মানুষের জ্ঞান একদিন মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠন গ্যালাক্সী বা মহাকাশীয় স্তর অথবা নক্ষত্র শহর (Star City) সমূহের বিষয়ে সত্য-সঠিক জ্ঞান লাভ করে ধন্য হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে নিজের 'পজিশন' বজায় রাখবে। এর পরের ১৬ঃ৮ আয়াতে তিনি আরো বলেছেন যে, শুধু গ্যালাক্সী কেন; বরং গ্যালাক্সী ছাড়াও মহাকাশে তিনি আরো বহু জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন–যেগুলি সর্বদাই আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে পড়ে আছে এবং আমরা সে সম্পর্কে মোটেই অবহিত নই, সে সম্পর্কে আমাদের

কোনই জ্ঞান নেই। তিনি আমাদেরকে দয়া করে অবহিত না করলে আমাদের কাছে চিরদিনই তা অদৃশ্য হয়ে থাকবে। যেমনিভাবে ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত গ্যালাক্সী, কোয়াসার, পালসার, ক্লাস্‌টার, নেবুলা ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের জ্ঞানের এবং সাথে সাথে দৃষ্টিরও আড়ালে পড়েছিল।

'মিঃ ইডুইন হাবল' তার টেলিস্কোপ দিয়ে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে বিরাট-বিশাল মহাকাশ দর্শন লাভ করার ব্যাপারে সফলতা লাভ করেন। ফলে দৃশ্য তারাময় আকাশকে ডিঙ্গিয়ে গভীর মহাবিশ্বে টেলিস্কোপের দৃষ্টিকে প্রবেশ করিয়ে লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নেবুলা, পালসার, ক্লাস্‌টার, সুপারনোভা, ইত্যাদি সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে নিকটবর্তী গ্যালাক্সীসমূহে অবস্থানকারী লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্রের জীবন প্রবাহের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

তারপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌পাক দাবী করেন যে–আকাশ জগত ও পৃথিবীতে সবই তাঁর সৃষ্টি এবং এদের উপর আধিপত্য সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। অতএব, আনুগত্য, গোলামী, উপাসনা শুধুমাত্র তাঁরই হওয়া উচিৎ। আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো গোলামী করার ইখতিয়ার মানুষের নেই। যেহেতু সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক তিনিই।

মহাবিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে যে গ্যালাক্সী গঠিত সেই গ্যালাক্সীর আশ্চর্য সৃষ্টিকৌশল, মহাশূন্যে বিরাট বিরাট এক একটা মহাকাশীয় স্তর সৃষ্টি করে অবস্থান (আলোর গতিতে ভ্রমণ করলেও এক একটা স্তর অতিক্রম করতে কয়েক লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে), খুঁটিবিহীন শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে চলমান, তাদের জীবনপ্রবাহ্‌ সবই যে মহাজ্ঞানী প্রচন্ড শক্তি ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে, তা-কি মানুষ দেখতে ও বুঝতে পারছে না? সব কিছু দেখে-শুনেও যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে তাহলেতো বলতে হবে "তারা এমন জাতি যাদের বোধ শক্তি নাই" (৮ঃ৬৫)। এই হচ্ছে উল্লেখিত বাণীসমূহের মোটামুটি মর্মকথা।

বিজ্ঞানঃ

মহাবিশ্বের যে সমস্ত তথ্য মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে ছিল এবং পরবর্তীতে মানুষ তাকে আয়ত্ব করেছে, তাদের সম্পর্কে মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলতে গেলে অতি বিস্ময়করভাবে ঘটেছে। যেমন ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় 'দ্বীপজগৎ' বা 'গ্যালাক্সীর' (Star city) আবিষ্কার।

চিত্রঃ ৮৩

"অতিশয় উচ্চ মর্যাদাময় তিনিই সেই মহান আল্লাহ্, যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ) এবং সূর্য ও চন্দ্র।" (২৫ঃ৬১)
মহাকাশে সৃষ্ট গ্যালাক্সি এক একটি বিরাট স্তর সমতুল্য যা মহান স্রষ্টার মহান কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ সবচেয়ে পুরাতন বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতি-র্বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী ছিল বেশি। তখন থেকেই প্রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত মহাবিশ্ব বলতে মানুষ দৃশ্য আকাশকেই বুঝতো। আকাশের বড় সংগঠন বলতে মানুষ দৃশ্যমান নক্ষত্রসমূহকেই চিহ্নিত করতো। শুধু নক্ষত্র নিয়েই

তৎকালীন মানবসম্প্রদায় নানা কাহিনী রচনা করতো। যার ফলশ্রুতিতে রাশিচক্র ব্যাপকভাবে সমাজে আসন গেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছে।
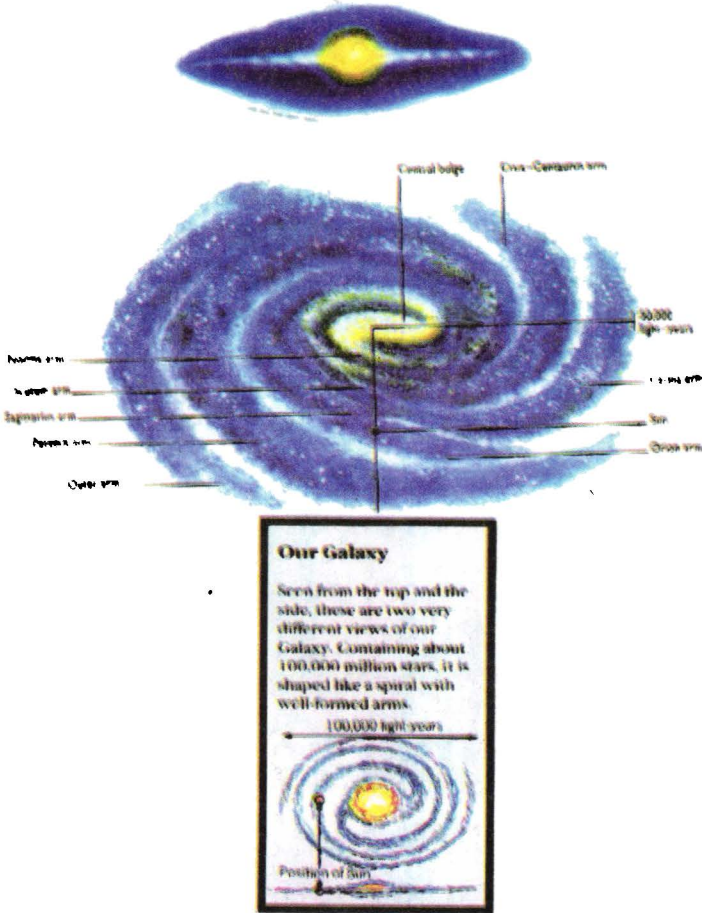
চিত্রঃ ৮৪

"আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দুর্গ সদৃশ্য গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ), তাকে আমরা সজ্জিত করেছি তাদের জন্য যারা প্রকৃত দর্শক"। (১৫ ঃ ১৬)

এ অবস্থায় দিন যেতে থাকলো, ১৯২০ সালে কোন এক শুভদিনে মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানী 'ইডুইন হাবল্' আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই হতচকিত হয়ে যান। আকাশ জগত যেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মহাকাশের আসল রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হন।

আকাশের যে দিকেই টেলিস্কোপ ঘুরান সেই দিকেই নতুন এক জগতের চিত্র দেখে তার শরীরে শিহরণ জাগতে থাকে। কল্পনাহীন এক নতুন মহাবিশ্ব আবিষ্কারের আনন্দে, আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন এবং ঘোষণা করেন–'মানুষ এতদিন পর্যন্ত দৃশ্য আকাশের যে অংশকে মহাবিশ্ব মনে করেছে, তা আসলেই কিন্তু একটা গ্যালাক্সীর ভগ্নাংশ মাত্র, মহাবিশ্ব নয়। যে গ্যালাক্সীর ভগ্নাংশ এই দৃশ্যমান আকাশ সেই গ্যালাক্সীতে প্রায় ২০,০০০ কোটির ওপরে নক্ষত্র অবস্থান করছে। আমাদের সূর্যটি উক্ত গ্যালাক্সীতে খুবই নগণ্য ধরনের একটি নক্ষত্র। যার চেয়ে শতগুণ বড় বিরাট-বিরাট নক্ষত্র শত-সহস্র হিসাবে গ্যালাক্সীতে বাস করছে'। আমাদের এই গ্যালাক্সীটি (Milky Way) প্রায় এক লক্ষ (১,০০,০০০) আলোকবর্ষ বিস্তৃতি নিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে।
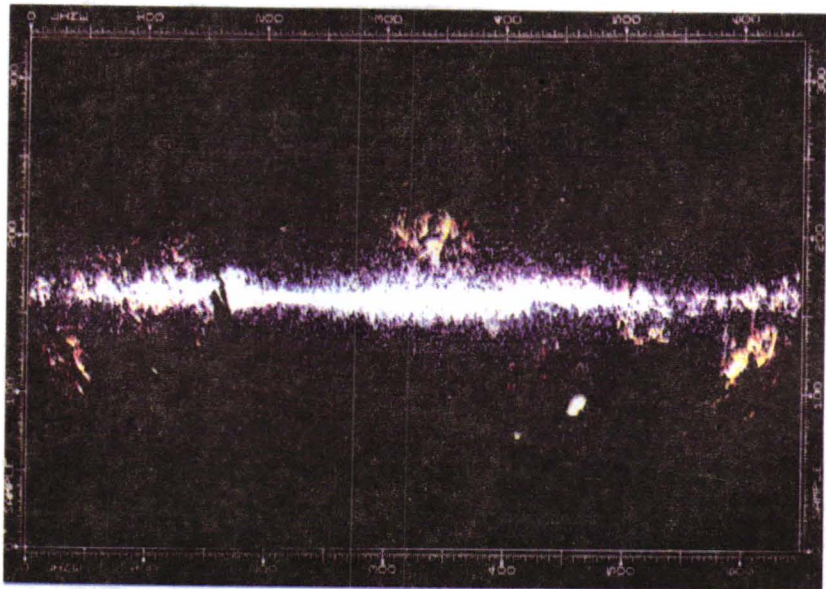
চিত্রঃ ৮৫

আমাদের মাতৃ গ্যালাক্সী 'Milky way' তে প্রায় ২০ হাজার কোটি নক্ষত্র বর্তমান আছে।

অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগের কোন যানে চড়ে যদি আমরা ভ্রমণ করতে সমর্থ হই, তাহলে ঐ যানে করে আমাদের গ্যালাক্সীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে আমাদের সময় ব্যয় হবে প্রায় এক লক্ষ বছরের ওপর। এত বিরাট তার আয়তন, কল্পনা করতেও জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যদিও মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত ১০০ কোটি অনুরূপ গ্যালাক্সীর মধ্যে আমাদের এই 'Milky way' গ্যালাক্সী একটা সাদা-মাটা তুচ্ছ প্রকৃতির গ্যালাক্সী। 'ইডুইন হাবেল' আরো প্রকাশ করেন যে, গ্যালাক্সীরা মহা গুচ্ছ গুচ্ছভাবে অবস্থান করে–যাকে গুচ্ছ-গ্যালাক্সী বা 'ক্লাসটার' (Cluster)
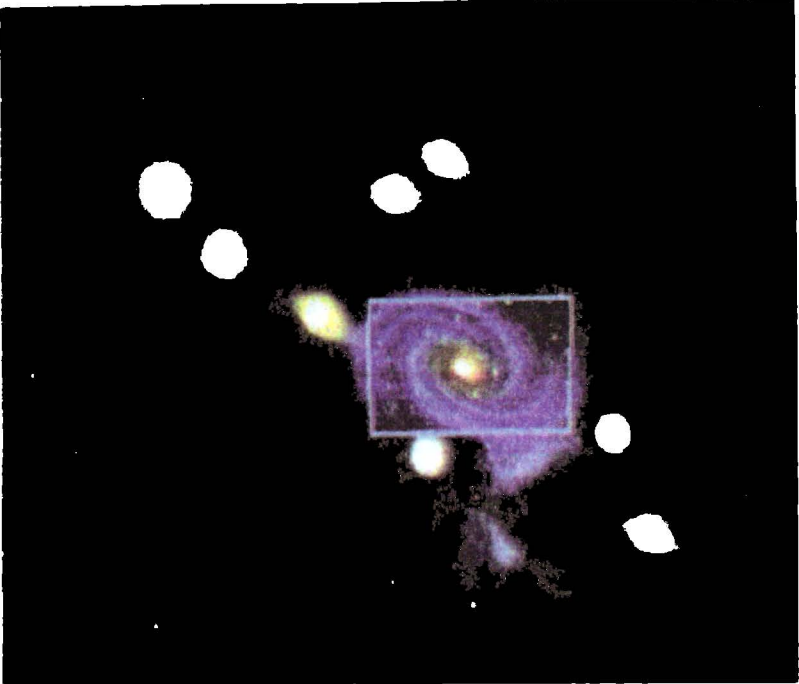
চিত্রঃ ৮৬

"শপথ আকাশজগতের, যা গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ) দিয়ে সমুন্নত"। (৮৫ ঃ ১) আমাদের লোকাল গ্রুপে প্রায় ৩২টির অধিক গ্যালাক্সীর মধ্যে 'মিল্‌কি-ওয়ে' একটি, যা ছবিতে মাঝখানে বক্স আকারে দেখানো হয়েছে। 'মিল্‌কি-ওয়ে'র সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্যালাক্সীটির নাম হচ্ছে 'এন্ড্রোমিডা'।

চিত্রঃ ৮৭
"নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য 'স্তর' সৃষ্টি করেছি"। (২৭ ঃ ১৭)

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী গ্যালাক্সী 'এন্ড্রোমিডা' যার বিস্তৃতি মহাশূন্যে প্রায় দেড় লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী। এর মাঝে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার কোটির মত। উক্ত গ্যালাক্সীটি আমাদের 'মিল্কি-ওয়ে' গ্যালাক্সী থেকে প্রায় ২.২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আছে। পূর্বে এই গ্যালাক্সীটিকে পৃথিবী থেকে এক খন্ড মেঘ মনে করা হতো কিন্তু টেলিস্কোপ আবিষ্কারের কারণে বর্তমানে সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

বলা হয়। আবার মাঝে মাঝে কয়েকটি থেকে কয়েকশত সহস্র গুচ্ছ-গ্যালাক্সী নতুন করে গুচ্ছাকৃতি ধারণ করে 'Super Cluster' নামে পরিচিত হয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সীর লোকাল গ্রুপে মোট প্রায় ছোট-বড়

৩২টি গ্যালাক্সী এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সীর
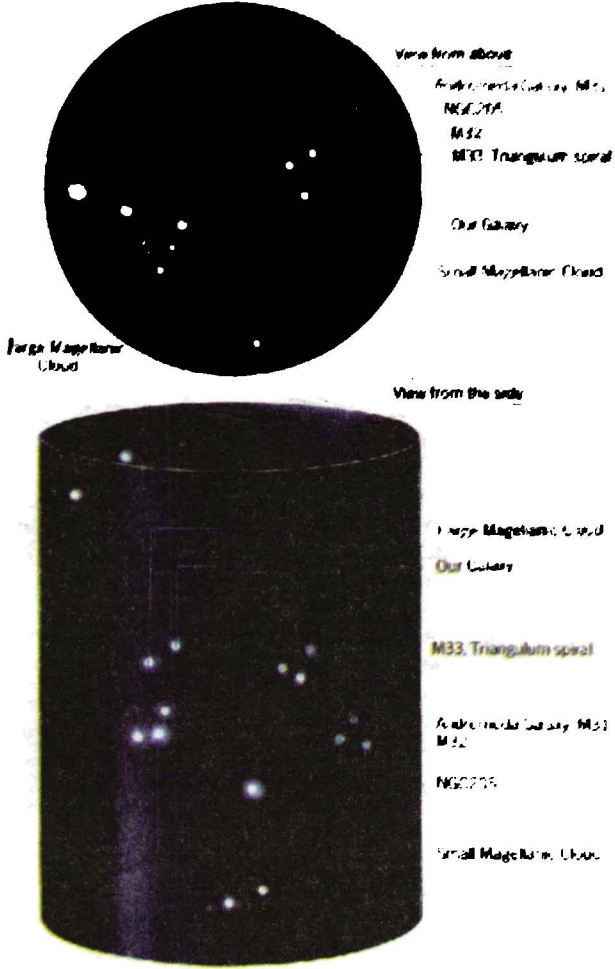
চিত্রঃ ৮৮

লোকাল গ্রুপে গ্যালাক্সীসমূহ

নিকটতম প্রতিবেশী গ্যালাক্সীটির নাম 'এন্ড্রোমিডা' (Andromeda) যা আকারে আমাদের গ্যালাক্সীটির প্রায় দেড় গুণ বড়। তাতে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র বাস করছে। এভাবে প্রতিটি গ্যালাক্সী কোটি কোটি নক্ষত্র

ধারণ করে বিশাল বিশাল মহাকাশীয় 'দূর্গ' বা 'স্তর' মহাকাশে সৃষ্টি করে রেখেছে। একটি গ্যালাক্সী থেকে আবার অপর গ্যালাক্সী প্রায় লক্ষ-লক্ষ আলোক বছর বিস্তৃত শূন্যতার দূরত্ব বজায় রাখছে। প্রতিটি গ্যালাক্সীই তার
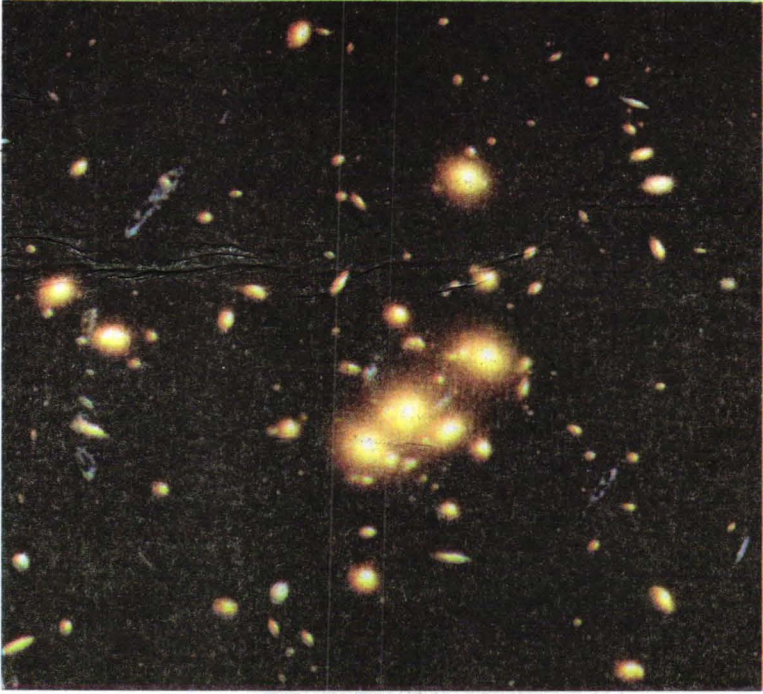
চিত্রঃ ৮৯
"তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮)
"তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করবে"। (৮৪ ঃ ১৯)
একাধিক Galaxy Cluster, যা Super Cluster হিসেবে (নামকরণে) পরিচিত। অনুরূপ শত শত কোটি গ্যালাক্সী সৃষ্টি হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা ও গুনকীর্তন গেয়ে চলেছে আকাশজগতে।

গোটা কাঠামোসহ মহাশূন্যে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে আবর্তন করছে। কেউ কোথাও স্থির নেই, সবাই চলমান নিজ নিজ গন্তব্যের পথে নিজ-নিজ হিসেবে। এদের গঠনাকৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং এই জন্য সম্ভবত মহাজাগতিক তারই (Cosmic String) দায়ী। আমরা

পূর্বের অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি Cosmic string গুলো মহাকাশে গ্যালাক্সীর বীজ বপন করে পরবর্তীতে তাদের পূর্ণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

গঠনাকৃতি হিসাবে গ্যালাক্সীসমূহ বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমনঃ 'স্পাইরেল গ্যালাক্সি' (Spiral Galaxy, M81), 'বারেড স্পাইরেল গ্যালাক্সী' (Barred Spiral Galaxy, NGC-1365), 'ইরেগুলার গ্যালাক্সী' (Irregular Galaxy– SMC), এবং 'ইলেপ্‌টিক্যাল গ্যালাক্সী' (Elliptical Galaxy, M32)।
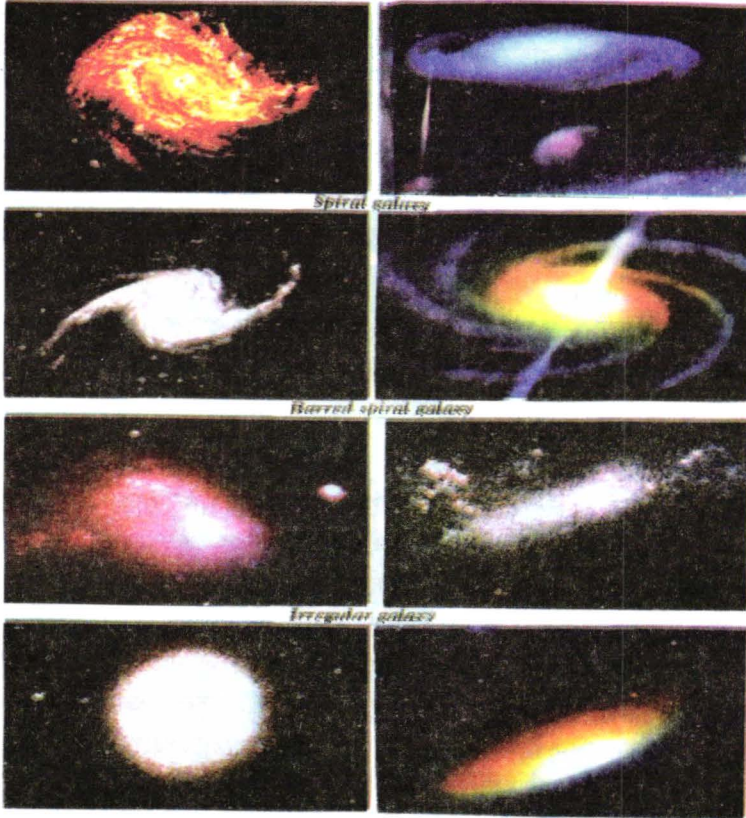
চিত্রঃ ৯০

"(হে মানুষ !), তোমাদের কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য স্বীকার করছো না"? (২ ঃ ১৬১)

ছবিতে প্রধানতঃ চার প্রকারের গ্যালাক্সী প্রদর্শন করা হয়েছে।

যে গ্যালাক্সীগুলো 'কেন্দ্রীয় চক্র নাভী' (Central hub) এবং পেঁচানো বাহু সম্পন্ন, ঐ জাতীয় গ্যালাক্সীগুলোকে Spiral galaxy বলা হয়। এদের পেঁচানো বাহুগুলোতে নক্ষত্রসমূহ গাছের ঝাড়ের মত এবং হালকাভাবে অবস্থান করে।

যে গ্যালাক্সীগুলোতে দীর্ঘ কেন্দ্রীয় এলাকা (Elongated central region) এবং পেঁচানো বাহুগুলো খুব লম্বা আকারের যা মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র দিয়ে তৈরী এবং পুরো গ্যালাক্সী একটা পূর্ণ কাঠামো হিসাবে মহাশূন্যে আবর্তন করে, ঐ জাতীয় গ্যালাক্সীগুলো 'Barred Spiral Galaxy' হিসাবে পরিচিত।

আবার যে গ্যালাক্সীগুলো নির্দিষ্ট কোন আকৃতি ছাড়াই একটা বিশৃংখল কাঠামো নিয়ে মহাশূন্যে বিরাজ করছে এবং তাদের আওতাভুক্ত নক্ষত্রগুলোও জন্ম নিয়ে এলোমেলোভাবে অবস্থান গ্রহণ করছে, ঐ গ্যালাক্সীগুলোকে 'Irregular Galaxy' নাম দেয়া হয়েছে।

'ইলিপ্‌টিক্যাল গ্যালাক্সীগুলো (Elliptical Galaxy) সাধারণতঃ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি হয়ে থাকে। এদের ভিতরে অবস্থানকারী নক্ষত্রসমূহ কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করতে থাকে এবং আকারেও নক্ষত্রসমূহ বেশ বড় হয়ে থাকে।

প্রতিটি গ্যালাক্সী তার নিজস্ব গঠনাকৃতি, আবর্তন, আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ, নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি এবং তাদের ধ্বংস ইত্যাদি কাজে স্বাধীন তবে মহাকর্ষবলের (Gravitation) বাঁধনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আবার তাদের নিজস্ব শাসনে নক্ষত্রসমূহ পরিচালিত। প্রতিটি গ্যালাক্সী প্রতি মুহূর্তে একে অপরের নিকট থেকে দ্রুতবেগে দূরে সরে যাচ্ছে—মহাসম্প্রসারণের নেশায়। গ্যালাক্সীর প্রান্তভাগের তুলনায় কেন্দ্রের দিকে নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই বেশি। প্রতিনিয়ত গ্যালাক্সীর ভেতর যেমন নতুন নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়া নক্ষত্রগুলো ধ্বংসের করালগ্রাসে পতিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীতেই রয়েছে নক্ষত্র, মহাজাগতিক গ্যাস, ধূলিকণা মিশ্রিত নেবুলা, ব্লাক-হোল, পালসার, সুপার নোভা গ্যাসপুঞ্জ ইত্যাদি।

মহাবিশ্বের মাঝে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য যে বিরাট-বিশাল বস্তুনির্ভর গ্যালাক্সী বা মহাকাশীয় স্তর সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অগ্রজে

অবস্থান করে কুরআন যে বিজ্ঞানময় তথ্য ভূ-পৃষ্ঠের মানবমন্ডলীর জ্ঞান রাজ্যের সামনে মেলে ধরেছিল, আজকের বিজ্ঞানের হীরণময় কিরণে উদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীর গোধূলীলগ্নে অগ্রসরমান বিজ্ঞানের প্রমাণিত একই বিষয়ের তথ্যের মাঝে কোন ভিন্নতা বা কোন ব্যবধান অথবা কোন পার্থক্য নজরে পড়ে কি?

এবার পুরো বিষয়টি "এক নজরে" দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "অতিশয় উচ্চ মর্যাদাময় তিনিই, সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ), সূর্য এবং চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১) "আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দূর্গ সদৃশ্য গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ); তাকে আমরা সজ্জিত করেছি তাদের জন্য যারা প্রকৃত দর্শক"। (১৫ ঃ ১৬) "শপথ আকাশজগতের যা গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ) দিয়ে সমুন্নত"। (৮৫ ঃ ১)	(১) 'পৃথিবী, নামক এই বিশ্ব থেকে মানবমন্ডলীর মধ্য হতে সর্ব প্রথম আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী "ইডুইন হাবেল পাওয়েল" ১৯২০ সালে মহাকাশের রহস্যের ওপর থেকে পর্দা সরাতে সক্ষম হন। তিনি গ্রাউন্ড বেইছ টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে প্রথম বারের মত Star City বা Galaxy-র সংবাদ পরিবেশন করেন। মানবসম্প্রদায় মাথার ওপর তারকা খচিত মাতৃ গ্যালাক্সীর ভগ্নাংশ দর্শন করে মহাবিশ্ব ভেবে যে স্বপ্ন দেখতো তার রীতিমত অবসান ঘটল। 'মিঃ হাবেল' অতঃপর ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ সময় ধরে মহাকাশে গ্যালাক্সীসমূহের ওপর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গ্যালাক্সীদের গঠন, গতি, প্রকৃতি, সম্প্রসারণ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য 'স্তর' বিশিষ্ট আকাশ"। (৭৮ ঃ ১২) "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য 'স্তর' সৃষ্টি করেছি"। (২৭ঃ ১৭)	ইত্যাদির ওপর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করতে সমর্থ হন। গড়ে একটি গ্যালাক্সীতে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র অবস্থান করে থাকে, একটি গ্যালাক্সী গড়ে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী স্থান জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি গ্যালাক্সী থেকে আরেকটি গ্যালাক্সী গড়ে প্রায় ২.২ মিঃ লাইট ইয়ার দূরত্ব বজায় রাখে। গ্যালাক্সীসমূহ মহাকাশে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী অসংখ্য 'স্তর'-এর মত অবস্থা সৃষ্টি করে অবস্থান করছে। সৃষ্টিক্ষণ থেকে গ্যালাক্সীসমূহ সার্বিকভাবেই মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত রয়েছে।
(২) "তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)	(২) বর্তমান বিজ্ঞানের অবদানে পৃথিবী পৃষ্ঠে মানবসম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগ ও শাখায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে উন্নতির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে চলেছে।
(৩) "তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা অবগত নও।" (১৬ঃ৮)	(৩) বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ মহাকাশের

	অজানা, অচেনা, অদৃশ্য হাজারো জ্যোতিষ্ক, যেমন–গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নেবুলা, পালসার, ব্ল্যাক-হোল, ইত্যাদি একের পর এক আবিষ্কৃত করে চলেছে। বিজ্ঞান বিশ্বাস পোষণ করছে এভাবে আরো হাজারো মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক আমাদের জ্ঞানের বাইরে অদৃশ্য অবস্থায় পড়ে আছে। হয়তোবা অচিরেই তারা মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সামনে নিজেদেরকে প্রকাশিত করে মানবজাতিকে ধন্য করবে।
(৪) "ওহে মানুষ ! তোমাদের কি হলো! তোমরা আল্লাহ্‌র মাহাত্মকে কেন স্বীকার করছোনা?" "আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র।" (২ ঃ ১১৬) "তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।" (২ ঃ ২৬১)	(৪) বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান সরাসরি 'আল্লাহ্‌কে' স্বীকার না করলেও মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের পিছনে বুদ্ধিদীপ্ত কোন উৎসের নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী শৃংখলাবদ্ধ কার্যক্রমকে অস্বীকার করে না। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যেভাবে শৃংখলা, ক্রম, নিয়ম-নীতি এবং উদ্দেশ্য কাজ করছে তাতে বিজ্ঞান বিশ্বাস করে মহাবিশ্বটি বিশৃংখল বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি হয়নি, এবং পরিসমাপ্তিও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে হবে না। সেজন্য বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আইনস্টাইন' ঘোষণা করেছেন যে,

	'The Science without religion is lame and the religion without science is blind'. 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া, আর বিজ্ঞানহীন ধর্ম–অন্ধ।'

সুতরাং এ মহাবিশ্বে 'আকাশের সংগঠন ও স্তরবিন্যাস' সম্পর্কে ১৪০০ বৎসর পূর্বে ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনে' বর্ণিত 'বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ' এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সর্বশেষ রিপোর্ট 'এক ও অভিন্ন'।

অতএব "তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ঃ৭৩)

এবং "আল্-কুরআন মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ"। (৩৬ঃ২)

মহাবিশ্বের 'মহাসম্প্রসারণ'

আল্-কুরআনঃ

"আল্-কুরআন মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ"। (৩৬ঃ২)

"এটা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে"। (৩৯ঃ১)

"নিশ্চয়ই তোমাকে আল্-কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের পক্ষ হতে" (২৭ঃ৬)

"তাঁর হস্তেই সকল বস্তুর কর্তৃত্ব" (৩৬ঃ৮৩)

"আমি আকাশমন্ডলীকে (মহাবিশ্বকে) সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে, নিশ্চয়ই আমি তাকে সম্প্রসারণ করছি।" (৫১ঃ৪৭)

"তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত"। (৬ঃ১০২)

"তাঁর মহাবাণীই সত্য"। (৬ঃ৭৩)

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করছো না?" (৭১ঃ১৩)

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও আসবেনা তার পিতার কল্যাণে"। (৩১ঃ৩৩)

"এসব হচ্ছে উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক"। (৭৬ঃ২৯)

"মূলতঃ গোলামদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে"। (৩৫ঃ২৮)

উল্লেখিত ৩৬ঃ২ ও, ৩৯ঃ১ এবং ২৭ঃ৬ পবিত্র বাণীগুলোতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অবহিত করছেন যে, তিনি শক্তির দিক থেকে 'প্রচন্ড শক্তিশালী' এবং জ্ঞানের দিক থেকে 'মহাজ্ঞানী'–যার কোন তুলনাই নেই

এবং যার মাত্রা বুঝার জ্ঞানও আমাদের নেই। তুলনাহীন সেই অচিন্তনীয় শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এতে কোনই সন্দেহ নেই। মহাজ্ঞানীর নিকট থেকে যে গ্রন্থ আগমন করেছে–তার প্রতিটি পৃষ্ঠাই যে বিজ্ঞানময় হয়ে সৃষ্টিকর্তার মহাজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি বা আছে! এর প্রতেকটি বাণী সত্যের সাক্ষ্য হয়ে বিশ্বজোড়া প্রতিভাত হবে এটাই স্বাভাবিক। মানবসমাজে যাদের জ্ঞান আছে এবং যারা সত্য ও জ্ঞানের সাথে মিথ্যা ও অজ্ঞানতার পার্থক্য নির্ণয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন – কেবল তারাই যে অগণিত পুরষ্কারের বিনিময়ে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে ধন্য হবে তা ব্যাখ্যা না করলেও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

৩৬ঃ৮৩ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত প্রচন্ড শক্তি এবং মহাজ্ঞানের কারণে মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল পদার্থ ও বস্তুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে পূর্ণ কর্তৃত্ব (Command) তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে তিনি ধারণ করে আছেন। এই কর্তৃত্ব ছাড়া মহাবিশ্বে তাঁর প্রভূত্ব শোভা পায়না এবং টিকেও থাকতে পারে না। 'পরমুখাপেক্ষীতা' Absolute power এবং 'Absolute sovereinty'-র বিপরীত অবস্থান–যা সৃষ্টিকর্তার যোগ্যতা বহন করে না। তাই সমগ্র মহাবিশ্বের 'সুপ্রীম অথরিটি' হিসাবে একমাত্র তাঁর হাতেই সার্বিক কর্তৃত্ব বিরাজমান। আর তার সূত্র ধরেই ৫১ঃ৪৭ আয়াতে ঘোষণা করেছেন তিনি তাঁর অপরিমেয় ভাষায়, বর্ণনার অতীত মহাশক্তি, জ্ঞান ও কর্তৃত্ব বলে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে একে প্রতি নিয়তই মহাসম্প্রসারণে অব্যাহত রেখেছেন। এ সম্প্রসারণ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ওপরই সমভাবে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে–যা কেবল সৃষ্টিকর্তার মাহাত্মই প্রকাশ করে অগ্রসর হচ্ছে।

তারপরের আয়াতসমূহে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন–'তাঁর বাণী অবশ্য অবশ্যই সত্য এতে সামান্যতমও কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। তোমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানে যদি তা প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে তোমাদের আপত্তি কোথায়?

বিজ্ঞানঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বর্ণালীবীক্ষন যন্ত্র (Spectroscopy) ও আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ (Telescope) বিজ্ঞানজগতের পূর্বের মহাকাশ সম্পর্কিত কাল্পনিক অনেক বিষয়কে হটিয়ে দিয়ে প্রকৃত বিষয়ের বিস্ময়কর

দিগন্ত উন্মোচিত করে এবং লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তুকে বিজ্ঞানীগণের অদ্ভুত দর্শন সীমায় আনতে সমর্থ হয়। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম 'ইডুইন হাবেল পাওয়েল' টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের আসল রূপ প্রকাশ করেন। প্রথমবারের মত মানুষ জানতে সক্ষম হলো যে খালিচোখে মাথার উপরে দেখা আকাশ মহাবিশ্ব নয়; বরং আমাদের গ্যালাক্সি – Milky Way-র একটা ভগ্নাংশ মাত্র, যে Milky Way-তে প্রায় ২০,০০০ কোটিরও বেশি নক্ষত্র (সূর্য) বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সী–'এন্ড্রোমিডা'তে নক্ষত্রের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩০,০০০ কোটির মত। এভাবে প্রত্যেকটি গ্যালাক্সী হাজার হাজার কোটি নক্ষত্রের
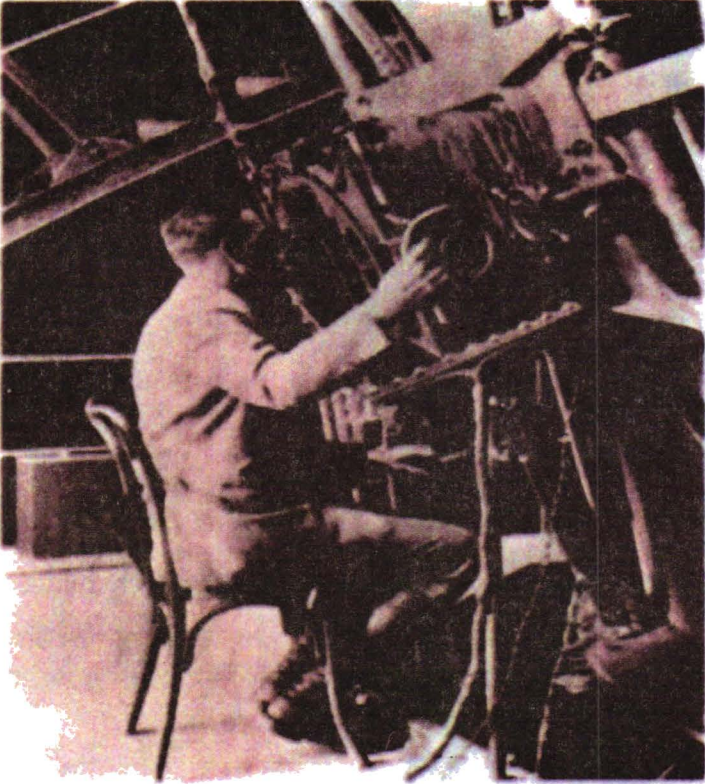
চিত্রঃ ৯১

"আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দূর্গ সদৃশ গ্যালাক্সীসমূহ, তাকে আমরা সজ্জিত করেছি তাদের জন্য যারা প্রকৃত দর্শক। (১৫ ঃ ১৬)

মহাকাশ পর্যবেক্ষণেরত আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল'।

সমষ্টিতে সৃষ্টি। আবার মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর সংখ্যাও হচ্ছে লক্ষ-কোটি। এ পর্যন্ত ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত বৃত্তের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান বিজ্ঞানীগণ লাভ করেছেন। এ সকল বাস্তব তথ্য
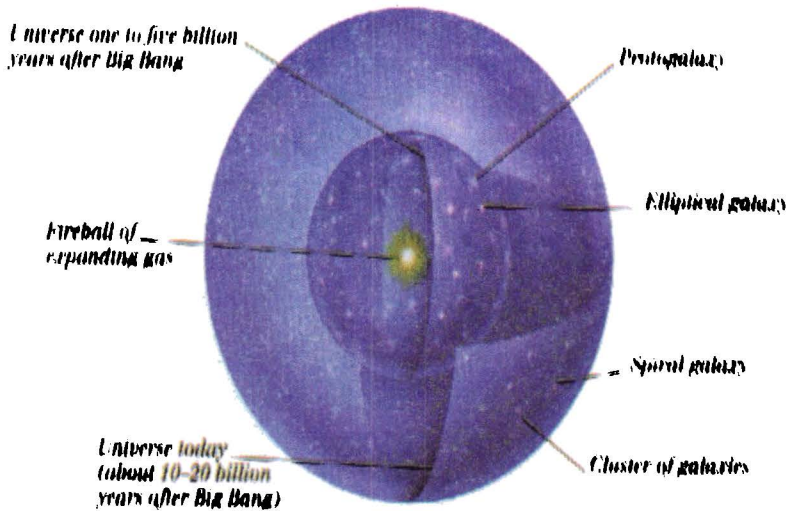
ORIGIN AND EXPANSION OF THE UNIVERSE

চিত্রঃ ৯২

"তাঁর হস্তেই সকল বস্তুর কর্তৃত্ব"। (৩৬ ঃ ৮৩)

'বিগ-ব্যাংগ' বিন্দু থেকে সৃষ্ট মহাবিশ্ব মহাসম্প্রসারণের এক অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় বর্ধিত হয়ে প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর পরে আজকের দিন পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, সেই সম্প্রসারণ এখনও অব্যাহত আছে।

আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানবমনে হাজারো নতুন নতুন প্রশ্ন পরবর্তীতে সৃষ্টি হতে থাকে গ্যালাক্সীদের আকার-আকৃতি, গতি, দূরত্ব, পরস্পরের ব্যবধান, চূড়ান্ত পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে।

এই উদ্দেশ্যে 'ইডুইন হাবেল' ১৯২৩ সাল হতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সমুদয় গ্যালাক্সীসমূহের শ্রেণীবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করেন। স্পেকট্রোসকপির (Spectroscopy) সাহায্যে ১৯২৯ সালে তিনি নির্দিষ্ট

কয়েকটি গ্যালাক্সীর 'রেড ও ব্লু -শিফ্‌ট' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেক দূরবর্তী গ্যালাক্সী অপ্রত্যাশিতভাবে 'রেড শিফ্‌ট' প্রদর্শন করে যাচ্ছে যার অর্থ হলো গ্যালাক্সীদের দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে সরে যাওয়া। তিনি আরো দেখতে পেলেন এই দূরে সরে যাওয়ার প্রকৃতি সকল দিকে সমভাবে সামঞ্জস্যশীল। দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ অধিকতর দ্রুতগতিতে অসীমের পানে উড়ে চলেছে। তাদের এই দ্রুতি ও গতির ওপর মিঃ হাবেল একটি তত্ত্ব পেশ করলেন, যা 'হাবেলের আইন' (Hubble's law) নামে পরিচিত। এই আইনটি হলো গ্যালাক্সীগুলো যতই দূরে সরে যাচ্ছে ততই তাদের গতিও বেড়ে যাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর থেকে তা একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে চলে। বিজ্ঞানের ভাষায় এর $V=\frac{D}{T}$ নাম হলো 'হাবেল ধ্রুবক' (Hubbles Constant, H_0), মিঃ হাবেল এই সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর প্রতি সেকেন্ড গ্যালাক্সীসমূহের গতিবেগ ৫০ মাইল (প্রায়)
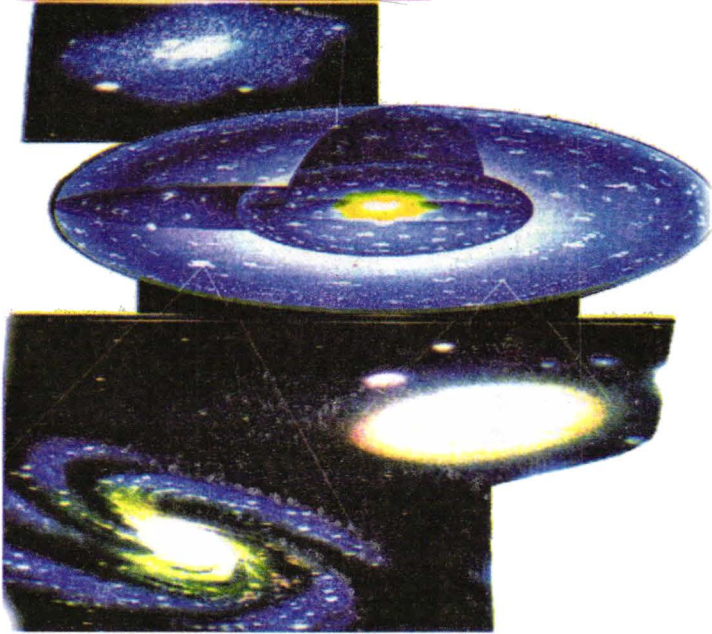
চিত্রঃ ৯৩

মূল মহাবিশ্বের ছবির এক একটি বিন্দু–এক একটি বিরাট গ্যালাক্সী কিংবা গ্যালাক্সী গুচ্ছ। আবার এক একটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটির মত নক্ষত্র (সূর্য) বিদ্যমান আছে। এ যেন মহান সৃষ্টিকর্তার মহাকীর্তির মহাবিস্ময় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে

হারে বেড়ে যায়। এই সূত্র মতে ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সী প্রতি সেকেন্ডে ৪৫,০০০ মাইল গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে 3c – 295 'কোয়াসার'টি (রেডিও গ্যালাক্সীটি) একই হিসেবে সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল গতিতে আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্যালক্সীসমূহের
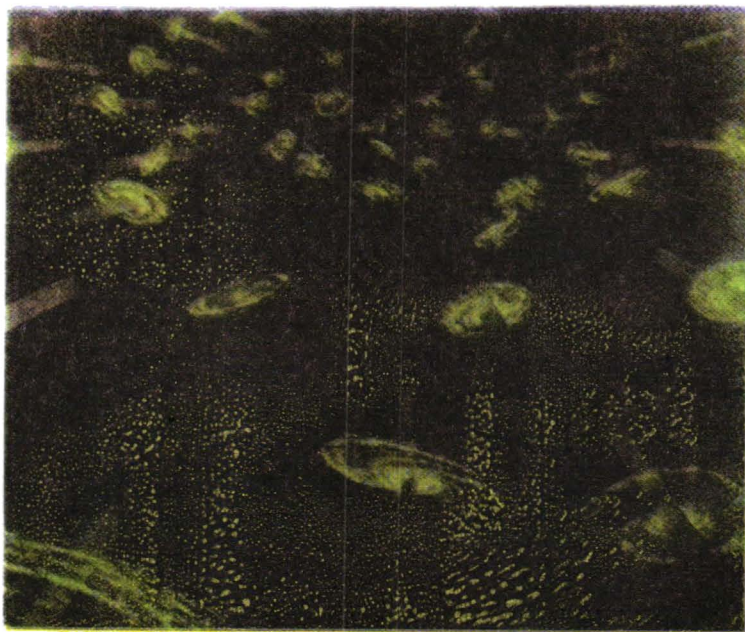
চিত্রঃ ৯৪
"আমি আকাশমন্ডলীকে (মহাবিশ্বকে) সৃষ্টি করেছি শক্তিবলে, নিশ্চয় আমি একে সম্প্রসারণ করছি।" (৫১ ঃ ৪৭)
– সে কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে সম্প্রসারণ চলছে গ্যালাক্সীর মাঝে, কেন্দ্রে, গ্যালাক্সীর বাহুতে, এমনকি প্রতিটি সৌরজগতসহ মহাবিশ্বের সর্বত্র।

এই দূরবর্তী অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে মূল কোন তথ্য বিজ্ঞান এখনও সংগ্রহ করতে এবং প্রমাণ করতে পারেনি। তবে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত বিশাল-বিরাট গ্যালাক্সীগুলো, Big-Bang Model-এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত ছিল, বর্তমান সম্প্রসারণ যে সেই মহাসম্প্রসারণেরই ধারাবাহিকতা এখনো অক্ষুন্ন রেখে চলেছে–সে কথা

গোটা বিজ্ঞানজগত একবাক্যে স্বীকার করছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এই মহাসম্প্রসারণ শুধু একমুখী নয়; বরং সর্বমুখী। এমনকি গ্যালাক্সীদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাতেও বিরাজমান। আমাদের গ্যালাক্সি 'Milky Way'-র দু'টি বাহুর একটি প্রতি সেকেন্ডে ৫৩ কিঃ মিটার (প্রায়) বেগে এবং অপর বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিঃ মিটার

চিত্রঃ ৯৫
"তিনি সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত"। (৬ ঃ ১১০)
মহাবিশ্বের সম্প্রসারণজাত কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে, বাহুতে, ভিতরে তথা সর্বত্রই চলছে অবিরাম সম্প্রসারণ।

(প্রায়) বেগে চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই সম্প্রসারণ বাহু দু'টির মধ্যে ধারণকৃত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। আবার ২০০০ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত গ্যালাক্সীর কেন্দ্রটিও প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪০ কিঃমিটার গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন আমাদের সৌরজগতটিও সেকেন্ডে প্রায় ২০ কিঃ মিটার বেগে সম্প্রসারিত হয়ে গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সীর ভেতরে, বাইরে, ও গ্যালাক্সীদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যেও সমভাবে বিরাজিত। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো–বেলুনকে

বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে ক্রমান্বয়ে বড় করে তোলা—যেখানে দেখা যাবে প্রতিটি চিহ্নিত বিন্দুতে সমভাবে সম্প্রসারণ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঠিক অনুরূপ প্রতিমুহূর্তে সীমাহীনভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত পরিণতির দিকেই কেবল এগিয়ে যাচ্ছে।
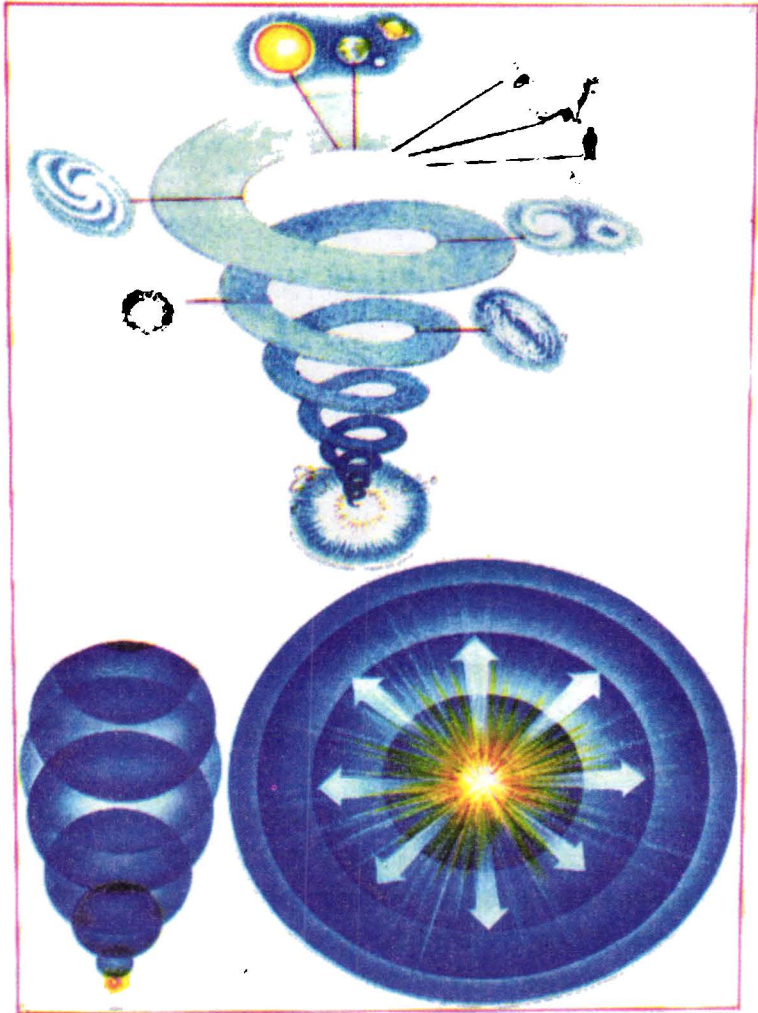
চিত্রঃ ৯৬

সৃষ্টির শুরু 'Big-Bang' হতে যে মহাসম্প্রসারণ আরম্ভ হয় তা এখনও দুর্বার গতিতে কেবলই এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যে এর সমাপ্তি ঘটবে তা একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানে না।
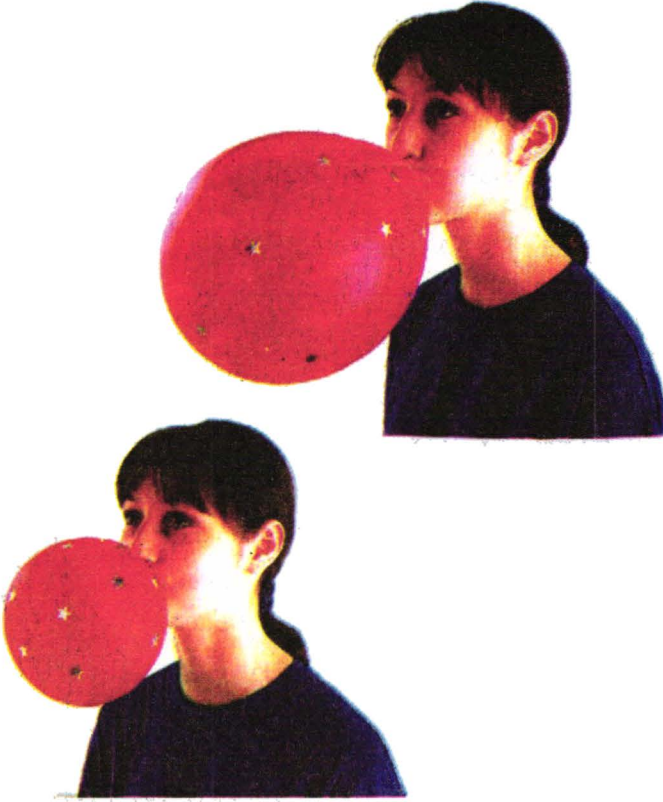
চিত্রঃ ৯৭

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের মত সবদিকে সমভাবে বর্ধিত হয়ে চলেছে। উক্ত সম্প্রসারণ কোথায়, কখন, কিভাবে যে থেমে যাবে তার সঠিক ধারণা এখনও মানবজ্ঞানে বোধগম্য নয়। অতি সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে, অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ থামার কোন লক্ষণ নেই।
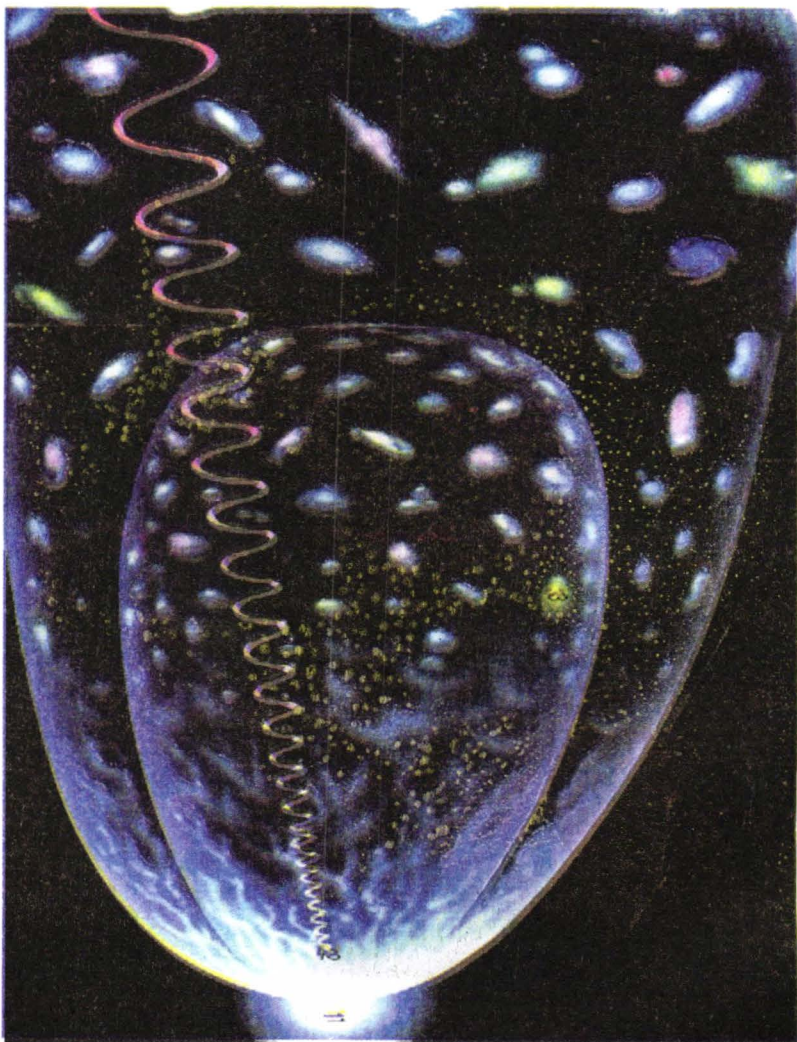
চিত্রঃ ৯৮

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করছো না"? (৭১ ঃ ১৩)
ভূ-পৃষ্ঠে জ্ঞানবান সমাজের জন্য 'মহাবিশ্বটি' সত্যি মহাজ্ঞানের – মহা সমাহার। ছবিতে 'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণ এবং পরবর্তী সম্প্রসারণ দেখানো হয়েছে।

এখন পুরো বিষয়টি 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত" (৬ঃ১০২)	(১) ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী 'জর্জ ল'মেইটর' কর্তৃক সৃষ্টিতত্ত্বঃ Big Bang প্রস্তাবিত হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে Back ground radiation 2.73 k. আবিষ্কৃত হয়ে 'Big Bang' সত্য প্রমাণিত হওয়াতে সাথে সাথে একথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, এক মহাবিস্তার 'শক্তির উৎস' হতে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রচন্ড শক্তির ঘনায়ণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন ঘটে।
"আমি আকাশমন্ডল (মহাবিশ্বকে) সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে এবং নিশ্চয়ই আমি একে সম্প্রসারণ করছি।" (৫১ঃ৪৭)	১৯২০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' মহাকাশে কোটি কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান দেন এবং তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্যালাক্সীদের সার্বিক অবস্থায় ওপর গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরী করেন। সেই রিপোর্টে দেখানো হয় প্রতিটি গ্যালাক্সী পরস্পর পরস্পর থেকে দ্রুত গতিতে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে। এই পরস্পর দূরে সরে যাওয়ার গতি একসময় আলোর গতির সমান গতিতে পৌঁছে যায়। এতে প্রমাণিত

	হয়ে যায় বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের মতো এই মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে মহাসম্প্রসারণের আওতায় কেবলই সম্প্রসারিত হয়ে ছুটে যাচ্ছে।
(২) "তাঁর মহাবাণীই সত্য" (৬ঃ৭৩)	(২) মহাবিশ্বের 'মহাসম্প্রসারণ' সৃষ্টির সর্বত্র আজ বাস্তব প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছে। এই সম্প্রসারণ চলছে গ্যালাক্সীতে, তার কেন্দ্রে, বাহুতে, এবং আমাদের সৌরজগত সহ মহাজাগতিক সকল পর্যায়ে, যার বাস্তবতা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ১৪০০ বৎসর পরে হলেও বিজ্ঞান অবনত মস্তকে বাস্তবতার আলোকে তা মেনে নিয়েছে।
(৩) "আল্-কুরআন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।" (৩৬ ঃ ২) "এটা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট হতে।" (৩৯ ঃ ১)	(৩) কুরআনের বক্তব্য ১৪০০ বৎসর পূর্বের হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষতার যুগেই কেবল বিজ্ঞানের চূড়ান্ত আবিষ্কারসমূহ এক এক করে কুরআনের ঐশীবাণীসমূহকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত করে চলেছে। এতে নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয় 'কুরআন' বিজ্ঞানময় গ্রন্থ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, সন্দেহ-সংশয় যা কিছু সৃষ্টি হয় তা দুর্বল চিত্তধারী সামান্য জ্ঞানের অধিকারী মানুষের ভিতর থেকে উত্থিত এক প্রকার দুর্বলতা মাত্র।

(৪) "তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করছো না?" (৭১ঃ১৩)	(৪) বিজ্ঞান মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অদৃশ্য অথচ বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এক বুদ্ধিদীপ্ত 'মহান মনীষার' হস্তক্ষেপ সর্বত্রই অনুভব করছে এবং তাঁর মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বকেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করছে। তবে, যেহেতু বিজ্ঞান তার নিজের বেলায় এমন অনেক কিছুই না দেখে বিশ্বাস করে বিধায় (যেমন–কোয়ার্ক, ফোটন, বিগ-ব্যাংগ, মধ্যাকর্ষণ, বাতাস, তাপ ইত্যাদি) একদিন সময় আসবে যেদিন 'মহান সত্ত্বাকেও' অবনত শিরে সরাসরি মেনে নিতে বাধ্য হবে।

সুতরাং বলা যায় 'আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স'।

(আমাদের মহাবিশ্বটি যে Closed universe নয়; বরং Flate ও Open universe-র কারণে অনবরত মহাসম্প্রসারণ অবিরাম ও দূর্বার গতিতে চলছে, তা বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৪, কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস।)

মহাবিশ্ব 'আমর' (Gravity) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

আল্-কোরআনঃ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশ, আর না আছে কোন জ্ঞান দীপ্ত গ্রন্থ''। (২২ ঃ ৮)

"তারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন"? (৭ঃ১৮৫)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর"। (১০ঃ১০১)

"অবশ্যই তাতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য"। (১৫ঃ৭৫)

"শপথ যা সবেগে (কেন্দ্রাভিমূখে) ধাবিত করে"। (৭৯ ঃ ১)

"তিনি সমগ্র জমিনকে তোমাদের জন্য অনুগত (এমন শক্তি-সম্পন্ন) করে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা পৃথিবীর যে কোন অংশেই চলাফেরা করতে পার (এবং যেন ছিটকে পড়ে না যাও)"। (৬৭ঃ১৫)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশজগত ও পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় না"। (৩৫ঃ৪১)

"আর সমস্ত নক্ষত্ররাজি তাঁরই 'আমর' দ্বারা বাঁধা, নিশ্চয়ই এর ভেতর বিজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"। (১৬ঃ১২)

"আল্লাহ্ তায়ালার মহা নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তাঁরই 'আমর' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে"। (৩০ঃ২৫)

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?"। (৪০ঃ৮১)

"এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে, তা মিথ্যা"। (৩১ঃ৩৪)

উদ্ধৃত কুরআনের বাণীসম্ভারে চোখ বুলাতে গিয়ে আপনার কাছে মনে হবে যেন, বাণীগুলো বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য-ভান্ডারের অবদানে ধন্য হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি কি তাই? কক্ষনও নয়' বরং বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানের প্রদত্ত তথ্যের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই যখন বিশ্বের মানুষ 'মহাকর্ষবল' (Gravitation) সম্পর্কে কোন জ্ঞান-ই রাখতো না, সেই অন্ধকার–অবৈজ্ঞানিক যুগে নিরক্ষর (উম্মী) নবীর উপর মহাবিশ্বের সৃষ্টি কর্তার পক্ষ থেকে যে 'কুরআন' অবতীর্ণ হয়েছিল–এই পবিত্র বাণীগুলো সেই কুরআনের। পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানময় কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা তুলনায় অদ্বিতীয়ও বটে। এর প্রতিটি পৃষ্ঠাই বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্তে এই গ্রন্থে সামগ্রিক জীবন নির্বাহের পথনির্দেশ উল্লেখ করার পাশাপাশি একটা দীর্ঘ সময় পূর্বেই ভূ-পৃষ্ঠের বৈজ্ঞানিক আওতাভুক্ত প্রায় সকল ব্যাপারেই প্রকৃত তথ্য মানবজাতিকে অবহিতও করেছেন, যেন তাদের সামনে পরোক্ষভাবে তাদের অদৃশ্য 'সৃষ্টিকর্তা' প্রকাশিত হয়ে পড়েন এবং মানুষ যেন তার স্রষ্টার দর্শন লাভে ধন্য হতে পারে। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার উপস্থিতিকে অনুধাবন সীমানায় চিহ্নিত করতে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়ে সহজ আর কোন বিষয়ই পেতে পারে না।

উদ্ধৃত ২২:৮ আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা তাদের প্রভুর থাকা না থাকা নিয়ে অজ্ঞদের ন্যায় বিতন্ডা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানহীন এবং উদভ্রান্ত–দিশেহারা। এরা জ্ঞানদীপ্ত কোন গ্রন্থ বা বাণীসম্ভার থেকেও বঞ্চিত। সঠিক জ্ঞানের সামান্যতমও যদি এরা লাভ করতো, তাহলে তাদের প্রভুর শত-সহস্র যে নিদর্শন (চিহ্ন) পৃথিবীপৃষ্ঠে তথা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তা দর্শন করে এই জঘন্য অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে আত্মরক্ষা করে কল্যাণের পথ মাড়াবার সুযোগ পেয়ে যেত। তাদের দূর্ভাগ্য বলতে হবে–যারা সঠিক জ্ঞানের স্রোতধারা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনার গোলকধাঁধায় নিজেদেরকে বন্দী করে চলেছে। এই ব্যর্থ শ্রেণীর লোকদের উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ্ তা'য়ালা ৭:১৮৫ আয়াতে প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করলেন–"তারা কি আকাশ জগত ও পৃথিবীসহ সৃষ্ট সকল কিছুর গঠন প্রনালী আকৃতি ও ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগের সাথে তাকায় না"? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক কিছুরই তারা সন্ধান পেয়ে যেত, যা তাদের প্রভুর উপস্থিতির বহু চিহ্ন বহন করে চলেছে। তাই ১০:১০১ আয়াতটিতে বিচক্ষণতার সাথে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সকল

কিছুর ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন এবং ১৫:৭৫ আয়াতে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, যারা সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানী সম্প্রদায় তারা এতে অনেক কিছুরই সন্ধান পাবে, যা তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট হিসাবে বিবেচিত হবে।

এরপর ৭৯:১ এবং ৬৭:১৫ আয়াতে বললেন যে, "আমি শপথ করছি সেই বিষয়ের যা সবেগে (কেন্দ্রাভিমুখে) সকল কিছুকে ধাবিত করে"। অর্থাৎ, তিনি এমন এক শক্তি (Force) সৃষ্টি করেছেন, যে শক্তি মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ভিতর এমনভাবে কার্যকর যা ঐ বস্তুভরসহ বাকী সকল কিছূকে নিজের দিকে (বস্তুর কেন্দ্রের দিকে) আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণজনিত প্রভাবের বাইরে মহাবিশ্বে কোন কিছুর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আমাদের পায়ের তলার এই পৃথিবীতে এ শক্তি (মধ্যাকর্ষণ) আছে বলেই আমরা ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন অংশেই স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারছি। নতুবা ঐ শক্তির অনুপস্থিতিতে আজকের মত ইচ্ছামাফিক অনায়াসে চলাফেরা বা কাজকর্ম করতে পারতাম না। আকর্ষণহীনতার কারণে মানুষ, গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, জীব-জন্তু, সকল কিছুই ভূ-পৃষ্ঠ হতে ছিটকে পৃথিবীর আওতার বাইরে মহাশূন্যে হারিয়ে যেত। পৃথিবী চিরদিনের জন্য জীবনের উন্মেষ ও লালন-পালনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতো। কোন কিছুই এমনকি সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বালিকণাও ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়ে মহাশূন্যে ভাসতে থাকতো। আবার দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'য়ালা এই শক্তি সৃষ্টি করে এমন একটা পরিমিতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সকল কিছুই প্রয়োজনীয় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় বজায় আছে। যদি এই পরিমিতি বাড়িয়ে দিতেন, তাহলে আকর্ষণ মাত্রা (মধ্যাকর্ষণ) বেড়ে যাওয়ার কারণে কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা সবই কঠিন হয়ে পড়েতো এবং সকল প্রাণীর আকৃতি খাটো হয়ে যেতো। সকল কিছুর ওজন কয়েকগুণ বেড়ে যেত। আমাদের মাথার উপর বায়ুমন্ডলের স্তর কল্পনাতীতভাবে হ্রাস পেয়ে মাত্র কয়েক কিলোমিটারে এসে দাড়াতো। ফলে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়ার কারণে পৃথিবী তার আবাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতো। আবার আকর্ষণমাত্রা যদি কমিয়ে দিতেন তাহলেও চলাফেরাসহ সকল কাজে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হতো। ওজন

হালকা হয়ে যাওয়ার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের সকল চলমান জিনিসই লাফাতে থাকতো, বায়ুমন্ডল নামে মাত্র সামান্য একটু বাদে বাকীটা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত। ইথারের স্বল্পতার কারণে কাছের জনের কথাও শুনা যেত না। এক কথায় সীমাহীন সমস্যায় ভূ-পৃষ্ঠ জর্জরিত হয়ে পড়তো। আল্লাহ্ তা'য়ালা একটিমাত্র শক্তি সৃষ্টি করে পরিমিতির মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সার্বিক স্থানীয় ভারসাম্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। এই বিরাট আশ্চর্যজনক কাজটি কি তাঁর বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে না?

৩৫ঃ৪১ ও ৩০ঃ২৫ এবং ১৬ঃ১২ আয়াতগুলোতে তিনি আরো বড় ধরনের আশ্চর্যের সংবাদ মানবজাতিকে অবহিত করেছেন, বলেছেন–তাঁর মহা নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে তাঁর 'আমর' নামক উল্লেখিত 'শক্তির' মাধ্যমেই কেবল মহাবিশ্বের অসংখ্য আকাশজগত এবং এই পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, ঐ শক্তির আকর্ষণবলের অদৃশ্য যাদুময়ী ব্যবস্থাপনাই মিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সী, বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র এবং মহাকাশের অগণিত বস্তুসমূহকে পরস্পর আকর্ষণজনিত পদ্ধতিতে মহাকাশে ভারসাম্য করে ঝুলিয়ে রেখেছে। এ রকম নিদর্শন যে শুধু এক মহাজ্ঞানী–প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী সত্ত্বা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষেই কেবল সম্ভব, এই 'সত্যকে' মানুষ কোন যুক্তিতে প্রত্যাখান করবে? সমগ্র সৃষ্টিজগতে এতবড় নিদর্শন কি প্রমাণ করে না যে 'আল্লাহ্' সত্য এবং তাঁর বিপরীতে সবই মিথ্যা? সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একযোগে চেষ্টা করলেও মহাকাশের উল্লেখিত বস্তুদের তাদের নিজস্ব কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দিতে বা তাদের গতি পরির্তন করে দিতে কখনই পারবে না। তাহলে কেন মানুষের এত অহংকার? কেন মানুষ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নেয়া এতবড় বিস্ময়কর ব্যবস্থার বাস্তবপ্রমাণ স্বচক্ষে দর্শন লাভ করেও তাঁর কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করছে? অন্ততঃ প্রকৃত জ্ঞানীদের জন্যতো এ জাতীয় আচরণ কখনোই শোভনীয় হতে পারে না।

এবার চলুন বিজ্ঞানাগারে, দেখি তাদের বক্তব্য কি?

বিজ্ঞান

মুসলিম বিজ্ঞানী আল্ খারেজমী ৯ম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম মধ্যাকর্ষণ বল (Gravitation) সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন,"The earth attracts everything towards it." পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করে। পরে বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে তত্ত্বটি নিশ্চিত প্রমাণ করেন।

১৬৬৫ সালে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী 'স্যার আইজাক নিউটন' আপেল মাটিতে পড়তে দেখে ভাবলেন–আপেল মাটিতে পড়ে কেন? কেন গাছ থেকে ঝরে উপরের দিকে উঠে যায় না? এই বিষয়কে সামনে রেখে তিনি পরবর্তীতে গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন–'মধ্যাকর্ষণ' শক্তিকে। যার কারণেই আপেলসহ সকল কিছুই উপর থেকে নিচে মাটিতে পতিত হয়। পৃথিবীর

চিত্রঃ ৯৯

"তারা কি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দিকে তাকায় না, এবং ও সবের প্রতি যা আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন"? (২২ ঃ ৮)

– 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' তাকাতে গিয়েই আবিষ্কার করলেন 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি' যার কারণে আপেল গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে, উপরের দিকে উঠে যায় না।

কেন্দ্রে 'মধ্যাকর্ষণ' সক্রিয় বিধায় পৃথিবীপৃষ্ঠে চতুর্দিকেই এর প্রভাব সমভাবে বিরাজমান। বিজ্ঞানীদের মতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্তমানেই পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষের চলাচল, কাজ কর্ম, তথা জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে। এই

চিত্রঃ ১০০

"তিনি সমগ্র জমিনকে (পৃথিবীকে) তোমাদের জন্য অনুগত (এমন শক্তিসম্পন্ন) করে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা পৃথিবীর যে কোন অংশেই স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পার (যেন ছিটকে পড়ে না যাও)"। (৬৭ ঃ ১৫)

–মহান সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি হচ্ছে – 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি'। একটি শক্তি! অথচ তার বহুবিধ তুলনাবিহীন আশ্চর্য করার মত কর্মকান্ড, যা সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে অভিভূত না করে পারে না।

শক্তিই আমাদের মাথার উপরে প্রায় ৬০০ মাইলব্যাপী বায়ুমন্ডলের স্তর ধরে রেখে আমাদেরকে একদিকে গ্যাসীয় বিভিন্ন উপাদান নিয়মিত সরবরাহ করছে, অপরদিকে মহাজাগতিক ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রকারের আলো এবং সহসা আঘাতকারী পাথর, উল্কা, ধূমকেতু, গ্রহানু ইত্যাদির ধ্বংসের হাত থেকে ছাদের ন্যায় রক্ষা করছে। মধ্যাকর্ষণশক্তিই মেঘমালাকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ধরে রেখে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে জীবন্ত ও সতেজ রাখছে। আবার মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর সর্বত্র পানি আটকা পড়ে প্রতিদিন আমাদের হাজারো ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন– মুহূর্তের জন্য যদি মধ্যাকর্ষণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিঃ মিঃ বেগে চলমান এবং নিজ অক্ষের উপর প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিঃ মিঃ বেগে ঘুর্নণরত থাকার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই বাতাসের ঝাপটার সাথে মহাশূন্যে উড়ে যাবে। এমনকি হাল্‌কা ধূলা-বালিও ভূ-পৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে না।

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু-ই 'মহাকর্ষ বল' বা 'Gravitation'-র আকর্ষণবলের মধ্যে ধারণকৃত হয়ে অবস্থান করছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রবালিকণা থেকে শুরু করে বিরাট-বিশাল গ্যালাক্সীসমূহ পর্যন্ত সকল কিছুই মহাকর্ষ বলের 'সুপের' মধ্যে যেন ডুবানো, যার কারণে মহাবিশ্বের কোন একপ্রান্তে মহাকর্ষ কোন ক্রিয়া করলে সাথে সাথেই মহাবিশ্বের অপরপ্রান্তে তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই মহাকর্ষ বলের আকর্ষণজনিত শক্তির কারণেই গ্যালাক্সী, কোয়াসার, পালসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু সকল কিছুই মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় ব্যবস্থিত হয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে। এক কথায় আমাদের এই মহাবিশ্বটিকে সার্বিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করে কার্যপোযোগী রাখছে এই মহাকর্ষ বল বা Gravitation. এছাড়াও মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে মহাকর্ষের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। মহাকর্ষের অদৃশ্য টেক্‌নিকই এ মহাবিশ্বকে গতিশীল (Motion) রাখার পিছনে অন্যতম কারণ। ক্ষণিকের জন্যও যদি এই মহাকর্ষবলকে তুলে নেয়া যায়, তাহলে গোটা মহাবিশ্বটি সরাসরি তৎক্ষণাৎ বিরাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

বিজ্ঞানীরা আরো জানাচ্ছেন যে, এই মহাকর্ষবলের কারণেই পৃথিবী চন্দ্রকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় বন্দী করতে সমর্থ হয়েছে, আর এই সুবাদে

চন্দ্রের অভিকর্ষের আকর্ষণে পৃথিবীপৃষ্ঠে দিনে দু'বার জোয়ার-ভাটার সূচনা হচ্ছে এবং পৃথিবী প্রতিদিন নববধুর রূপ ধারণ করে জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী-

Black
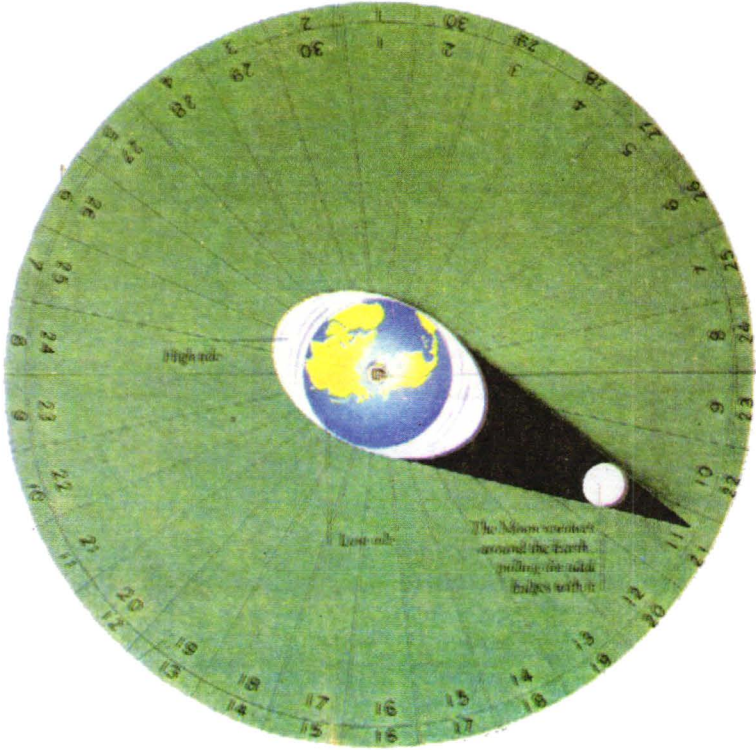
চিত্রঃ ১০১

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর"।
(১০ ঃ ১০১)

– পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝে 'অভিকর্ষবল' প্রবলভাবে সক্রিয় আছে বিধায় চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর পানি উপরের দিকে ফুলে উঠে জোয়ারের সৃষ্টি করে। চাঁদ পৃথিবীর যেদিকে থাকে সেই দিকে এবং ঠিক তার বিপরীত দিকে একই সাথে জোয়ার থাকে। অপরাপর দিকে তখন থাকে ভাটা।
মহানস্রষ্টার কি আশ্চর্য সৃষ্টিব্যবস্থা!

কুলকে স্নেহের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই বড় আশ্চর্য হতে হয় 'Gravitation' নামক এই শক্তির (Force) গণনাতীত নীরব কর্মকান্ডে।

(১)
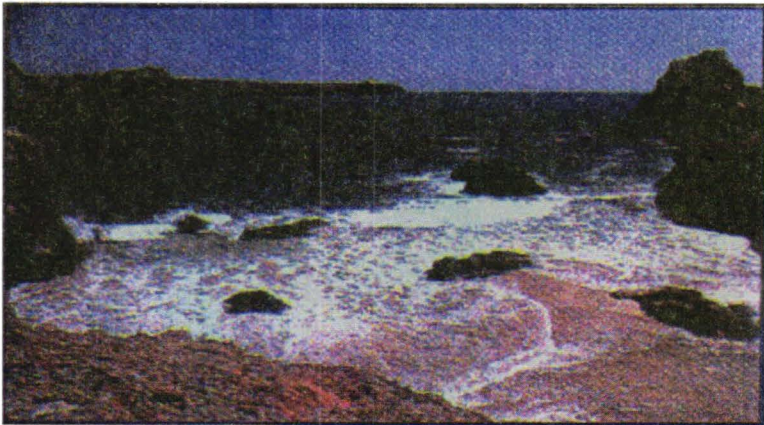
(২)

চিত্রঃ ১০২

"অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানীসম্প্রদায়ের জন্য"। (১৫:৭)

(১) ভূ-পৃষ্ঠে চাঁদ এবং পৃথিবীর বিপরীতে নদীতে ভাটা চলছে।

(২) ভূ-পৃষ্ঠে চাঁদ এবং পৃথিবীর দিকে নদীতে জোয়ার চলছে।

বিজ্ঞানীদের নিকট 'মহাকর্ষবল' দুর্বোধ্যতায় সুরক্ষিত। এর সম্পর্কে অনেকেরই মন্তব্য হচ্ছে 'We don't yet know what causes gravity, but we know what gravity does'. যদিও মহাকর্ষের

চিত্রঃ ১০৩

"শপথ, যা সবেগে (কেন্দ্রভিমুখী) ধাবিত করে"। (৭৯ ঃ ১)

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। ফলে বিস্ময়করভাবে এই আকর্ষণের আওতায় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রত্যেকেই মহাশূন্যে টিকে আছে। সৃষ্টিকর্তার এই বিস্ময়কর কীর্তিকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

সঠিক পরিচিতি এখনো দুর্বোধ্যতার জালে আবদ্ধ, তথাপি সৃষ্টির শুরুতে এই বল পৃথক হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকার্যে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। Space তৈরী, গতির (Motion) সৃষ্টি, Cosmic string-কে সক্রিয় করা, গ্যালাক্সীদের মহাকাশে আবর্তনশীল রাখা, নক্ষত্র সৃষ্টি ও তাদের জীবন-

মরণসহ বিবিধ মৌল সৃষ্টি, সকল প্রকার পদার্থ সৃষ্টি, গ্রহ-উপগ্রহ ও জীব সৃষ্টির ক্ষেত্র সৃষ্টিসহ উল্লেখিত সকল কাজে মহাকর্ষবলই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ
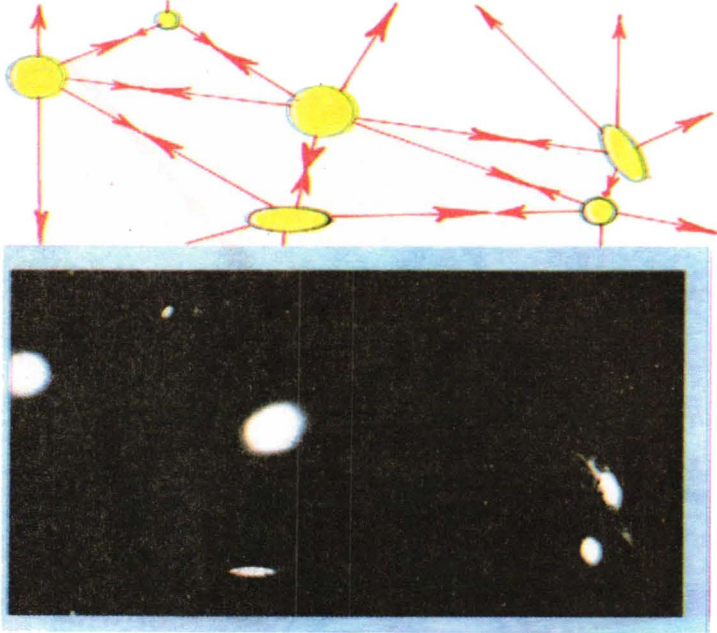
চিত্রঃ ১০৪
"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশজগত ও পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় না"। (৪১ঃ৩৫)
– কি চমৎকার ব্যবস্থা ! হাজার হাজার, কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে সৃষ্ট 'Star city' বা Galaxy গুলো 'মহাকর্ষ বলের' মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় পরিভ্রমণে রত আছে।

ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া 'তারকা মৃত্যুকূপ' নামে খ্যাত 'Black hole'-র ভিতর শুরু থেকেই এই 'মহাকর্ষবলের' একক খেলা সংঘটিত হয়ে থাকে। এই Black hole-র মাধ্যমেই মহাকর্ষের একটা ভয়ংকর রূপের প্রকাশ ঘটে থাকে। যার ফলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, হয়তোবা একদিন এই ব্ল্যাক হোলের ভিতর দিয়েই মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটবে, এবং তাকে সেই সৃষ্টিরমুহূর্তের পূর্বক্ষণে 'Singularity'-তে নিয়ে

পৌঁছাবে প্রচন্ড ঘনায়ণের কল্পনাতীত এক দুর্জেয় পরিবেশের মাধ্যমে।
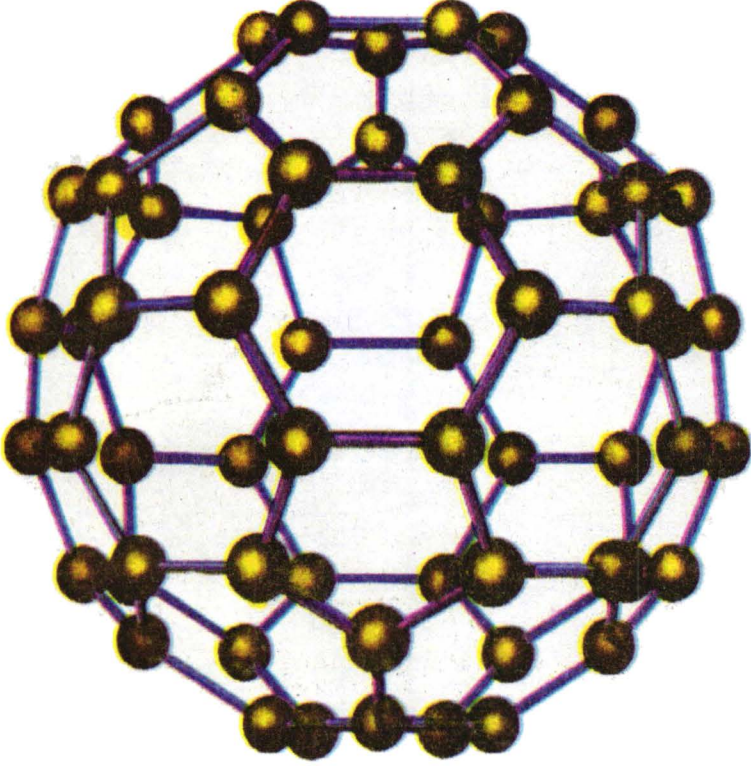
চিত্রঃ ১০৫

"আল্লাহ্ তা'য়ালার মহা নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে, আকাশজগত ও পৃথিবী তাঁরই 'আমর' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে"। (২৫ ঃ ৩০)

"তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে"? (৪০ ঃ ৮১)

–মহাকাশে নক্ষত্রসমূহ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কি চমৎকার শৃংখলার মধ্য দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে আছে। নীরবে যেন এক মহাজ্ঞানী সত্ত্বার উপস্থিতি, এর পিছনে যে কার্যকর তা তুলে ধরেছে।

মহাকর্ষ বা Gravitation সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের এই হচ্ছে মোটামুটি তথ্য বা আবিষ্কার। তাহলে কি বলা যায় না, দৃশ্যমান মহাবিশ্বে 'মহাকর্ষ বলের' স্থানই শীর্ষে?
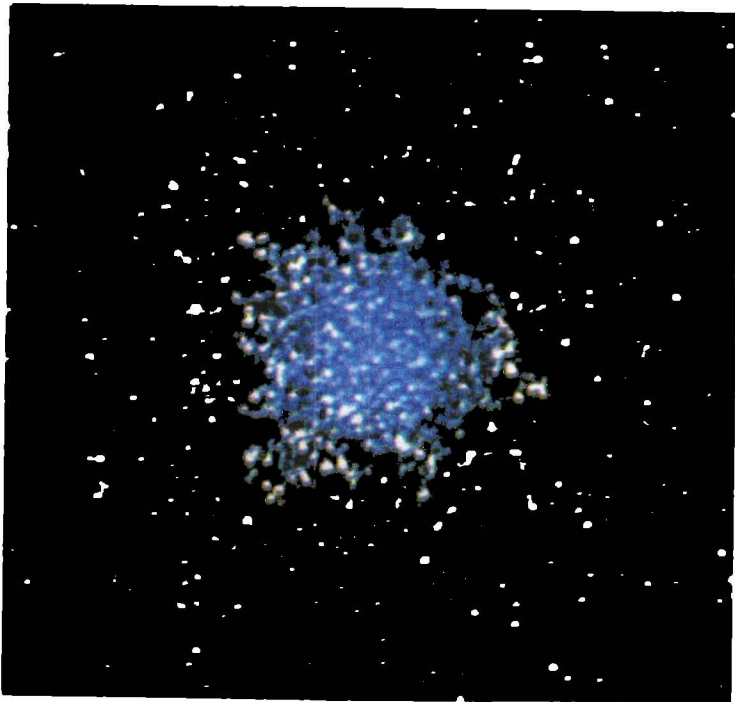
চিত্রঃ ১০৬
"আর সমস্ত নক্ষত্ররাজি তাঁরই 'আমর' দ্বারা বাঁধা, নিশ্চয়ই এর ভিতর বিজ্ঞলোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"। (১৬ঃ১২)

কুরআনের 'আমর' নামক যে বিশেষ শক্তি আমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং মহাকাশে নক্ষত্রসমূহ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করার বিশেষ এক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করছে, সেই শক্তি এবং বর্তমান বিজ্ঞানের মহাকর্ষ (Gravitation) নামক উল্লেখিত শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য বা তফাৎ আছে কি? 'মহাকর্ষ' নামক বিষয়ে 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' যদি আমাদের শ্রদ্ধা, পেতে পারেন, তাহলে তারও হাজার বছর পূর্বে ৬১০ সালের কুরআন

কি একই তথ্য সরবরাহ করার কারণে আমাদের অনুভবের সীমানায় কিছুই দাবী করতে পারে না?

চিত্রঃ ১০৭

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এ এক মহা সাফল্য"। (১০ঃ৬৪)

–পৃথিবীর 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি' প্যারাসুটবাহীকে প্রবল বাতাসের বাধাকে ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়তে বাধ্য করছে।

"এগুলিই প্রমাণ যে 'আল্লাহ্ সত্য'"। (৩১ঃ৩৪)

এখন পুরো বিষয়টি 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।" (১০:১০১) "তারা কি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন?। (৭:১৮৫) "অবশ্যই তাতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫:৭৫)	(১) পৃথিবীপৃষ্ঠে মানব ইতিহাসে জানামত, শুধু বর্তমান মানবগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও আবিষ্কারে সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে প্রতিক্ষণে মহাবিশ্বের সকল দিক ও পরতে বিদ্বান ব্যক্তি বর্গের সাধনায় অগণিত-অসংখ্য জ্ঞানের নিদর্শন সৃষ্টি হয়ে মানবগোষ্ঠীকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণের অভিমত হলো মহাবিশ্বটি যেন জ্ঞানের সাগরে ডুবে আছে। আর সেজন্যই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আলবার্ট' আনইস্টাইন ঘোষণা করলেন– 'মহাবিশ্বে মহাজ্ঞানের সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দু'-একটা বালুকণা মাত্র নাড়া-চাড়া করে গেলাম, এর বেশি আর কিছুই করতে পারিনি'। মহাবিশ্ব মহাজ্ঞানের আঁধার। যেদিকে তাকানো হোক সর্বত্রই দেখা যাবে পরিকল্পনা, শৃংখলা, নিয়ম-কানুন এবং ব্যাপক জ্ঞানের সমারোহ যা জ্ঞানপূর্ণ নিদর্শনই বটে।

(২) "শপথ যা সবেগে (কেন্দ্রাভিমুখে) ধাবিত করে।" (৭৯:১)

"তিনি সমগ্র জমিনকে তোমাদের জন্য অনুগত (এমন শক্তি সম্পন্ন) করে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা পৃথিবীর যে কোন অংশেই চলা-ফেরা করতে পার (যেন ছিট্‌কে পড়ে না যাও।" (৬৭:১৫)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশজগত ও পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় না।" (৩৫:৪১)

"আল্লাহ্ তায়ালার মহানিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে আকাশজগত ও পৃথিবী তাঁরই 'আমর' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" (৩০:২৫)

"আর সমস্ত 'নক্ষত্ররাজি' তাঁরই 'আমর' দ্বারা বাঁধা। নিশ্চয়ই এর ভিতর বিজ্ঞলোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (১৬:১২)

(২) ১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ডে 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' আপেল গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়তে দেখে ভাবতে লাগলেন, কেন আপেলটি ওপরের দিকে চলে গেল না? মাটিতে কেন পড়লো? এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত তিনি 'মধ্যাকর্ষণ বল' আবিষ্কার করেন।

পরবর্তীতে বিজ্ঞান এই মধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য উদ্‌ঘাটন করে প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পৃথিবী পৃষ্ঠে সকল বস্তু টিকে আছে, চলমান সকল প্রাণী নির্বিঘ্নে চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম করতে পারছে। নদ-নদী, সাগর, মহাসাগরে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয়ে গোটা পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করছে। ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে প্রায় ৬০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত আবহমন্ডলকে ধরে রেখে পৃথিবীর জন্য বর্ণনাতীত উপকার সাধন করছে।

মহাকাশে এই Gravitation-র কারণেই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সীসহ সকল কিছুই শূন্যের ওপরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করে ব্যবস্থিত হয়ে টিকে আছে।

এক কথায় Gravitation বা মহাকর্ষবলটি মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে মহাজাগতিক সকল বস্তু সৃষ্টি এবং এদের যথাযথ ভারসাম্যতা সৃষ্টি করে মহাশুন্যের ওপর টিকে থাকা, ও নিজ নিজ কার্যক্রম চাহিদা অনুযায়ী সুসম্পন্ন করাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করে চলেছে। Gravitation সত্যই এক অনন্য শক্তি (Force) যার তুলনা সে নিজেই।

(৩) "তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে।" (৪০:৮১) "এগুলিই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে আহ্বান করে তা মিথ্যা।" (৩১:৩৪)	(৩) বিজ্ঞান বিশ্ব 'মহাকর্ষ বলের (Gravitation-র) কর্মকান্ডে অনেক ব্যাপারেই কিংকতর্ব্যবিমূঢ়। যদিও মহাকর্ষ বলকে দেখা যায় না কিন্তু এর পিলে চমকানো Black hole activities সত্যিই মানবকুলকে না ঘাবড়িয়ে পারেনা। Black hole -এ মহাকর্ষবলের প্রচন্ডতায় পদার্থ বিজ্ঞান যেখানে নিষ্ক্রিয় এবং ভেংগে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, যার কারণে Black hole-এ কি ঘটে সত্যিকারভাবে বিজ্ঞান তা জানে না। তাই তার নামই দেয়া হয়েছে Black hole. উল্লেখিত বাস্তবতার কারণে বিজ্ঞান Gravitation-র উৎস, এর মহাবিশ্বব্যাপী কর্মকান্ড, প্রচন্ডতা এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অস্বীকার করে না বরং নতশিরে স্বীকার করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উক্ত Gravitation বা মহাকর্ষবলের পিছনে অদৃশ্য 'কার্যকারণ' যে সক্রিয় রয়েছে সে কথাও এখন আর অস্বীকার করে না।

সুতরাং 'মহাগ্রন্থ কুরআন' বর্ণিত 'আমর' বা বিশ্ব প্রভুর নির্দেশ, যা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'Gravitation' বা 'মহাকর্ষবল' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, তার সার্বিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, একটি বিষয়েরই ক্ষেত্রবিশেষে–দু'টি নাম মাত্র। "এগুলিই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০:১) তাই পূর্বেই সতর্ক হওয়া সময়ের দাবী!

'অদৃশ্য বস্তুসম্ভার'

আল-কুরআনঃ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই"। (২৫ ঃ ৫৯)

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু" (৩২ ঃ ৬)

"তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই"। (১৬ ঃ ৭৭)

"নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কোন কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নেই"। (৩ ঃ ৫)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য তা সকলই আল্লাহ্‌র"। (১১ ঃ ১২৩)

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান রাখেন না"। (২৭ ঃ ৬৫)

"অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের ওপর অন্য কারো কোন প্রকার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই"। (৭২ ঃ ২৬)

"তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু"। (৫৯ ঃ ২২)

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয়ই তিনি অজ্ঞানতা হতে অতি পবিত্র"। (১০ ঃ ১৮)

"তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা হতে উদ্‌গত হয়, এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়"। (৩৪ ঃ ২)

"অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে নেই সূক্ষানু পরিমাণ কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছু, প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।" (৩৪ ঃ ৩)

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)

"আর এ সমস্ত অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করেছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না কিংবা জানত না তোমার সম্প্রদায়।" (১১ ঃ ৪৯)

"তিনিই মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ ঃ ৫)

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ঃ ৭৩)

"কুরআন তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে ব্যক্তি দেখতে পেল সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করল।" (৬ ঃ ১০৪)

"হে মানুষ ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার রব হতে মোহান্ধ করে রেখেছে"? (৮২ ঃ ৬)

১৬ ঃ ৮ আয়াত থেকে সর্বশেষ ৮২ ঃ ৬ আয়াত পর্যন্ত যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রসারিত হয়ে আছে, তাহলো আমাদের মাথার ওপর এবং চারদিকে দৃশ্যমান যে বিচিত্র জগত, তার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ তায়ালা নিজ মহাজ্ঞানের মাধ্যমে প্রচন্ড শক্তি এবং ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ পরিকল্পনাতে নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং প্রয়োজনও নেই। উল্লেখ্য যে, একেবারে প্রখর দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষ যা দর্শন লাভ করে থাকে–তা তো মহাবিশ্বের তুলনায় উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার-ই নয়; বরং মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থিত অদৃশ্য ব্যাপক বিশাল বিস্তৃত জগতই প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের পরিচয় বহন করার মত যোগ্যতা রাখে। যদিও কুরআনের পূর্বে এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য মানুষের জ্ঞানের সীমায় কখনও কোন সূত্র পৌঁছাতে পারেনি। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এই অকল্পনীয় বিস্ময়কর তথ্য-জ্ঞান-সমৃদ্ধ অদৃশ্য

বস্তুসম্ভার সম্পূর্ণরূপেই মানুষের অবগতির বাইরে ছিল। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। মানুষ সে যুগে দৃশ্যমান সীমারেখাকেই মহাবিশ্ব ভেবে নিত। এর বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে, সে কথা চিন্তা করাও ছিল সেই জ্ঞানান্ধ যুগে একেবারেই কঠিন, অসম্ভব এবং অবাস্তব। আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া কি করেই বা সম্ভব, মানুষ বা অন্য কোন উৎস নিজ উদ্যোগে এই বিশাল মহাবিশ্ব সংগঠনের অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আহরণ করে? কেননা এই সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কোন জ্ঞান রাখেন না। এই অধিকার ও তিনি আর কাউকে দেননি। এর সম্পূর্ণ ইখ্তিয়ার স্বাধীনতা তাঁর কুদ্রতি হাতের মুঠোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর অনুমতি ভিন্ন চুল পরিমাণও কেউ জানার অধিকারী হতে পারে না। অতএব যুগে যুগে বিজ্ঞানের মাথার উপর টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার, স্যাটেলাইট বা মান-মন্দির বসিয়ে মানুষ মহাবিশ্বের অদৃশ্য থেকে যা কিছুই আবিষ্কার করেছে, তাতে এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, এ সম্পর্কে বুঝি মুসলমানদের 'আল্লাহ্' কোন জ্ঞান রাখেন না; বরং এরকম চিন্তা করাই হবে বিজ্ঞান-বিশ্বের নামধারী জ্ঞানীদের চরম বোকামী, এবং তারা হবেন জ্ঞানের কাঠগড়ায় একজন অভিযুক্ত আসামী। কেননা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানবেন না, জানবে শুধু তৃতীয় কোন এক পক্ষ এটাতো পরিষ্কার সুস্থ বিবেক বর্জিত উক্তি ছাড়া কিছুই নয়, যা মেনে নেয়া যায় না। বিশ্ব প্রভু 'আল্লাহ্' এই ধরণের অজ্ঞানতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, বরং প্রতিটি অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে তিনি সম্যক ওয়াকিফহাল।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান সমগ্র বিশ্ব সংসারের প্রতিটি বস্তুকে এমনভাবে ঘিরে আছে যে, প্রতিটি বালু-কণাও তাঁর সুক্ষ-তীক্ষ্ম দৃষ্টির গোচরীভূত। তিনি প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের ফরিয়াদ, অভাব-অভিযোগ, প্রার্থনা শুনেন এবং প্রয়োজনমাফিক তাদের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদেরকে ধন্য করেন। আল্লাহ্ তায়ালা স্ব-ইচ্ছায় নিজ পরিকল্পনায় বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করে তার লুকায়িত অদৃশ্য বস্তুসমূহের তথ্য যে পর্যায়ক্রমে মানবমন্ডলীর সামনে এক এক করে উদ্ঘাটন করেন, তাও কিন্তু মুল মাষ্টার প্লানের আওতাবহির্ভূত মোটেই নয়। কার্যত বলা যায়—তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী অদৃশ্য বস্তুসমূহের উপর থেকে তিনি এক এক করে আবরণ উন্মোচন করে থাকেন। এর সম্পুর্ণ কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর-ই, অন্য কারো জন্য কখনই নয়। পৃথিবীর মানবমন্ডলী এই অদৃশ্য মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অন্ধকারে ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী, আল-কুরআনের ঐশীবাণী নামক

আলোতেই প্রথমবারের মত উক্ত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়ে যায়। পূর্বে মানুষের জানা চন্দ্র, সূর্য, তারকা, পৃথিবী এবং ৫টি গ্রহ (পৃথিবীসহ)ই ছিল একমাত্র কাল্পনিক মহাবিশ্ব। আল্-কুরআনই সর্বপ্রথম অদৃশ্য মহাবিশ্বের লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সী, কোয়াসার, পালসার, নোভা, সুপার নোভা, নেবুলা, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুসমূহের সন্ধান দিয়ে যায়। ফলে সাথে সাথে জ্ঞান-চক্ষু নামক এই 'কুরআন' বিশ্বপ্রভুর সত্যবাণী সমৃদ্ধ গ্রন্থ—এ দাবী নিজ থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। সুতরাং কুরআনের সত্য-সঠিক ও স্পষ্ট এই আলোতে যারাই পথ খুঁজে নিল—তারা অবশ্যই নিজেদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণই তালাশ করে নিল। যে কল্যাণ, মঙ্গল কখনই ফুরাবার নয়। আর যারা সেই আলোতে পথ চলতে অস্বীকৃতি জানালো তারা অবশ্যই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে গেলো। তাদের নিজস্ব অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত-ই তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য একান্তভাবে দায়ী। এই হচ্ছে আয়াতগুলো সাদামাটা মর্মকথা।

বিজ্ঞানঃ

১৯২০ সালে মিঃ হাবেল মহাকাশে লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সী বা নক্ষত্র শহর (Star City) দেখতে পেলেন। যে গ্যালাক্সীগুলোর প্রতিটিতে প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটির উপর নক্ষত্র বাস করছে। প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) আলোকবর্ষব্যাপী প্রতিটি গ্যালাক্সী মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, আলোর গতির সমান গতিতে চলমান কোন আকাশযান দিয়ে যদি সফর করা সম্ভব হয়, তাহলে একটি গ্যালাক্সীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত (Across) পৌঁছাতে প্রায় এক লক্ষ বছর লেগে যাবে। এত ব্যাপক ও বিশাল বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও গ্যালাক্সীগুলো মানুষের দৃষ্টির স্বাভাবিক সীমার বাইরে পড়ে আছে। গ্যালাক্সীগুলোর মাঝে অবস্থানরত বৃহৎ-বৃহৎ নক্ষত্রসমূহ তাদের বিবর্তনের সর্বশেষ পরিণতিতে 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণের মাধ্যমে 'পালসার' (Neutron star) বা 'Black hole' সৃষ্টি হয়ে যে বিস্ময়ের-বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে, তাও মানুষ খালিচোখে দর্শন লাভ করতে পারে না।

একটি গ্যালাক্সী–একটি মহাকাশীয় চিড়িয়াখানার মত। কোটি কোটি নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু ধূমকেতু নেবুলা ইত্যাদি
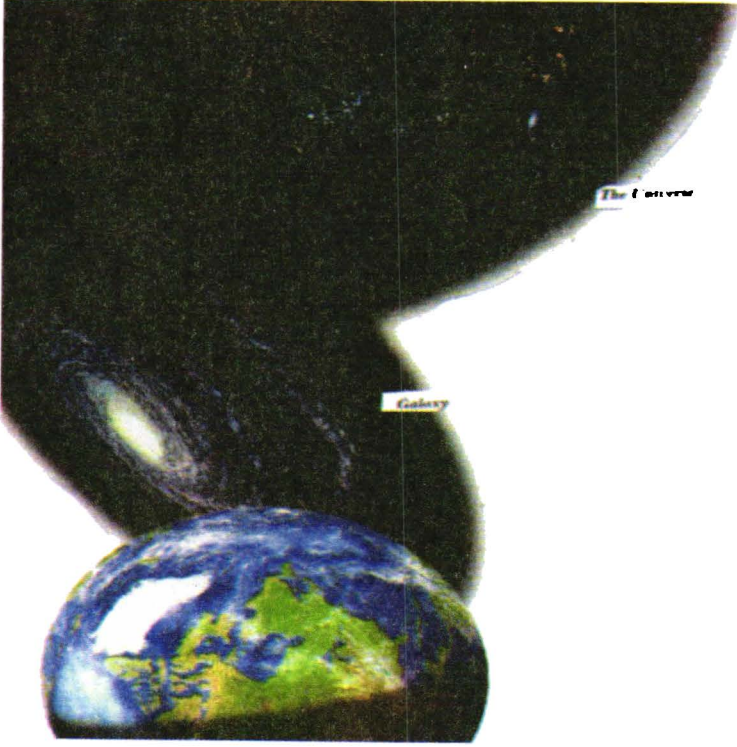
চিত্রঃ ১০৮
"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর"। (২৯ ঃ ২০)
"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই"। (২৫ ঃ ৫৯)

বিরাজ করছে এই একটি গ্যালাক্সিতে। অথচ আমরা এদের দেখতে পাই না। এরা অদৃশ্য বস্তুহিসাবে বিরাজ করছে ফলে প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র ঘটনা এই সকল অদৃশ্য বস্তুসমূহে ঘটে যাচ্ছে যার কোন জ্ঞানই আমরা রাখি না। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে তারা এই পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত মহাবিশ্বের প্রায় মাত্র ১০ ভাগ অংশে

অনুমানকৃত ১০০ কোটির মত গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছেন। বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী মহাবিশ্বের বাকী ৯০ ভাগের যে কি অবস্থা তা মানুষ কোনদিনই

চিত্রঃ ১০৯

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য তা সকলই আল্লাহ্‌র"। (১১ ঃ ১২৩)

"তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা অবগত নও"। (১৬ ঃ ৮)

– মহাকাশের মহাবিস্ময় হচ্ছে 'গ্যালাক্সিগুচ্ছ'। এক একটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটির মত নক্ষত্র বাস করে এবং প্রায় গড়ে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত। মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির আড়ালে থেকে তারা বিশ্বপ্রভুর কৃতিত্ব এবং মহীমা প্রকাশ করে চলেছে।

হয়তোবা জানতে পারবে না। কারণ ঐ দূরত্বের পরে মহাকাশীয় বস্তুসমূহ প্রায় আলোর গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমার দিকে ধাবমান, ফলে তাদের

থেকে আলো আর কখনো পৃথিবীর দিকে আসতে পারবে না, যে কারণে আমরাও আর তাদেরকে কখনোই দেখতে পাবো না।
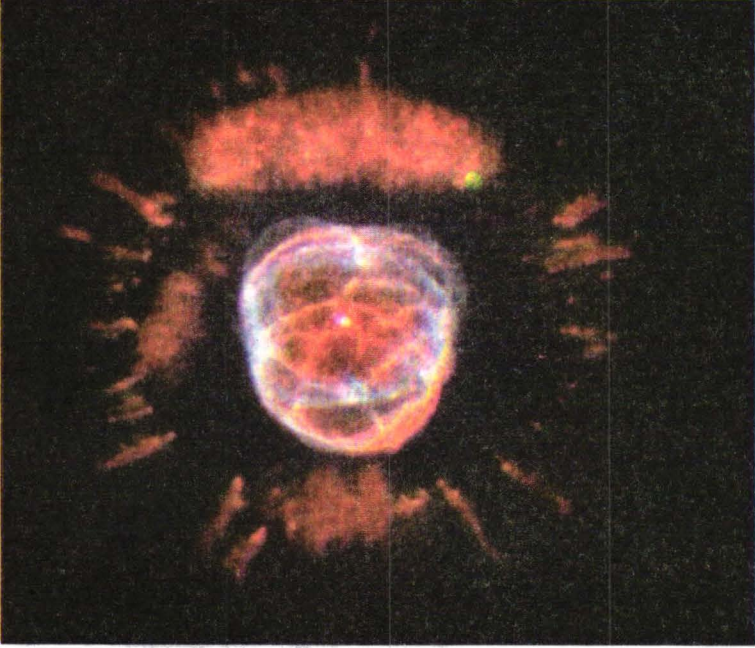
চিত্রঃ ১১০

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান রাখেন না"। (২৭ ঃ ৬৫)

– মহাকাশে গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত আমাদের সূর্যের মত নক্ষত্রের মাঝে ঘটে চলেছে শেষ পরিণতি 'নোভা' বিস্ফোরণ। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে অসংখ্য সৌরজগত।

আমাদের মাথার ওপর আকাশকে যত শান্ত দেখি, আসলে কিন্তু তত শান্ত নয়। মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক পালসার বা নিউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাক হোলগুলো ভয়ঙ্কর X-ray দিয়ে প্রতি মুহূর্তে মহাকাশ পূর্ণ করে দিচ্ছে। এই বিপদজনক আলোকরশ্মি যদিও জীবকুলের জন্য খুবই ক্ষতিকর

তথাপিও কোন এক অজানা কারণেই তা মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির বাইরেই অবস্থান করছে। আবার কমবেশি প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীতেই মাঝে-মাঝে এবং গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তার করে ছড়িয়ে আছে ত্রাস সৃষ্টিকারী
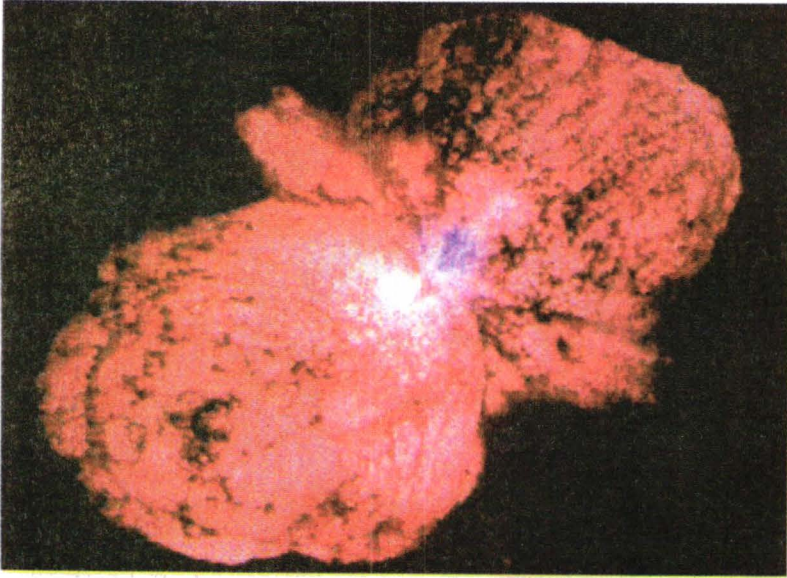
চিত্রঃ ১১১

"অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের ওপর অন্য কারো কোন প্রকার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই"। (৭২ ঃ ২৬)

– আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩০ থেকে ১০০ গুণ বড় নক্ষত্রসমূহ তাদের জীবনচক্র সমাপান্তে 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাকাশে বিরাট-বিশাল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উত্তপ্ত গ্যাস ও ধূলা-বালি দিয়ে, যা মহান স্রষ্টার মহান কীর্তির স্বাক্ষরই বহন করে চলেছে। এসবগুলোই ঘটছে দৃষ্টির আড়ালে।

ভয়ঙ্কর 'ব্ল্যাক হোল'গুলো। এরা আমাদের পুকুর বা দীঘিতে জীবন্ত মাছ রাঘব-বোয়ালের মত বরং তার চাইতেও বেশি ধ্বংস সাধনকারী, যার দ্বিতীয় কোন তুলনা-ই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই Black holeগুলো রাক্ষসী দৈত্যের মতো মহাকাশে আয়ত্বের মধ্যে যা-ই পায়, ছিঁড়ে-ফেঁড়ে অবিশ্বাস্য রকমের প্রচন্ড শক্তিতে গলাধকরণ করে সব সাবাড় করে দেয়। সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন যে আলোকরশ্মি সেও Black hole এর মৃত্যু ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, Black hole-এ পড়ে হারিয়ে যায়। যে কোন

বস্তু এই Black hole এর Horizontal event (হরাইজন্টাল ইভেন্ট)-এ পতিত হওয়ামাত্রই চিরদিনের জন্য এই 'মৃত্যুকুপে' হারিয়ে যায়। যেহেতু এই মৃত্যুকুপ থেকে কোন তথ্য, সংবাদ, আলামত কোন কিছুই বেরিয়ে
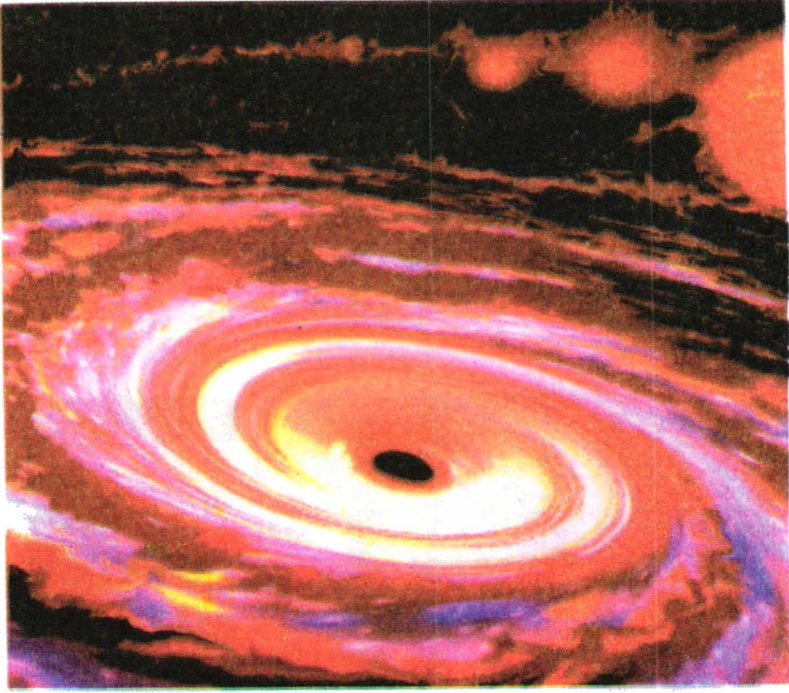
চিত্রঃ ১১২

"আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহের 'ধ্বংসপতন'স্থানের, অবশ্যই এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে"। (৫৬ ঃ ৭৫-৭৬)

–মহাকাশে মহাবিস্ময়সমূহের মধ্যে অন্যতম বিস্ময় 'ব্ল্যাক হোল'। রাঘব-বোয়ালের মত আশপাশের সকল নক্ষত্রকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে গলাধঃকরণ করে সাবাড় করে দিচ্ছে। দৃষ্টির অজান্তে সত্যিই এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আসতে পারে না, সে জন্যই এদেরকে Black hole নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ অভিকর্ষবলই (Gravitation) নেপথ্যে থেকে Black hole-এ সকল প্রকার অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটিয়ে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সৃষ্টির শুরুতে মহাকর্ষ পৃথক হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ে যে অনন্য অবদান

রেখেছে–ঠিক সেই রকমেই আবার মহাবিশ্বের ধ্বংসসাধনে যেন এই Black hole-কে কাজে লাগিয়ে গৌরবের আসনে সমাসীন হবে। এই অপ্রতিরোধ্য দুর্ধর্ষ অভিকর্ষবল (Gravitation) যার মহড়া যেন ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। মানবসমাজের অদৃশ্য এরকম বহু
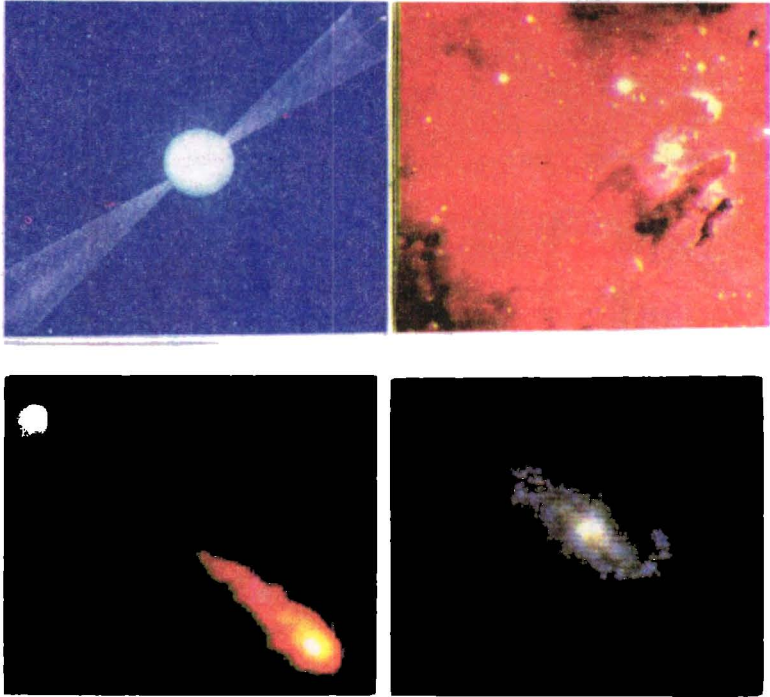
চিত্রঃ ১১৩
"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয় তিনি অজ্ঞানতা হতে অতি পবিত্র"।
(১০ ঃ ১৮)
– মানবমন্ডলীর দৃষ্টির বাইরে মহাকাশে সৃষ্টিকর্তার গুণ-কীর্তন করছে – নেবুলা, গ্যালাক্সী, কোয়াসার এবং নিউট্রন স্টার।

আশ্চর্য ধরনের বস্তু সমগ্র মহাকাশে বিরাজ করছে। 'কোয়াসার' নামক আরেক প্রকার মহাজাগতিক বস্তু মহাবিস্ময়ের সাথে মানবসমাজকে কথিত পরকালের জাহান্নাম নামক অগ্নিকুন্ড এই পার্থিব জীবনেই বাস্তবভাবে স্মরণ

করিয়ে দিচ্ছে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, একটি 'কোয়াসার'-এর আয়তন কয়েকটি সৌরজগতের সমান হলেও তারা কোটি কোটি নক্ষত্রের সমষ্টির সমান উজ্জ্বলতা ও তাপ ছড়িয়ে মহাকাশে যেন 'Flash light' এর কাজ সুনিপুণভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ খুবই আগ্রহের সাথে আবিষ্কৃত এই 'কোয়াসার' নামক অদৃশ্য জগতের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন ভবিষ্যতে আরো কৌতূহল সৃষ্টি করার মত তথ্য উদ্‌ঘাটনের আশায়।

এরপর মহাকাশের অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে 'ধূমকেতু' হচ্ছে আরেক প্রকার আশ্চর্যজনক জ্যোতিষ্ক। যাদের অনেকগুলোই কয়েক বছর বা কয়েক যুগ পর পর পৃথিবীর কক্ষপথ ছেদ করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমরা দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। ধূমকেতুর প্রকৃত আবাসস্থল হচ্ছে সৌরজগতের প্রান্তসীমায় 'Oort cloud' নামক মেঘপুঞ্জ। সেখানে এগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকলেও সৌরজগতের
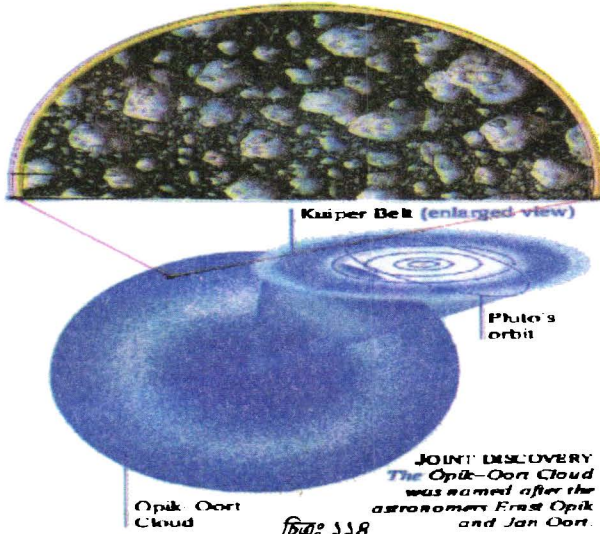
চিত্রঃ ১১৪

"অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে নেই সুক্ষ্মানু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছু, প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে"। (৩৪ ঃ ৩)

– পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য অথচ সৌরজগতের চতুর্দিকে ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন মাইল ব্যাপী ঝুলন্ত পাথরখন্ড বিস্তৃত হয়ে আছে, যা 'Opik Oort Cloud' নামে পরিচিত।

"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে মানুষ যা জানত না"। (৯৬ ঃ ৫)

বাসিন্দা বিধায় দীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বহুবছরের জন্য 'Oort cloud'-এর দিকে চলে যায়। 'হ্যালীর ধূমকেতু' এমনি একটি জ্যোতিষ্ক যা প্রতি ৭৬ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।
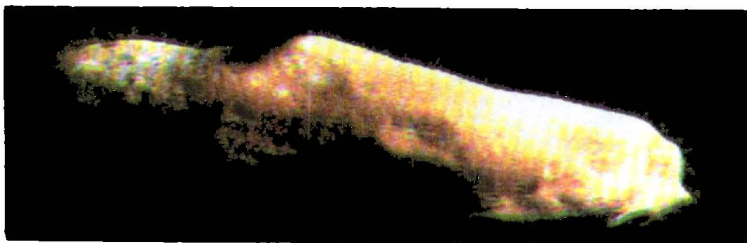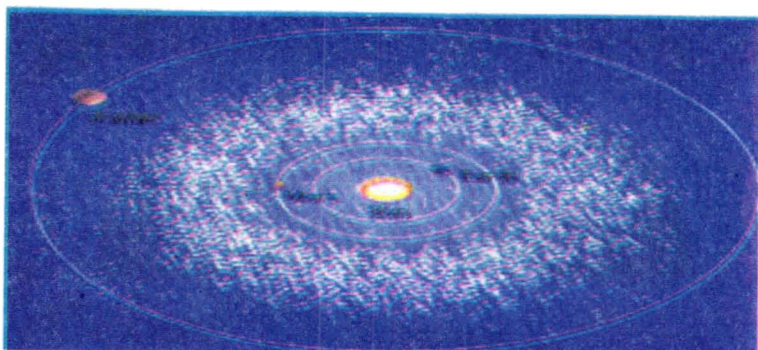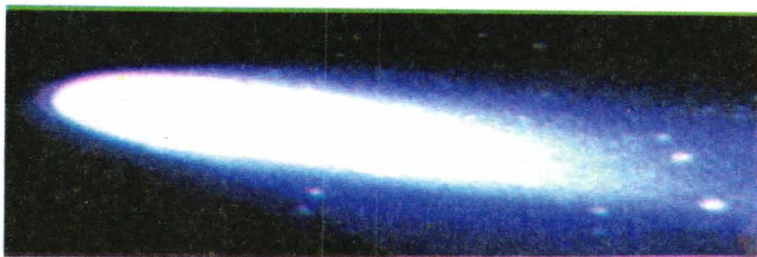
চিত্রঃ ১১৫
"তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছ, যিনি আকাশে রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথরবাহী-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না"? (৬৭ ঃ ১৭)
– ধূমকেতু ও পাথর দিয়ে মহাকাশ পরিপূর্ণ, ১ সেঃ মিঃ হতে ১০০০ কিলোমিটার ব্যাস পর্যন্ত অসংখ্য পাথর সবই মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির বাইরে। এদের একটির আঘাতই পৃথিবী ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

ধূমকেতুর আগমনে মানব মনে যেমনিভাবে আনন্দের ঢেউ জাগিয়ে তোলে, ঠিক তেমনিভাবে কিন্তু এরা কখনও পৃথিবীতে বিস্বাদের কালো ছায়াও বিস্তার করে দিতে পারে, যদি কখনও তাদের আগমন পৃথিবীর কক্ষপথ বরাবর হয় এবং একই তলে হয়। তাহলে উভয়ের মুখামুখী সংঘর্ষে পরস্পর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। ধূমকেতুগুলো প্রধাণতঃ কার্বন, কঠিন পদার্থ, শীলা ধূলা-বালি ইত্যাদি দিয়ে সৃষ্ট, পরবর্তীতে সমস্ত দেহ বরফ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এদের Tail বা লেজ ধূলা-বালি দিয়ে সৃষ্টি হয় বিধায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বলতা ছড়ায়। যে কারণে বহু দূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিজ্ঞানের ভাষ্যমতে অদৃশ্য জগতের মধ্যে 'গ্রহানু' নামক ভাসমান 'পাথর খন্ড'ও উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলগ্রহ এবং বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ জাতীয় অগণিত-অসংখ্য ভাসমান পাথর দিয়ে বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন যে, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে কোন গ্রহ পরিপূর্ণভাবে অস্তিত্ব ধারণ করতে না পেরে ভেংগে টুকরো হয়ে এই ভয়ানক পাথরের বেল্ট রচনা করেছে। এই ধারণার পেছনে যুক্তি হলো–এরা সৌরজগতের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের তুলনায় ক্ষুদ্র পাথরখন্ড হওয়ার পরও কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ না করে সরাসরি গ্রহদের ন্যায় সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই পাথরখন্ডগুলো প্রায় ১ সেঃ মিটার থেকে শুরু করে প্রায় ১০০০ কিঃ মিটার ব্যাস সম্পন্ন হতে পারে। আমরা প্রতিদিন রাতের বেলায় যে অগ্নিশিখাকে আকাশে ছুটে যেতে দেখি তা আসলে ছোট ছোট পাথর কুচি ছাড়া আর কিছুই না, যা বাতাসের সাথে ঘর্ষণজনিত তাপে পুড়ে গিয়ে থাকে এবং আমরা তাতে নিরাপদ থাকি। তবে বড় আকৃতির গ্রহানুগুলো পৃথিবীবাসীর জন্য সব সময়েই দুঃখের কারণ বয়ে আনে। শনি গ্রহের চারদিকেও অনুরূপ ঝুলন্ত পাথরের বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। মাত্র ১০০কিঃ মিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি পাথর খন্ডের উড়ন্ত আঘাত-ই আমাদের এই নয়নাভিরাম পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। এভাবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের বাসিন্দারূপে নিজেদের জীবন প্রবাহ চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সাফল্যজনক আবিষ্কারে আমরা আজ এই অদৃশ্য

জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে যেমন জ্ঞানলাভ করছি তেমনি তাদের অনেককে ছবিতে কিংবা টেলিস্কোপের মাধ্যমে দর্শন লাভ করে পুলকিতও হচ্ছি।

বর্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরে 'Hubble Space Telescope'-কে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে আরও অনেক মহাকাশীয়
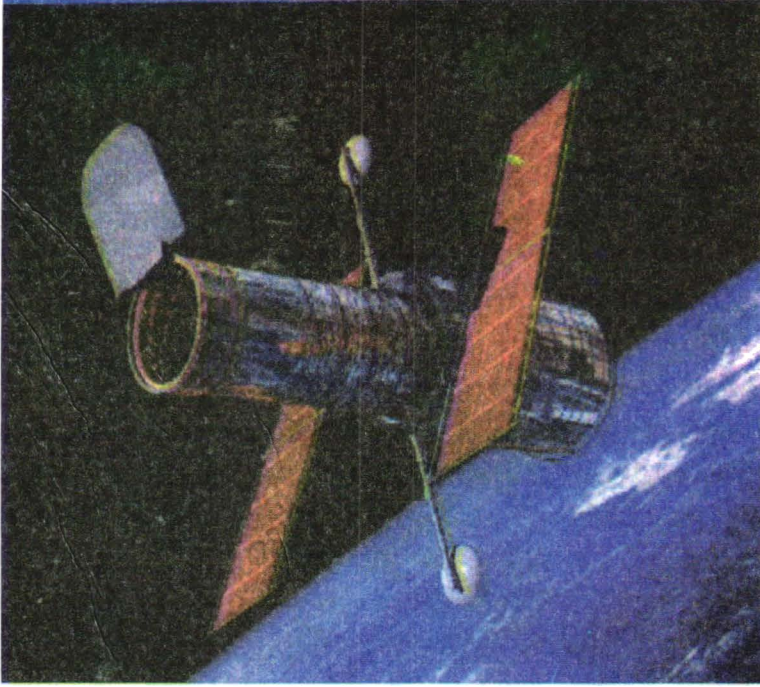
চিত্রঃ ১১৬

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করেন"। (২৭ ঃ ২৫)

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ ঃ ৭৩)

– 'হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ (HST) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ কিঃ মিটার উর্ধ্বে অবস্থান করে একের পর এক আবিষ্কারের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বাণীকে সত্যে প্রমাণিত করে চলেছে।

অদৃশ্যবস্তু ও জিনিসের তথ্য সরবরাহ করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই মহাজাগতিক আলোকরশ্মি (Cosmic rays) সম্পর্কে জানতে পেরেছি, যে আলোকরশ্মিগুলো আমরা দেখতে পাই না অথচ মহাকাশ পরিপূর্ণ হয়ে

আছে। এই মহাজাগতিক আলোকরশ্মিগুলো হচ্ছে গামা-রশ্মি (Gamma-rays), এক্স-রে বা রঞ্জন-রশ্মি (X-rays), অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra violet ray's), ইন্‌ফ্রারেড রেডিয়েশান (Infrared radiation) এবং
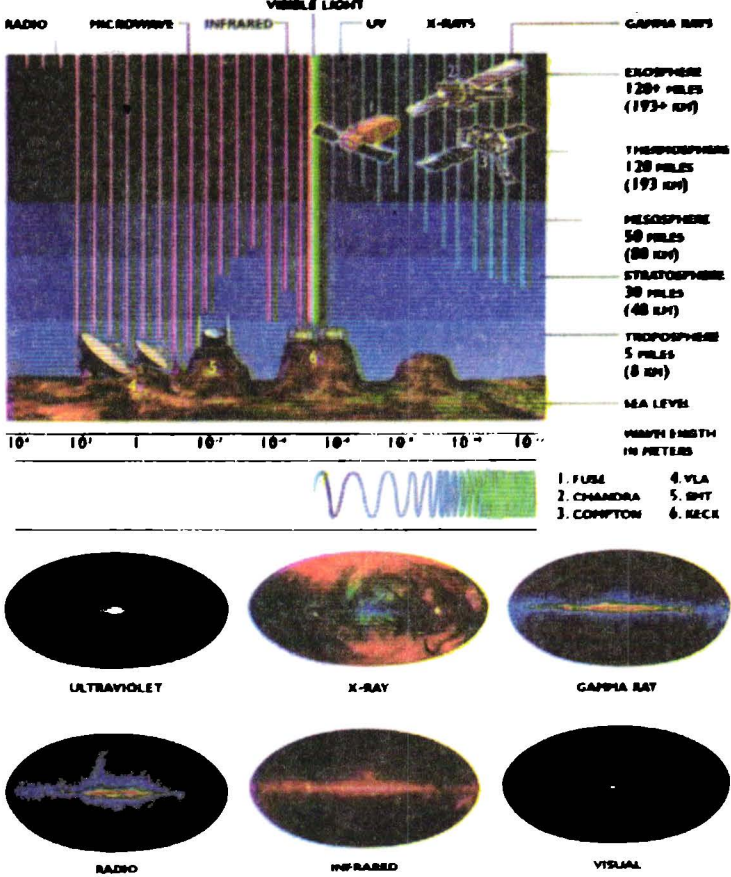
চিত্রঃ ১১৭

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু"। (৩২ ঃ ৬) – আকাশমন্ডলী পরিপূর্ণ হয়ে আছে মহাজাগতিক অদৃশ্য তেজস্ক্রীয়তা দিয়ে; যা প্রাণী ও জীবজগতের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর। এই তেজস্ক্রীয়তার (Radiation) ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবী আজ বিপন্নের সম্মুখীন।

দৃশ্যমান আলো (Visible light) । এই মহাজাগতিক রশ্মিগুলোর উৎস হচ্ছে বড় বড় নক্ষত্রসমূহের ধ্বংসবাশেষ থেকে জন্ম নেয়া 'নিউট্রন স্টার' ও 'ব্ল্যাক হোল' এবং আমাদের সূর্য। গামা-রশ্মি ও রঞ্জন-রশ্মির উৎসসমূহকে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রের দিকেই বেশি দেখা যায়। উক্ত রশ্মিদ্বয় খুবই শক্তিসম্পন্ন (Most energetic) যা প্রাণীদেহের ভিতর প্রবেশ করে দেহকোষকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারে। 'আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি' বা রেডিয়েশান কখনো কখনো 'Skin Cancer'-জন্ম দিয়ে থাকে। 'ইন্‌ফ্রারেড রেডিয়েশান' তেমন ক্ষতি করে না বরং প্রাণীকুলকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ সরবরাহ্‌ করে তাদের জীবনের স্পন্দন জারি রাখে। 'ভিজিবল লাইট'ও পৃথিবীপৃষ্ঠে সবার জন্য শুধু কল্যাণই বয়ে এনে থাকে। অদৃশ্য মহাজাগতিক এই রশ্মিগুলোর যেগুলো ক্ষতিকারক, সেগুলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে শোষিত হয়ে যাওয়ার কারণে প্রাণীকুলের ক্ষতি করতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর এই 'অদৃশ্য' আবিষ্কৃত মহাজাগতিক-রশ্মি (Cosmic ray's) সত্যই বড় আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর, যে সম্পর্কে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের কোন জ্ঞানই ছিল না, অধুনা তা আবিষ্কৃত হয়ে মানবসমাজকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে–'অণু'। বিজ্ঞান সেই অণুকে গবেষনাগারে ভেঙ্গে পেয়েছে পরমাণুকে। পরবর্তীতে পরমাণুকে ভেঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছে– ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহকে। উক্ত কণিকাসমূহের গঠন-প্রণালী সন্ধান দিল –'কোয়ার্কের' (যা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সৃষ্টির মূল উপাদান)। পরবর্তীতে এই 'কোয়ার্কের' মূল রহস্য খুঁজে বের করতে গিয়ে বিজ্ঞান অবিশ্বাস্যভাবেই প্রমাণ করলো– পদার্থের ভিত্তিমূলক সর্বশেষ উপাদান এই কোয়ার্কও নয়; বরং কোয়ার্ক নিজে আলোর ক্ষুদ্রতম অংশ 'ফোটন' দিয়ে গঠিত। তাই এই মহাবিশ্বের পদার্থের ভিত্তিমূলক মূল উপাদান হচ্ছে আলোর কণা 'ফোটন'। যদিও বর্তমান বিশ্বে এই আবিষ্কার প্রমাণিত সত্য এবং একবাক্যে সর্বজনস্বীকৃত, তথাপিও পরমাণুর পরবর্তী ধাপ থেকে এই সর্বশেষ মূল উপাদান 'ফোটন'

কণা পর্যন্ত সবটাই 'অদৃশ্য' যা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই মেনে নিয়ে বিজ্ঞান তার সামনের দিকে চলার পথ অব্যাহত রেখেছে।
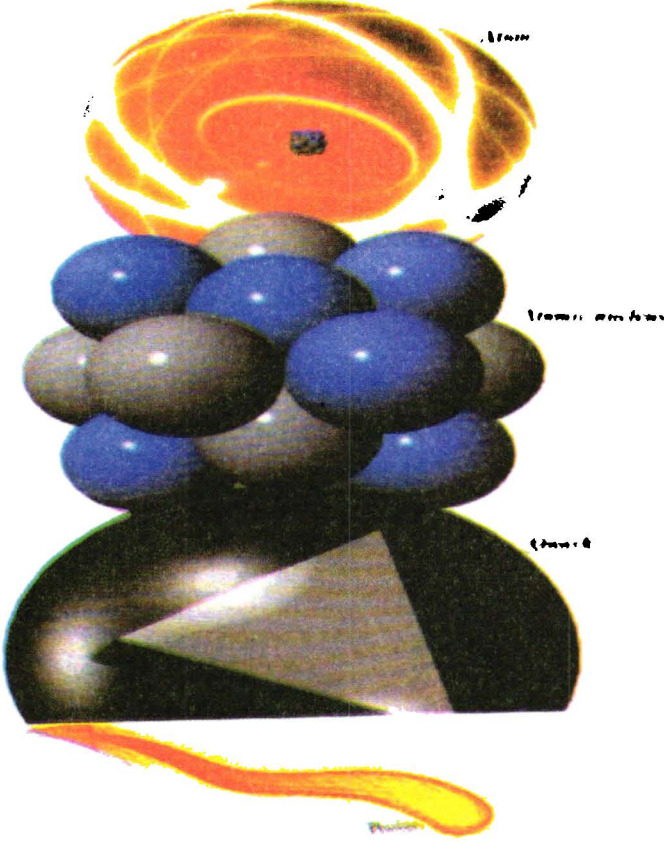
চিত্রঃ ১১৮

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য, তা সকলই আল্লাহ্‌র"। (১১ ঃ ১২৩)

"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানত না"। (৯৫ ঃ ৫)

– আলোর কণা 'ফোটন' থেকে বস্তুর কণা 'কোয়ার্ক'। পরে কোয়ার্ক তৈরী করে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' এবং প্রোটন ও নিউট্রন মিলিত হয়ে তৈরী করে পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস'। নিউক্লিয়াস পরে 'ইলেক্ট্রন' ধারণ করে সৃষ্টি হয় 'পরমাণুতে'।

বর্তমান বিজ্ঞান বিশেষ করে 'অদৃশ্য' জগতের অগণিত বস্তুসম্ভারের যে তালিকা মানবমন্ডলীর সামনে বাস্তবতার আলোকে বিস্তারিত তথ্যসহ পেশ করেছে, সেই একই তথ্য—জ্ঞানপূর্ণ ভাষণ আকারে আজ থেকে প্রায় এক হাজার চারশত বৎসর পূর্বে যে সূত্র মানবমন্ডলীর জ্ঞানের রাজ্যে সর্বপ্রথম পরশ বুলিয়ে গেছে তা-কি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? তা কি সুবিবেচনার দাবী রাখে না? জ্ঞানবান সমাজের জন্য তো ইশারাই যথেষ্ট।

এবার এক নজর দেখে নেই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই যা তোমরা অবগত নও" (১৬ ঃ ৮)	(১) ১৯২০ সাল পর্যন্ত 'মিঃ হাবেল পাওলের' পূর্বে পৃথিবীর মানুষ মাথার ওপরের দৃশ্যমান আকাশ ব্যতীত অন্যকিছু সম্পর্কে অবহিত ছিল না।
(২) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই।" (১৬ ঃ ৭৭) "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান রাখেন না।" (২৭ ঃ ৬৫) "অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের ওপর অন্য কারো কোন প্রকার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই।" (৭২ ঃ ২৬)	(২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অর্থাৎ, মহাবিশ্বের 'অদৃশ্য' লক্ষ-কোটি মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক সমূহের উপর সরাসরি মানুষের কোন জ্ঞান নেই। এ পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছে সাদামাটাভাবে, মহাবিশ্বের তুলনায় তা অনুল্লেখযোগ্যই বলা চলে। বস্তুতঃ মহাবিশ্ব এক মহাজ্ঞানের আঁধার, যার ওপরে মানুষের সামান্যতমও প্রভুত্ব নেই।

<table>
<tr>
<td>(৩) "নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কোন কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নেই।" (৩ ঃ ৫)

"তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু।" (৫৯ ঃ ২২)</td>
<td>(৩) ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের অনেক বিষয়ই মানুষ আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেও বলতে গেলে বিজ্ঞানের এখনও 'হাতে খড়ি' অবস্থা বিরাজ করছে। মহাকাশের মহাজ্ঞানের বাস্তবে কতটুকু মানুষ আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে– আগত দিনগুলিই তা বলে দিবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>(৪) "তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই।" (২৫ ঃ ৫৯)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য তা সকলই আল্লাহ্‌র।" (১১ ঃ ১২৩)

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয়টি সময়কালে।"
(৫০ ঃ ৩৮)</td>
<td>(৪) ভূ-পৃষ্ঠে মানবসভ্যতার জন্য ১৯২০ সাল 'ল্যান্ড মার্ক' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ঐ সময়ে 'ইডুইন হাবেল' থেকে শুরু করে পরবর্তীতে গ্রাউন্ড বেইছ টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের অদৃশ্য আরো অসংখ্য জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৯০ সালে পৃথিবীর বায়মুন্ডলের (প্রায় ৬০০ কিঃ মিটার) ওপরে 'Hubble Space Telescope', স্থাপন করার ফলে মহাকাশ যেন মানুষের দৃষ্টির সামনে তার গুপ্তরহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে। ফলে প্রায় প্রতিদিনই নিত্য-নতুন অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে যেমনঃ গ্যালাক্সী, গ্যালাক্সীগুচ্ছ, নেবুলা, নক্ষত্র, কোয়াসার, পালসার বা নিউট্রন স্টার, হোয়াইট ডর্‌ফ, রেড ডর্‌ফ, নোভা, সুপার নোভা, ব্ল্যাক হোল, কস্‌মিক-রে, রেড-জিয়েন্ট, সুপার-জিয়েন্ট, ডিপফিল্ড, অপিক-ওর্ট ক্লাউড, কমেট, এ্যাস্টিরয়েড ইত্যাদি।</td>
</tr>
</table>

	মানুষ এগুলোর কোনটিই সৃষ্টি করেনি বরং আবিষ্কারক মাত্র।
(৫) "আর এই সমস্তই অদৃশ্য জগতের (কথা) তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করছি, যা এর পূর্বে তুমি জানতে না কিংবা জানত না তোমার সম্প্রদায়।" (১১ : ৪৯) "কুরআন জ্ঞান চক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে ব্যক্তি দেখতে পেল সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল।" (৬ : ১০৪) "তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ : ৫) "তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ : ৫)	(৫) দীর্ঘদিন থেকেই বিজ্ঞান তার যাত্রা অব্যাহত (জারি) রাখলেও বাস্তবে কিন্তু বিংশ শতাব্দীই ছিল তার পূর্ণ যৌবন-কাল, যা এখনও বহাল আছে। ঐ সময়ে বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'অদৃশ্যবস্তু' মহাকাশে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। প্রায় প্রতিটি আবিষ্কার-ই ঘটেছে হঠাৎ করে, যদিও প্রচেষ্টা ছিল দীর্ঘদিন থেকেই, যেমনঃ Galaxy–1920 – 'Edwin Hubble'. Cosmic ray's – 1967 – 'US Spy Satellite'. Quasar–1963 – 'Maartea Schmidt'. Black hole – 1970 – 'UHORO Astronomical Satellite'. Oort cloud – 1950 – 'Jan Oort & Opik'. Neutron Star – 1967 – 'Jocelyn Bell Burnell'. Fresh Supernova – 1987 – 'Ian Shelton' ইত্যাদি।

(৬) "তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩) "হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার রব হতে মোহান্ধ করে রেখেছে?" (৮২ ঃ ৬)	(৬) মহাবিশ্বে অগণিত -অসংখ্য 'অদৃশ্যবস্তু'সমূহের মধ্যে যে কয়টি ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোই বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। অস্বীকার করার কোন পথ নেই। মহাকাশের 'অদৃশ্য' এক একটি আবিষ্কৃত বিষয় হতবাক করার মত এক একটি জ্ঞানের সাগর নিয়ে মানবমন্ডলীর সামনে ধরা দিয়েছে এবং উক্ত জ্ঞানের পিছনে 'অদৃশ্য' অথচ সক্রিয় কোন এক মহান সত্ত্বার উপস্থিতিও পরিস্ফুটিত হচ্ছে।

চির 'সত্যের' সামনে যারা নীরবে মস্তক অবনত করে, তারাই সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী। আগামী দিনগুলোতে বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রার কারণে আরো অসংখ্য 'অদৃশ্য' বস্তুসম্ভার মহাবিশ্বে আবিস্কৃত হয়ে বর্তমানের তুলনায় আরো ব্যাপক আকারে কুরআনের সত্যতার স্পষ্ট দলিলসমূহ মানবমন্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরবে এবং প্রমাণ করবে-"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ঃ৭৩)

হারিয়ে যাওয়া 'তারকাপুঞ্জ'

আল্-কুরআনঃ

"তিনি জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা হতে উদ্গত হয়, এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়।" (৩৪ঃ২)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য সকলই আল্লাহ্র।"

(১১ ঃ ১২৩)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্রই।"

(১৬ ঃ ৭৭)

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

(৩২ ঃ ৬)

"শপথ নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সীর) যারা পশ্চাদগমনে রত এবং যা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে (হারিয়ে) যায়।"(৮১ ঃ ১৫-১৬)

"শপথ ঐ তারকাপুঞ্জের, যখন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ ঃ ১)

"অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।" (১৬ ঃ ৬৭)

"আর এ সমস্ত অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করতেছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না কিংবা জানত না তোমার সম্প্রদায়।"

(১১ ঃ ৪৯)

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"'কুরআন' জ্ঞান-চক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে ব্যক্তি দেখতে পেল– সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল।" (৬ ঃ ১০৪)

উদ্ধৃত ৩৪ঃ ২, ১১ঃ ১২৩, ১৬ঃ ৭৭ ও ৩২ঃ ৬ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে অবহিত করছেন যে, মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি হোক, কোয়াসার হোক, অথবা হোক এই পৃথিবী বা অন্য কিছু এদের ভিতরে বাইরে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর মালিক তিনি, এবং সৃষ্টি কর্তাও তিনি। তাঁর জ্ঞানের বাইরে সামান্যতম বালু-কণাও নেই। বিরাট-বিশাল মহাবিশ্বের লুকায়িত অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল, অদৃশ্যের জ্ঞান আর কারো নেই। ৮১ ঃ ১৫-১৬ এবং ৫৩ ঃ ১ আয়াতসমূহে এই অদৃশ্য জগতেরই এক বিস্ময়কর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে "ঐ তারকাপুঞ্জের শপথ, যারা দ্রুত পশ্চাদগমনে রত, এবং যারা (মহাকাশে) ভেসে-ভেসে উড়ে চলে এবং দ্রুতগতিতে হারিয়ে যায় (দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়)"। উক্ত আয়াত ৩টি বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিগ-ব্যাংগ'-এরপর সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ও তথ্যবহুল এবং অচিন্তনীয় জ্ঞানের সমারোহ নিয়ে মানবজাতির কাছে ধরা দিয়েছে। আগামী হাজার-লক্ষ বছরের জ্ঞানের খোরাক সৃষ্টি করে মহাবিশ্বের অজানা-অচেনা সুদূর প্রান্তসীমানার দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, বিশ্বপ্রভুর আরো অগণিত-অদৃশ্য নতুন নতুন বিস্ময়কর সৃষ্টি অবলোকন করার জন্য, যে বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ সে জ্ঞান রাখেন না। ভাবতে সত্যই অবাক লাগে বিজ্ঞান ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বের মাত্র ১০ ভাগ (অনুমানকৃত) পর্যবেক্ষণ সীমানায় আনতে সক্ষম হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এই দূরত্ব কোন অবস্থাতেই ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশি নয়। আর কুরআনের দাবীকৃত তারকাপুঞ্জ ঠিক এই দূরত্বের পরেই প্রায় আলোর গতিতে হারিয়ে যাওয়া এবং সেই তথ্য বিজ্ঞানের হাতে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই মানবমন্ডলীকে অবহিত করা – এই 'চেইন অফ মিরাক্যালস্' (Chain of Mirracles) কি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালাকে পাঠকের সামনে এনে দাঁড় করায় না?

১৬ঃ ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে – এ ধরনের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে সত্য-সঠিক পথে চলে কেবলমাত্র সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিরাই। তারা বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং মূল শিক্ষনীয় বিষয়কে হাঁসিমুখে বরণ করে নেয়। ১১ ঃ ৪৯ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন–কুরআনের এইসব অদৃশ্য জগতের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব ও তথ্যসমূহ (যা ১৪০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে সর্বশেষ নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে) নবীসহ দুনিয়ার কোন মানুষই সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতো না। এগুলো অদৃশ্য জগতের তথ্য যার জ্ঞান শুধু সৃষ্টিকর্তারই নিকট সীমাবদ্ধ। তিনি যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কেবল ততটুকুই আবিস্কার করতে সমর্থ হয়, এর বেশি নয়। এবার আমরা বিষয়টি বিজ্ঞানের নিকট নিয়ে যেতে চাই। দেখি, তাদের বক্তব্য কি?

বিজ্ঞানঃ

১৯২০ সালে 'ইডুইন হাবেল' মানবমন্ডলীর সামনে আশ্চর্য করার মত বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করলেন – তিনি বললেন, আমরা একটা গ্যালাক্সীর অধিবাসী। এই গ্যালাক্সীতে আমাদের সূর্যের মত নক্ষত্র রয়েছে প্রায় ২০,০০০ কোটির উপর। উল্লেখিত নক্ষত্রসমূহ যে জায়গা জুড়ে মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে–তার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত আলোর গতিতে (অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে) ভ্রমণ করলেও প্রায় এক লক্ষ বছর লেগে যাবে। মহাকাশে এই নক্ষত্র শহর বা গ্যালাক্সীগুলো একা একা অবস্থান না করে বেশ কয়েকটি পাশাপাশি অবস্থান করে গুচ্ছাকৃতি হয়ে থাকে। আমাদের গ্যালাক্সী যে গুচ্ছের, সে গুচ্ছে সর্বমোট প্রায় ছোট-বড় ৩২টি গ্যালাক্সী আছে। আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সীর নাম 'এ্যান্ড্রোমিডা' (Andromeda)। এই 'এ্যানেড্রামিডা' গ্যালাক্সী আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। তার নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ কোটির মত। ব্যাস প্রায় দেড় লক্ষ আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সীদের তৈরী গুচ্ছকে 'ক্লাস্টার' (Cluster) বলা হয়। আবার

অনেকগুলো ক্লাসটার পাশাপাশি অবস্থান করে Super cluster তৈরী করে।

চিত্রঃ ১১৯

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য তা সকলই আল্লাহ্‌র।" (১১ ঃ ১২৩)

– লোকাল গ্রুপে আমাদের 'মিল্‌কি-ওয়ে' গ্যালাক্সীর নিকটতম প্রতিবেশী গ্যালাক্সী 'এন্ড্রোমিডা', যার ভিতর প্রায় ৩০,০০০ হাজার কোটির মত নক্ষত্র বাস করে। আমাদের গ্যালাক্সী থেকে এর দুরত্ব প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ আলোকবর্ষ।

এ পর্যন্ত জানা Super cluster সমূহের মধ্যে 'Hercules cluster' সর্ব বৃহৎ, যার গ্যালাক্সী এবং উপ-গ্যালাক্সীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১০,০০০ -এর মত। পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী আবিস্কৃত হয়েছে মানুষের পর্যবেক্ষণকৃত সর্বশেষ ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত। আর বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে– পর্যবেক্ষণকৃত এই ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ মূল মহাবিশ্বের মাত্র ১০ ভাগ, অনুমানকৃত নব্বই ভাগ এখনো মানুষের জ্ঞানের বাইরে।

'ইডুইন হাবেল' ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে এই দৃশ্য গ্যালাক্সীদের আকার-আকৃতি, গঠন, উপাদান ও
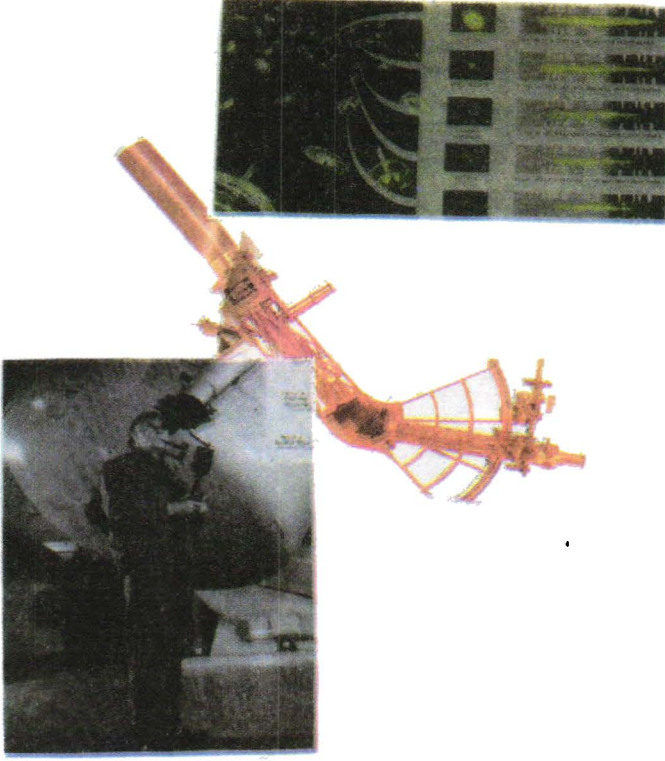
চিত্রঃ ১২০

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই।" (১৬ ঃ ৬৭)
– বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই 'টেলিস্কোপ'এর সাথে 'স্পেকট্রোস্কোপি'-র একত্রিকরণ মহাকাশের হাজারো গোপন রহস্যের প্রকাশ ঘটিয়ে দিল। মহাজাগতিক বস্তুসমূহের উপস্থিতিই শুধু মানুষ অবহিত হল না, সাথে সাথে 'বর্ণালী বীক্ষণের' মাধ্যমে তাদের অজানা অনেক তথ্যই লাভ করতে সক্ষম হলো। ওপরে গ্যালাক্সীদের পশ্চাদপসরণ দেখা যাচ্ছে।

তাদের চলার গতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাসের কাজ সমাধা করেন। ১৯২৯ সালে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্যালাক্সীর উপর স্পেকট্রোস্কোপির (Spectroscopy) সাহায্যে 'রেড ও ব্লু শিফ্‌ট' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফলে তিনি দেখতে পান যে, দূরের প্রতিটি গ্যালাক্সী

আশ্চর্যরকমভাবে 'রেড্ শিফ্‌ট' প্রদর্শন করে যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের থেকে অধিকতর দূরবর্তী গ্যালাক্সী অধিকতর দ্রুতগতিতে অসীমের পানে কেবলই উড়ে যাচ্ছে। তিনি $V=\frac{D}{T}$ (D = দূরত্ব, T= সময় এবং V= গতিবেগ) এই সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পর প্রতি সেকেন্ডে গ্যালাক্সীসমূহের গতিবেগ প্রায় ৫০ মাইল হারে বেড়ে যায়। এই সূত্রমতে ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সী প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪৫,০০০ মাইল বেগে মহাবিশ্বের অজানা ঠিকানার দিকে উড়ে যাচ্ছে। আবিষ্কৃত 3C–295 গ্যালাক্সীটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল বেগে আমাদের নিকট থেকে গভীর মহাবিশ্বে হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তির সর্বাধুনিক টেলিস্কোপ (Telescope) দিয়ে
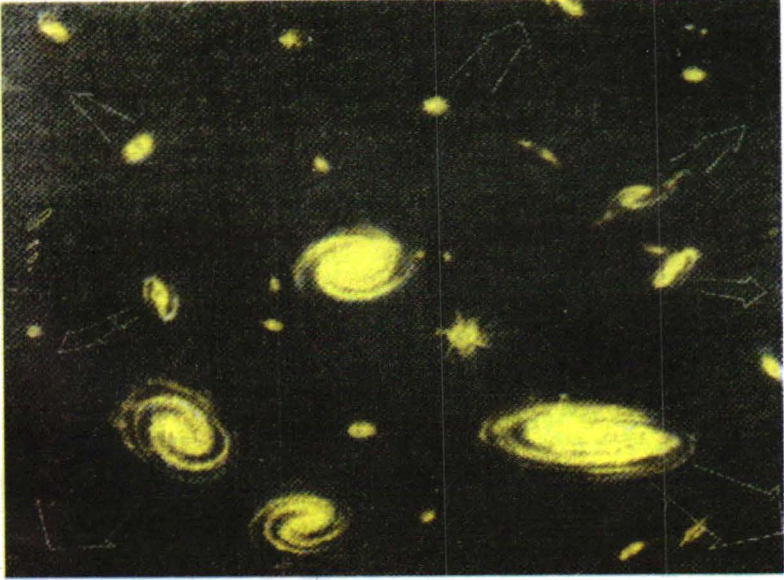
চিত্রঃ ১২১

"শপথ নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সীর) যারা পশ্চাদগমনে রত এবং যারা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ ঃ ১৫-১৬)

– বিশ্ব নিয়ন্তার বিস্ময়কর অবদানঃ গ্যালাক্সী আকারে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে প্রচন্ড গতিতে ঘূর্ণনরত অবস্থায় ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে একে টিকিয়ে রেখেছেন। প্রতিটি গ্যালাক্সী নিজস্ব গতিবেগে ছুটে যাচ্ছে গন্তব্যের পানে, এক ও একক মহা শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী 'আল্লাহ্‌র' গোলামী প্রদর্শনের জন্য।

বিজ্ঞানীগণ সর্বশেষ দৃশ্যসীমা ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত গ্যালাক্সী, কোয়াসার ইত্যাদি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে বিজ্ঞানীরা যে কোয়াসার আবিষ্কার করেন, তার নাম দেন OQ-172, এই কোয়াসারটি (OQ-172) উল্লেখিত দূরত্বে প্রায় আলোর গতির সমান গতিতে আমাদের থেকে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। কোথায়, কি উদ্দেশ্যে হারিয়ে যাচ্ছে – এর কোন জবাব অবশ্য এখনও বিজ্ঞান জানে না, বরং বিজ্ঞানেরও আজকে একই প্রশ্ন 'Where are we going'?
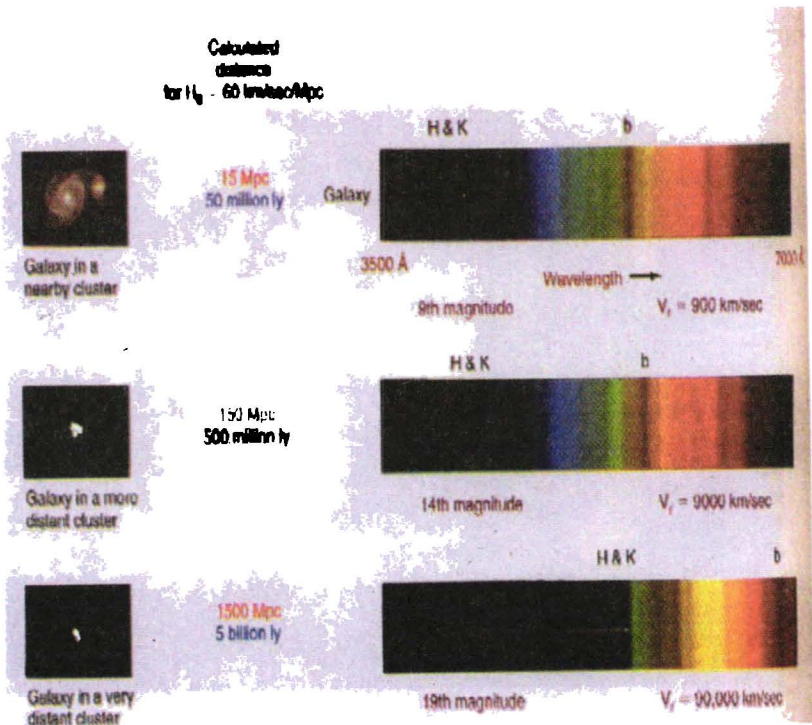
চিত্রঃ ১২২

"অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।"
(১৬ ঃ ৬৭)

– বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রে (Spectroscopy-তে) গ্যালাক্সী থেকে আগত আলোর ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিফলন (রেড ও ব্লু-শিফ্ট) ভিন্ন-ভিন্ন দূরত্বে তাদের অবস্থান এবং সাথে সাথে তাদের গতিও নির্দেশ করছে।
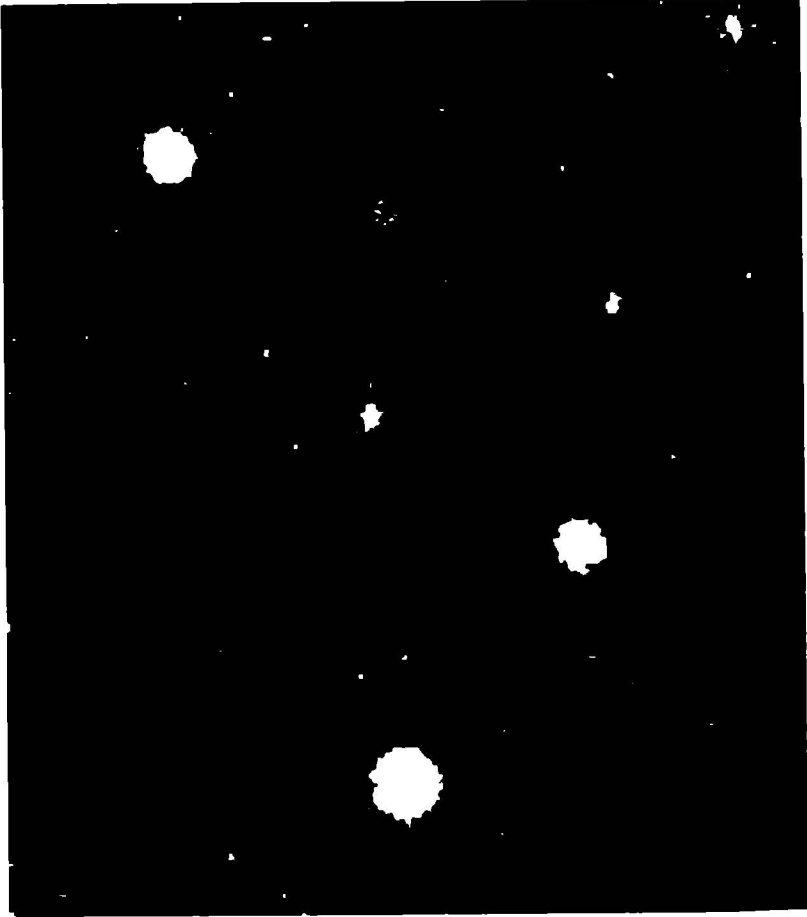
চিত্রঃ ১২৩
"শপথ ঐ তারকাপুঞ্জের (গ্যালাক্সরী) যখন ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ : ১)
– পৃথিবী থেকে প্রায় ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে অর্থাৎ, বস্তুজগতের প্রায় শেষ সীমানার দিকে পৌঁছে যাওয়া বিন্দুবত 'কোয়াসার - 4C41. 17' (Radio Galaxy). '10-m. Kack Telescope' দিয়ে উক্ত ছবি ধারণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান তার প্রতিনিয়ত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিস্ময়কর অচিন্তনীয় তথ্য সরবরাহ করেছে যে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দর্শনযোগ্য প্রায় সর্বশেষ প্রান্তসীমা ১৩,০০০

মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে যে কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে, তা মহাকাশে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে আলোর গতিতে (প্রায়) আমাদের দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে
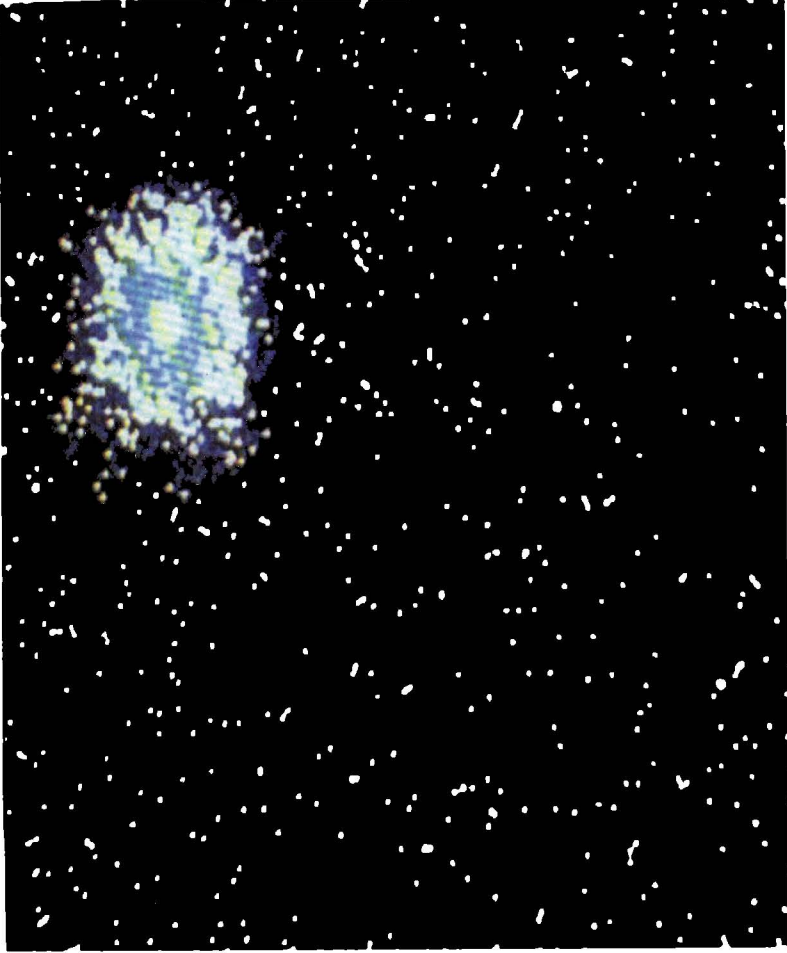
চিত্রঃ ১২৪

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

– আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীকুলকে অভিভাদন জানিয়ে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 'কোয়াসার 3C-273' (Radio Galaxy) প্রায় ৪৫,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে।

যাচ্ছে। এই কোয়াসারটি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটা প্রমাণ করে যে, এর পূর্বে আরো অগণিত গ্যালাক্সী, কোয়াসার বা অন্য কিছু একই গতিতে মহাবিশ্বে হারিয়ে গিয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতেও একই ধারা হয়তো বজায় থাকবে।
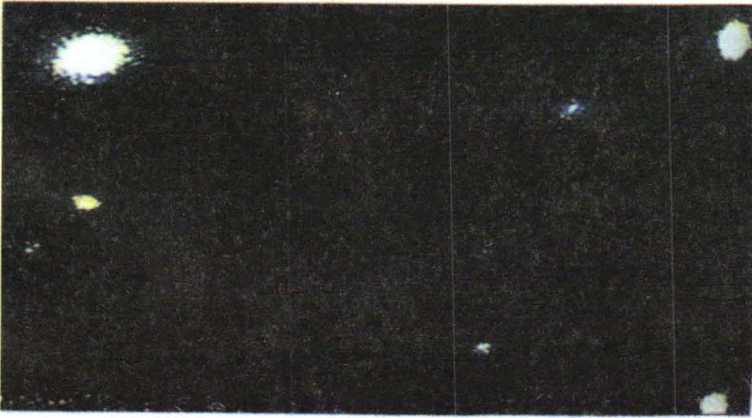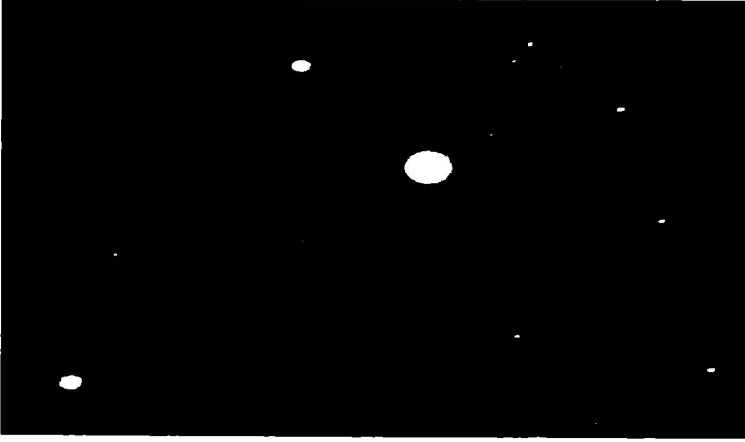
চিত্রঃ ১২৫

"শপথ নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সীর), যারা পশ্চাদপসারণে রত এবং যারা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ ঃ ১৫-১৬)

–পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বে অর্থাৎ, বস্তুজগতের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া 'কোয়াসার OQ-172' (রেডিও গ্যালাক্সী) আর স্বল্প সময় পরেই হয়তবা অদৃশ্য হয়ে যাবে আলোর গতি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ।
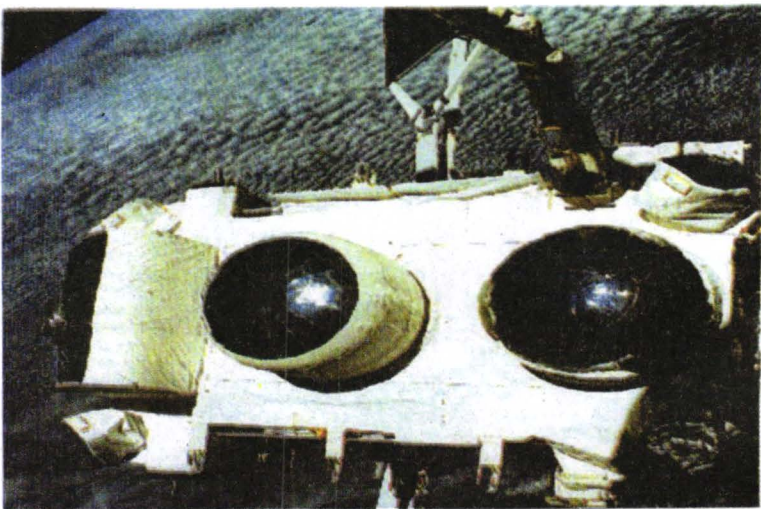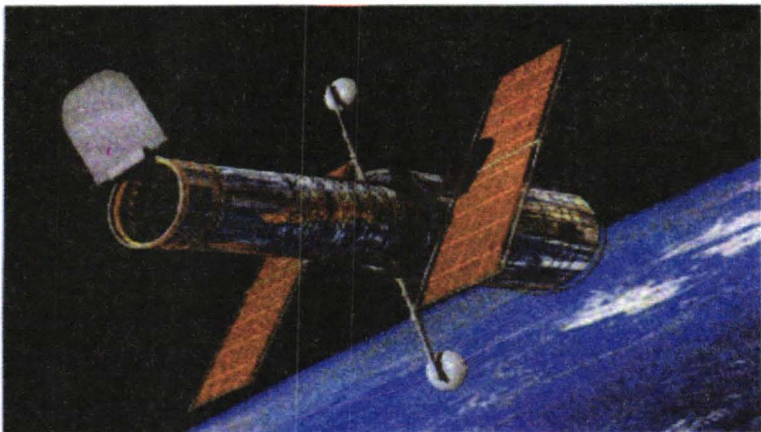
চিত্রঃ ১২৬

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)
– বিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট উন্নততর প্রযুক্তি 'Hubble Space Telescope' এবং 'Compton observatory', যা মহাশূন্যে অবস্থান করে মহাকাশের ছবি গ্রহণের মাধ্যমে 'কুরআনের' বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহকে সত্যায়ন করে চলেছে।
"তোমরা ধাপে-ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

এবার পুরো বিষয়টিকে পাশাপাশি গুছিয়ে আনলে যা হয়, তা 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তিনি (আল্লাহ্) জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা হতে উদ্গত হয় এবং যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়।" (৩৪ : ২) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্রই।" (১৬ : ৭৭) "তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।" (৩২ : ৬)	(১) বিজ্ঞান তার নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়ম এবং পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যতটুকু আবিষ্কার করতে বা উদঘাটন করতে সমর্থ হয়, কেবল ততটুকু সম্পর্কে-ই সে বলতে পারে বা তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এই নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে বিজ্ঞান বালু-কণা সমান বস্তুরও জ্ঞান রাখে না। অনাবিষ্কৃত জগত সম্পর্কে বিজ্ঞান একেবারেই অন্ধ। আর এটাই স্বাভাবিক।
(২) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্টির অগম্য সকলই আল্লাহ্র।" (১১ : ১২৩)	(২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অর্থাৎ মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য কোন কিছুরই মালিকানা বিজ্ঞান দাবী করে না। যা দাবী করে– তা হলো শুধু আবিষ্কারের। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তা নয় বরং আবিষ্কারক।
(৩)"শপথ ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের, যখন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ : ১)	(৩) 'Edwin Hubble' ১৯২৯ সালে তারকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সীদের ওপর Spectroscopy–র সাহায্যে Red ও Blue

"শপথ নক্ষত্রসমষ্টির (গ্যালাক্সীর) যারা পশ্চাদপসরণে রত এবং যারা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ঃ১৫-১৬)	shift নিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে মহাবিশ্বে প্রতিটি গ্যালাক্সি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সী প্রায় ৪৫০০০ মাইল/সেকেন্ড বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' (Radio galary) 3C-295 প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল বেগে মহাকাশে হারিয়ে যাচ্ছে। আরো গভীরে অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' OQ-172 প্রায় আলোর গতি লাভ করে অজানার উদ্দেশ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। Hubble Space Telescope এবং Cobe Satellite দিয়ে বিজ্ঞানীগণ তা পর্যবেক্ষণ করছেন।
(৪) "এই সমস্ত অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করছি, যা এর পূর্বে তুমি জানতে না কিংবা জান্‌ত না তোমার সম্প্রদায়।" (১১ঃ৪৯)	(৪) মহাকাশের অদৃশ্য এই মহাজাগতিক বস্তুসম্ভার (জ্যোতিষ্ক-সমূহ) সম্পর্কে পূর্বে মানবজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণরূপে অন্ধ (Blind)। বিজ্ঞানের সাফল্যজনক ও বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত উন্নতির চরম উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তবেই মানুষ মহাকাশের বিশাল রহস্যের যৎ সামান্যই উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র।

(৫) "তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫) "তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ ঃ ৫৭)	(৫) বিজ্ঞান তার নিজস্ব পরিকল্পনায় মহাবিশ্বের সকল ব্যাপারেই প্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা. পর্যবেক্ষণ. অনুসন্ধান জারি রেখে অধ্যবসায়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে নব আবিষ্কারের সৌরভে উদ্ভাসিত করার মানসে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি আবিষ্কারই হঠাৎ করে ঘটেছে এবং বিজ্ঞানীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। কোন কোন বিষয় স্বল্প সময়ে উদঘাটিত হয়েছে. কোনটি দীর্ঘ সময়ে ঘটেছে এবং কোন কোনটি দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও হয়নি। আবিষ্কারের পিছনে কোন এক মল শক্তি যেন অদশ্যে থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।
(৬) "তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩) "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। এটা মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)	(৬) মানুষের স্বাভাবিক দষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে. একথা পর্বে মানষ মেনে নিতে অস্বীকতি প্রকাশ করলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের সাফল্যজনক আবিষ্কারের কারণে অদশ্য মহাজাগতিক বস্তু ও জ্যোতিষ্কসমহকে মেনে নিয়েছে বাস্তবতার সোনালী আভায়। সতরাং পর্বে কোন সত্র যদি উল্লেখিত আবিষ্কত অদশ্য বস্তসমহের তথ্য পরিবেশন করে থাকে. তাহলে নিঃসন্দেহে তা জ্ঞানের মাপকাঠিতে 'সত্যতার

	আসনে' নিজ থেকেই প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নিতে হবে। এটাই জ্ঞানের দাবী।
(৭) "অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।" (১৬ ঃ ৬৭) "কুরআন তোমাদেরকে জ্ঞান-চক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি দেখতে পেল – সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল।" (৬ ঃ ১০৪)	(৭) বিজ্ঞান সত্য সুন্দর ও শৃংখলাবদ্ধ পথে চলে বিধায় তার আহ্বানও একই পথ নির্দেশ করে থাকে, কিন্তু মানবমন্ডলীর অধিকাংশ মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারে না। সত্যি এ এক বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

অতএব, অনুভবের সীমানায় একটি প্রশ্ন রেখেই অধ্যায়টির ইতি টানছি, মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমানায় তারকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সীসমূহ যে অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে; ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'কুরআনের' সেই তথ্য সরবরাহ এবং বর্তমান বিজ্ঞানের একই বিষয়ক আবিষ্কারের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

ইন্‌শাআল্লাহ্ হারিয়ে যাওয়া 'তারকাপুঞ্জের' পরবর্তী অবস্থা আমরা 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজ-২, 'কুরআন, কিয়ামত ও পরকাল' খন্ডে জানতে পারবো।

'নক্ষত্র ধ্বংসস্থান' (Black hole)

আল্-কুরআনঃ

"তারা কি সুক্ষ্ম সতর্কতার সঙ্গে কুরআনকে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন উৎস হতে অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই তারা এতে পেত বহু অসংগতি ও সামঞ্জস্যহীনতা।" (৪ ঃ ৮২)

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁর বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ে অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

"তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না?" (২৩ ঃ ৬৮)

"শপথ সে 'পতনস্থানের।' যেখানে নক্ষত্রসমূহ 'ধ্বংসপ্রাপ্ত' হয়। যদি তোমরা জানতে, উহা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ।" (৫৬ ঃ ৭৫-৭৬)

"এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

"বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হল বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৬)

"তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক ! সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যাতীত আর কি আছে? তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ?" (১০ ঃ ৩২)

"নিশ্চয় আমি আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করছি, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ সেদিন শুধু বলবে হায়! আমরা যদি মাটির সংগে মিশে যেতাম !" (৭৮ ঃ ৪০)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পবিত্র বাণী সম্বলিত শুধু একটি গ্রন্থ-ই নয়, বরং সাথে সাথে বর্তমান আশীর্বাদপুষ্ট বিজ্ঞানের জননীও বটে। বর্তমান বিজ্ঞান যে বিষয়গুলো আবিষ্কার করে দুনিয়া জোড়া মা'ত করেছে এবং গৌরবের আসনে উপবিষ্ট হয়েছে, সেই বিষয়গুলো বিজ্ঞান উদ্‌ঘাটন করে মানবমন্ডলীর সামনে মেলে ধরার ১৪০০ বৎসর পূর্বেই গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম পরিমিতি বজায় রেখে কত নিখুঁত ও সঠিক পর্যায়ে ঐ একই বিষয়গুলোর তথ্য কুরআনের পাতায় সোনালী অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রখর সূর্যের কিরণের ন্যায় বিশ্বাবাসীর সামনে ঝল্-ঝল্ করছে।

৪ঃ ৮২ আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে বলিষ্ঠভাবে, মানবসমাজ কি সুক্ষ্ম-সতর্কতা ও বিবেচনার সাথে 'আল্-কুরআন' এর বাণী সমূহকে বুঝার চেষ্টা করে না? এই যে সত্য-সঠিক তথ্যসমূহ—যা আবিষ্কারের পূর্বে গোটা

মানব সমাজেরই অজানা-অদৃশ্য এবং অচিন্তনীয় ছিল, তা প্রমাণিত হয়ে দৃষ্টিসীমায় আগমন করার পরও কি এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তারা সন্দিহান থাকবে? একাধিক প্রভু থাকলে কি এ ধরণের শৃংখলা-পরিমিতি, নিয়ম-কানুন, ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যশীলতা বজায় থাকা সম্ভব ছিল? উল্লেখিত তথ্য, অবস্থা, চিহ্ন ও জ্ঞানের অসংখ্য সমারোহ একজন 'সৃষ্টিকর্তা' মহাজ্ঞানী সত্ত্বার বর্তমান থাকা কি প্রমাণ করে না? ৬ ঃ ১১৫ আয়াতে তিনি সমগ্র মানবসমাজের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন এই বলে যে, কুরআন মনীষার প্রত্যেকটি পবিত্র বাণী সম্পূর্ণরূপে সত্য-সঠিক ও ন্যায়সংগত, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে একটি বাণী বা তথ্যকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারা যায় কি-না? তা কখনোই পারা যাবে না; বরং যতই চেষ্টা করা হবে ততই বিশ্ববাসীর সামনে ধ্রুব সত্যে প্রমাণিত হয়ে এক ও একক, অদ্বিতীয়, মহাজ্ঞানী ও শক্তিশালী সত্ত্বা 'আল্লাহ্‌র' অস্তিত্বই কেবল প্রকাশিত হতে থাকবে। কারণ তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সবই তাঁর জ্ঞানে পরিবেষ্টিত। আর তিনি তাঁর সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমরোহ ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর উপস্থাপিত পবিত্র সত্য বাণীসমূহ মিথ্যা প্রমাণ করার প্রশ্নই আসে না; বরং বিজ্ঞানের বদৌলতে যুগে যুগে শুধু একই ডিরেক্শানে অর্থাৎ, 'সত্য-সঠিক' পথে তাঁর বাণীসমূহ প্রমাণিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকবে। ২৩ঃ৬৮ আয়াতে আফ্‌সোসের সাথে সেই আল্লাহ্‌ বিমুখ লোকদের সম্পর্কে বললেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বহণকারী এই বাণীগুলো কি তারা বিবেক দিয়ে যাচাই-বাছাই করে অনুধাবনের চেষ্টা করে না? কি জিনিস তাদেরকে সে পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে?

৫৬ঃ৭৫-৭৬ উক্ত দুটি আয়াতে বক্ষমান অধ্যায়ের মূলবিষয়ের উপর গুরুতর সংবাদ প্রদান করলেন, "আমি শপথ করছি সেই পতনস্থানের, যেখানে তারকাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তোমরা জানতে, এটা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ।" উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে হতবাক করার মত বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করা হয়েছে। কারণ, দৃশ্য বস্তুদের মধ্যে আমরা সূর্যকেই (নক্ষত্রকে) মোটামুটি বড় বস্তু হিসাবে জানি। কিন্তু এদের মৃত্যু, ধ্বংস-পতন বা লয় সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান পূর্বে লাভ করিনি। কুরআনই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান সরবরাহ করেছে। কুরআন মনীষা এই বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র বা সূর্যের চূড়ান্ত ধ্বংস বা পরিণতির জন্য অবিশ্বাস্য যে মৃত্যু ফাঁদ বড়ই আশ্চর্য ধরনের, যা সর্বকালেই মানবমন্ডলীকে হতবাক করতে থাকবে তা অবহিত করেছেন। লক্ষ-লক্ষ মাইল ব্যাসের বিরাট-বিশাল নক্ষত্রসমূহ এই মৃত্যুফাঁদের কাছে খুবই অসহায়, খুবই নগণ্য। প্রচন্ড ধ্বংসলীলার এই পতনস্থান যা নিমিষেই গোটা

বস্তুটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, মুহূর্তের মধ্যে বস্তুটি অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। পুরো নক্ষত্রটি কোথায় হারিয়ে যায়, যার খবর কেউ জানে না। কিয়ামতের মহাধ্বংসের খবরের পর এতবড় দুর্ঘটনার খবর মানুষের জ্ঞান রাজ্যে আর একটিও পৌঁছেনি। ১০ ঃ ১ আয়াতে বলা হয়েছে – এ ধরনের তথ্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন, যাদের জ্ঞান আছে এবং যারা সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়, তাদের জন্য এতে সঠিক নিদর্শন বর্তমান আছে। ২২ ঃ ৪৬ আয়াতে তাদের কথা আনা হয়েছে–যারা এত বিস্ময়কর, সাড়া জাগানো, চমকপ্রদ ও অদৃশ্য জগতের বৈজ্ঞানিক তথ্য অবহিত হওয়ার পরও মহাসত্যকে না দেখার ভান্ করে, তারা সত্যিকার অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো তাদের অন্তরচক্ষু-বক্ষস্থিত হৃদয়।
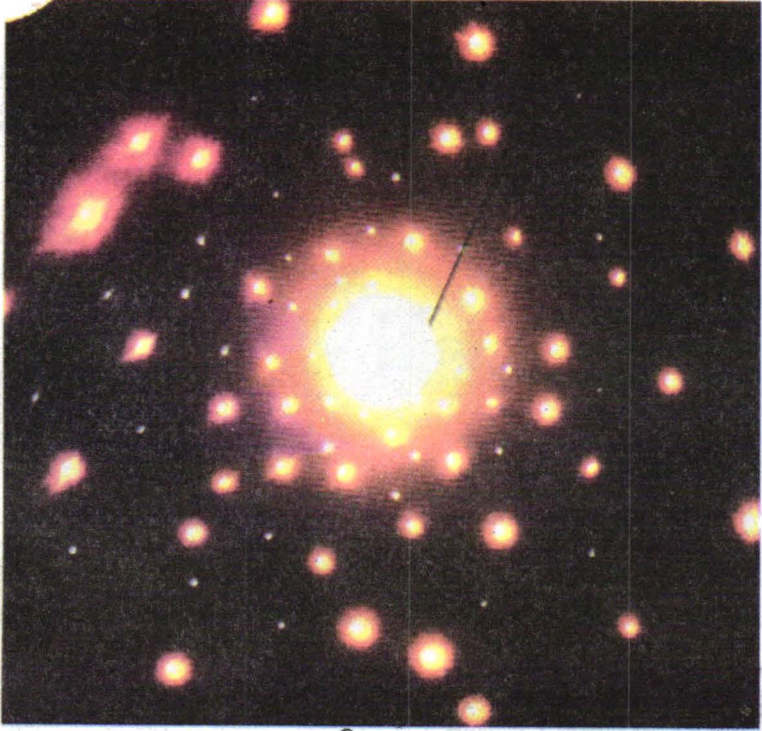
চিত্রঃ ১২৭

"শপথ সেই 'পতনস্থানের', যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদি তোমরা জানতে; উহা অবশ্যই এক মহাগুরুত্বপূর্ণ শপথ!" (৫৬ ঃ ৭৫-৭৬)

– মহাকাশে মহান স্রষ্টার বিস্ময়কর কীর্তির জীবন্ত স্বাক্ষর (নিদর্শন) 'ব্ল্যাকহোল'। এই নক্ষত্র পতনস্থান তার চতুস্পার্শ্বের শত-সহস্র নক্ষত্রকে গিলে খাওয়ার জন্য ক্রমান্বয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত অসংখ্য 'নক্ষত্র মৃত্যুকূপ' বা 'ব্ল্যাক হোল' মহাকাশে আবিষ্কৃত হয়েছে।

১০:৩২ আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ লোকদেরকেই বলা হয়েছে– 'তোমরা চাও বা না চাও, পছন্দ কর অথবা না কর, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনিই কিন্তু মহাবিশ্বের একমাত্র আল্লাহ্, একমাত্র প্রভু যিনি অদৃশ্যে থেকে তোমাদেরকে লালন-পালনসহ সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা করে চলেছেন। তাঁকে ত্যাগ করে অন্য যে পথেই যাবে, অগ্রসর হবে; সকল পথই কিন্তু বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত–যার পরিণতিই হচ্ছে চূড়ান্ত ধ্বংস। অতএব সত্য জিনিসকে গ্রহণ না করে তোমরা কোন পথে ছুটে চলেছ, তা কি একবারও যাচাই করে দেখবে না?
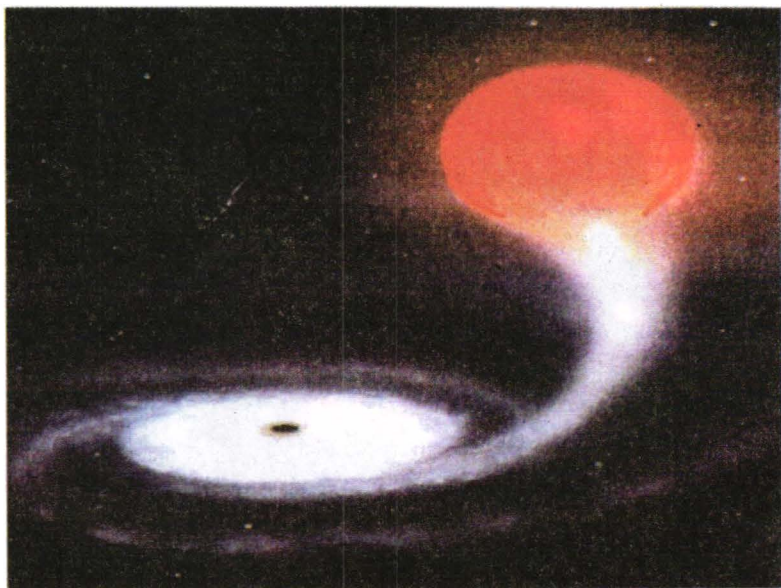
চিত্রঃ ১২৮
"বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হল বক্ষস্থিত হৃদয়!" (২২ ঃ ৪৬)
বিজ্ঞানের বদৌলতে Telescope দিয়ে 'ব্ল্যাক হোলের' কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেও কি 'কুরআনের বৈজ্ঞানিক দাবীকে' আর অস্বীকার করা চলে?

চলন্ত পথের শেষ কোথায়, তা না জেনেই কি দৌড়াতে থাকবে?' অত:পর ৭৮:৪০ এই শেষ আয়াতটিতে সতর্ক-সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কখনই কল্যাণ লাভ করার অধিকারী হতে পারে না, বরং চূড়ান্ত শাস্তি তাদের একমাত্র প্রাপ্য, যা সুস্থ-সবল এবং জ্ঞানবান সবাই

একবাক্যে স্বীকার করে। আর এটাই বিচারের স্বাভাবিক দাবী। তাই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে সকল চাহিদা পূরণ করার পর, সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার পর, সকল প্রকার নিদর্শন চতুর্দিকে সাজানোর পর এবং সকল প্রকার তথ্য দিয়ে জ্ঞানের ভান্ডার সমাদৃত করার পরও যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে; তাদের জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা সম্পন্ন করা আছে।

তারকাপুঞ্জের 'মৃত্যুকূপ' বা 'পতনস্থান' সম্পর্কে কুরআন থেকে অবহিত হওয়ার পর এবার আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রবেশ করবো।

বিজ্ঞানঃ

আঠারো শতকের শেষদিকে সর্বপ্রথম 'ব্ল্যাক হোল' নামক অস্তিত্বের ধারণা দান করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 'জন মিচেল' এবং ফরাসী বিজ্ঞানী 'লা-প্লাস'। তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে মহাবিশ্বের কোথাও অদৃশ্য-অচেনা এমন অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব, যা অভিকর্ষবলের প্রচন্ড চাপ ও পরবর্তীতে সৃষ্ট তাপের কারণে বিরাট-বিরাট 'কুপ' বা গহ্বর সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং ঐ কুপসমূহ একপ্রকার 'মৃত্যুকুপের-ই' নামান্তর হয়ে পতিত সকল বস্তুকে তার আকৃতি ও আয়তনের বিপরীতে অকল্পনীয় ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র করে দিতে পারে অথবা একেবারেই নাম-নিশানা মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু তাদের সেই আশ্চর্য্য ধারণা সেদিন বিজ্ঞান বিশ্বের মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯০৫ এবং ১৯১৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'আইনস্টাইনের' 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Special Theory of Relativity) এবং 'সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব' (General Theory of Relativity) প্রকাশিত হওয়ার পর 'Black hole' বিজ্ঞানীদের জ্ঞান রাজ্যে তাত্ত্বিকভাবে আসন গাড়তে সমর্থ হয়, কিন্তু তখনও প্রমাণিত হয়নি। এরপর ১৯৩৫ সালে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 'অধ্যাপক সুব্রামানীয়ম চন্দ্রশেখর' ইংল্যান্ডের এক বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতাকালে Black hole-র পক্ষে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য তুলে ধরেন। যদিও তখনো বিজ্ঞানীমহলে এই বিষয়ে সন্দেহের মেঘ পুরোপুরি কাটেনি। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রায় হঠাৎ করেই এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট 'উহুরু' (UHORO) মহাকাশে X-ray-এর

উৎস সন্ধান করতে গিয়েই Black hole -এর সন্ধান লাভ করে। আবিষ্কৃত প্রথম Black hole-এর নাম হলো –Cygnus – X-1, এভাবে পরবর্তী সময়ে V861 Scocepie, Circinus –X1, GX 339-4 ইত্যাদি আরো বহু Black hole আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের জ্ঞান রাজ্যকে সমাদৃত করে তোলে। বিজ্ঞানের বদৌলতে Black hole-র চরিত্র, চিত্র ও পরিচয় লাভ করে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এর ভয়ঙ্কর চেহারা এবং অকল্পনীয় ধ্বংস মানুষের জানামত সকল প্রকার Adventure কেও হার মানায়। Black hole তার অদৃশ্য কর্মকান্ডে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাকে চরমভাবে পরাজিত করেছে।
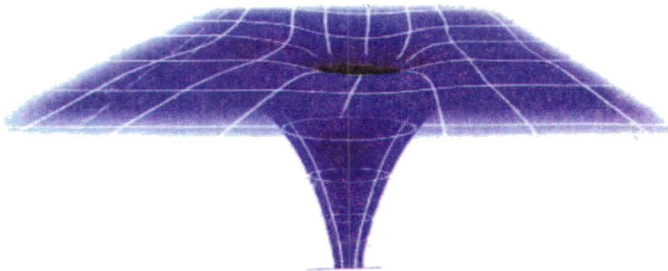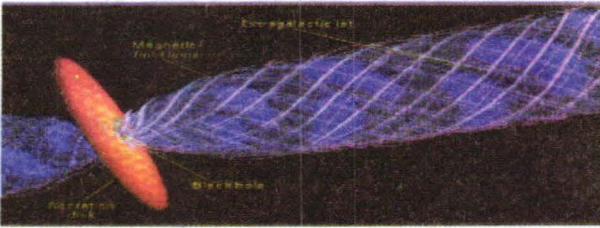
চিত্রঃ ১২৯

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁর বাণী কেউই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন।"

(৬ ঃ ১১৫)

– চিত্রে 'ব্ল্যাক হোল-জিওমেট্রি' প্রদর্শন করা হয়েছে।

এই Black hole সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণকৃত ও প্রমাণিত তথ্য হলো – Black hole জন্ম নেয় নক্ষত্রের কফিন (ধ্বংসাবশেষ) থেকে। অর্থাৎ, একটি বড় ধরনের নক্ষত্র যা আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্র থেকে প্রায় ৩০ থেকে ১০০ গুণ বড়, যখন বিবর্তনের শেষ সীমানায় পৌঁছে, তখন নক্ষত্রের ঐ ধ্বংসবাশেষ থেকেই জন্ম নেয় অবাক করার মত এই Black hole । বিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, নক্ষত্র যত বড় হবে–তার
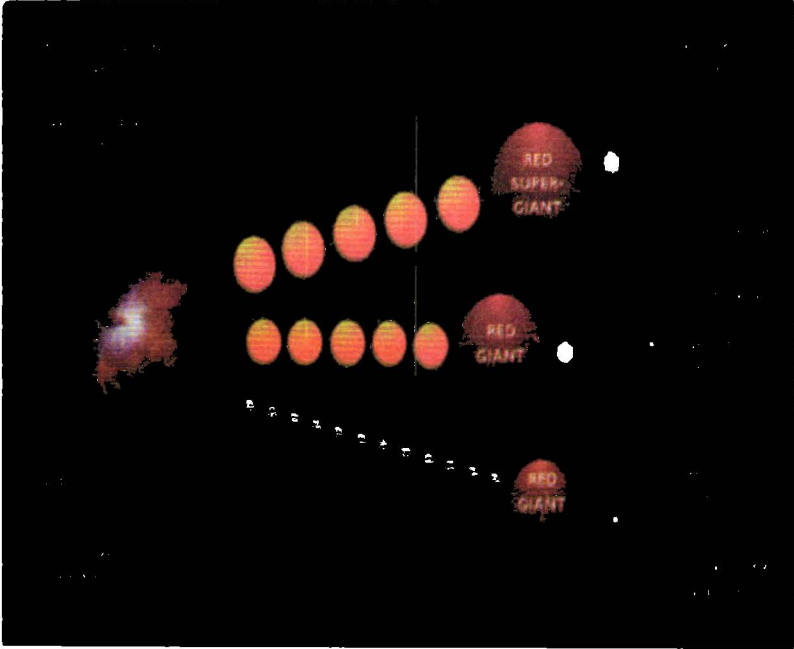
চিত্রঃ ১৩০

"এসব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ : ১)

"এ সবই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ : ৩০)

– কুরআনের বৈজ্ঞানিক দাবী এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ আজকের বিশ্বে একাকার হয়ে পড়েছে। পূর্বে যা ছিল শুধু 'কুরআন' আজকে তা-ই রূপ নিয়েছে 'বিজ্ঞানে'। কি চমৎকার মহানস্রষ্টার জ্ঞানপূর্ণ কৌশলসমূহ!

আয়ুষ্কাল তত কম হবে। এই হিসাবে বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (বা সূর্য) তাদের জ্বালানি (হাইড্রোজেন) দ্রুত হারে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। নক্ষত্রের জ্বালানির এই সরবরাহ কাজে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় প্রথমে হাইড্রোজেন

হিলিয়ামে এবং পরে হিলিয়াম–কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হওয়ার পর
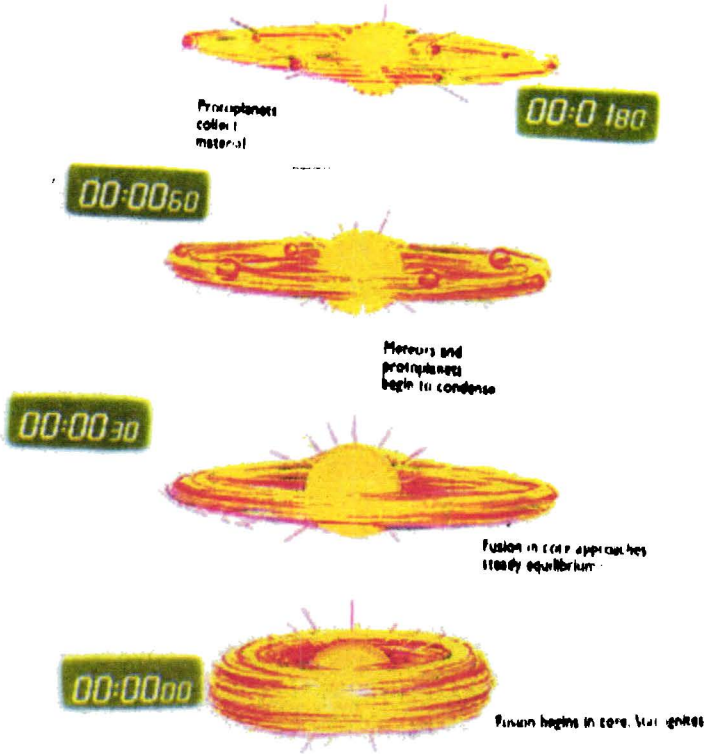
চিত্রঃ ১৩১

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সকল কিছুই আমি সৃষ্টি করেছি ছয়টি সময়কালে।" (৫০ঃ ৬)

"এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জল দীপ।" (৭৮ঃ১৩)

– মহাকাশে ধূলা-বালির মেঘপুঞ্জ (নেবুলা) হতে 'অভিকর্ষ'বলের প্রভাবে আবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্য এবং তার সৌরজগত সৃষ্টি হচ্ছে।

নক্ষত্রটির অভ্যন্তরে দারুণভাবে জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়, এই অবস্থায় পূর্বের মত পারমাণবিক বিক্রিয়া সংঘটিত না হওয়ায় আভ্যন্তরীন ভাগ হতে বহির্মুখী চাপ অত্যন্ত নিচে নেমে আসে। ফলে অভিকর্ষবল পূর্বের তুলনায় ব্যাপকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় আভ্যন্তরীণ

বহির্মুখী চাপ যতই হ্রাস পেতে থাকে, অভিকর্ষবল ততই মারাত্মকরূপ ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে অভিকর্ষের কারণে সৃষ্টি হয় মহাসংকোচন
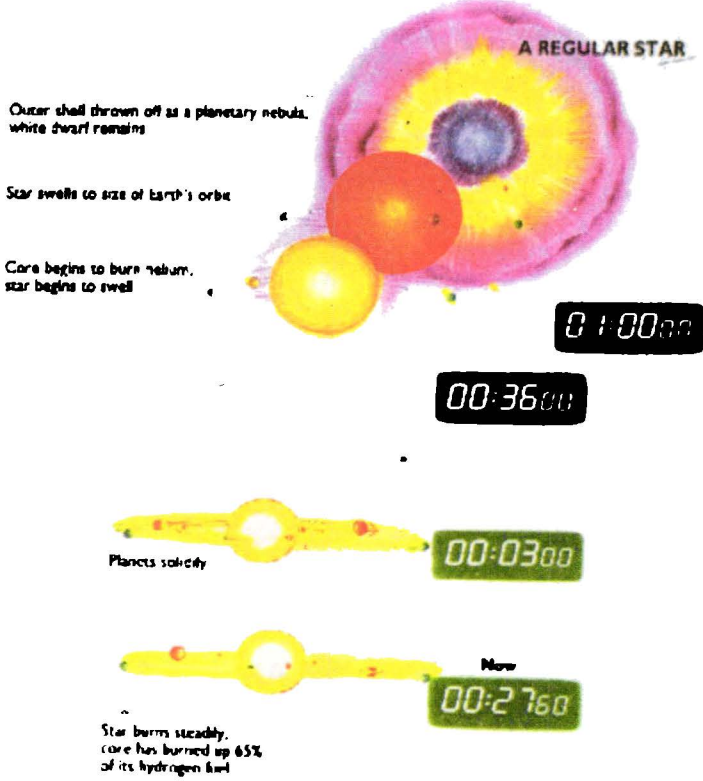
চিত্রঃ ১৩২

"আকাশ জগত ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (২ ঃ ১৬৪)

– মহাকাশে প্রতিটি নক্ষত্র তার জীবন-চক্র সমাপন করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে কেবলই এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিস্ফোরণে ছোট এবং মাজারি ধরনের নক্ষত্র থেকে 'প্লেনেটারি নেবুলা', তার চেয়ে কয়েকগুণ বড় হলে 'নিউট্রন স্টার' এবং বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র হলে তার থেকে জন্ম নেয় 'ব্ল্যাক-হোল'।

প্রক্রিয়া। এই সংকোচন প্রক্রিয়া নক্ষত্রের কেন্দ্রবিন্দুর উপরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা দীর্ঘ সময় এভাবে চলতে থাকার পর একসময়

সংকোচনমাত্রা কল্পনাতীত বিশাল-বিপুল হয়ে পড়ায় অবর্ণনীয় চাপের সাথে সাথে সমানুপাতিকভাবে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়ে নক্ষত্রের কোর (Core) প্রজ্জ্বলিত হয়ে পুনরায় পারমাণবিক রি-এ্যাকটর চালু করে দেয়। ফলে
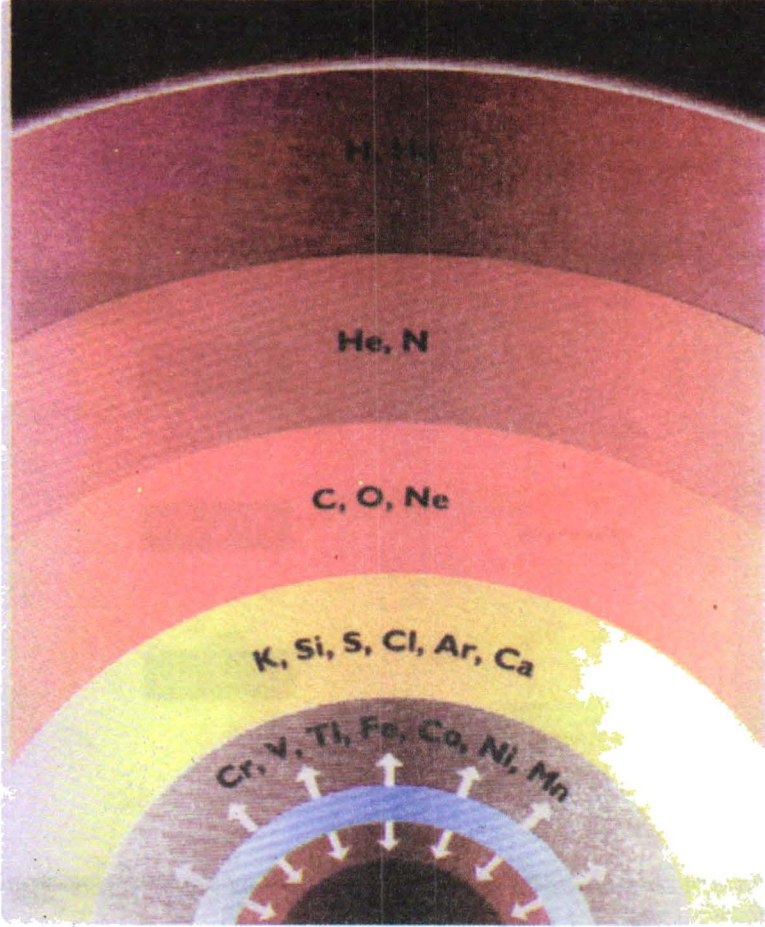
চিত্রঃ ১৩৩

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা সমস্তই প্রতক্ষ করে, কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তারা উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

– নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসের পূর্ব-মুহূর্তে তাদের আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক চুল্লির বার বার উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে জন্ম নেয় জীবনময় গ্রহের কাঁচামাল 'মৌলিক পদার্থসমূহ'। এ পর্যন্ত ১১২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

পূর্বের ন্যায় আভ্যন্তরীণ বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয়ে অভিকর্ষবলের বিপরীতে নক্ষত্রটির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এ অবস্থায় নক্ষত্র কোরে হিলিয়াম–ম্যাগনেসিয়াম মৌলে পরিণত হয়। নক্ষত্রের অন্তিম সময় এভাবে একবার ভারসাম্যহীনতা এবং আবার ভারসাম্যতা চলতে থাকে হাজার-লক্ষ বছর ধরে, ফলে নক্ষত্র কোরে প্রতিবারেই বিভিন্ন মৌল পারমাণবিক বিগলন প্রক্রিয়ায় জন্ম নিতে থাকে। অবশেষে যখন লৌহের মৌল সৃষ্টি হয় নক্ষত্রের কেন্দ্রে (Core), তখন নক্ষত্র তার অন্তিম সময়ের শেষ বিন্দুর উপর এসে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের ক্ষণটি গুণতে থাকে। লৌহের মৌল নক্ষত্রের কোরে (Core-এ) সৃষ্ট তাপ এবং চাপকে এই সময় আর বহির্দেশে নির্গত হতে না দিয়ে নিজেই শোষণ করে নেয়। পরিণামে পারমাণবিক চুল্লী (নিউক্লিয়ার রি-এ্যাক্টার) আর চালু হতে পারে না, ফলে নক্ষত্র কোরে বাধা দানকারী আর কোন শক্তি এবারকার পালায় অবশিষ্ট না থাকায় অভিকর্ষবল খালিমাঠে গোল করার অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করে। তখন একতরফাভাবেই শুরু হয় অভিকর্ষবলের প্রচন্ড সংকোচনের তান্ডবতায় এক অচিন্তনীয় ধ্বংসলীলা। অভিকর্ষের প্রচন্ড রাক্ষসীটানে নক্ষত্রের বাইরের অংশ (পৃষ্ঠদেশ) অতিশয় তীব্র গতিতে ভেংগে-চুরে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এ সময় নক্ষত্র কেন্দ্রটি কল্পনাতীত ঘনত্বের কারণে পদার্থ ভক্ষণকারী 'মৃত্যুকুপে' পরিণত হয়। অনবরত এই মৃত্যুকুপে নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ পতিত হওয়ার এক পর্যায়ে অভিকর্ষ বলের অতিশয় বিপুল চাপের কারণে নক্ষত্র কোরে সমানুপতিক হারে এক মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর তাপমাত্রাও সৃষ্টি হয়। যেহেতু এই শেষ পর্যায়ে লৌহ-মৌলের কারণে পারমাণবিক চূল্লী সৃষ্টি হতে পারে না এবং পরিণামে নক্ষত্র কোর উদ্ভূত ব্যাপক চাপ ও তাপকেও বহির্দেশে নির্গত করতে ব্যর্থ হয়, ফলে নক্ষত্র কোরটি অতিশয় ভয়ঙ্কর বিপুল-বিশাল পরিমাণ তাপ এবং চাপকে সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নক্ষত্রের কেন্দ্রে ঘটে প্রচন্ড বিষ্ফোরণ। এই বিষ্ফোরণ এতই ভয়ঙ্কর হয় যে, নক্ষত্রের বাইরের অংশ ছিন্নভিন্ন ও টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে মহাশূন্যের অসীম ঠিকানায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। এই মহাবিষ্ফোরণের প্রভাবে সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণে মৌলিক ও যৌগিক বস্তুকণা। বিস্ফোরণে নক্ষত্রের বাইরের অংশ অস্তিত্বের বাইরে চলে গেলেও নক্ষত্রের কোরটি অক্ষত থেকে গিয়ে Black hole-এর জন্ম দেয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে Black hole জন্ম নেয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে –নক্ষত্রটিকে আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্রের চেয়ে কমপক্ষে ৩০ গুণ বড় হতে হবে। নতুবা নক্ষত্রটির বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে 'সুপার নোভা'

বিস্ফোরণের মাধ্যমে 'নিউট্রন স্টার' বা 'পালসার' তৈরী হবে, Black hole তৈরী হবে না। Black hole তৈরী হওয়ার জন্য অবশ্যই

চিত্রঃ ১৩৪

"(আল্লাহ্ তিনি) যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর এদের চলার পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা, গুণাবলী ও চূড়ান্ত পরিণতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ২৫)

– একটি বৃহৎ নক্ষত্রের শেষ পরিণতি 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণ, যার ধ্বংসাবশেষ নক্ষত্র 'কোরটি' (Core) পরবর্তীতে 'ব্ল্যাক হোল'-এর রূপ নেয়।

নক্ষত্র কোরে আলোর গতির সমান গতিতে বস্তুর ঘনায়ন ঘট্‌তে হবে। আর সে কারণেই অকল্পনীয় ঘনত্বের এই Black hole-এ বস্তু পতনের সাথে সাথেই তার দৃশ্য অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং শেষ পর্যায়ে তা চরম ঘনত্ব

সম্পন্ন আয়তন (Singularity) লাভ করে। বর্তমান বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে আমাদের আট (৮) হাজার মাইল ব্যাসের এই পৃথিবীকে যদি Black
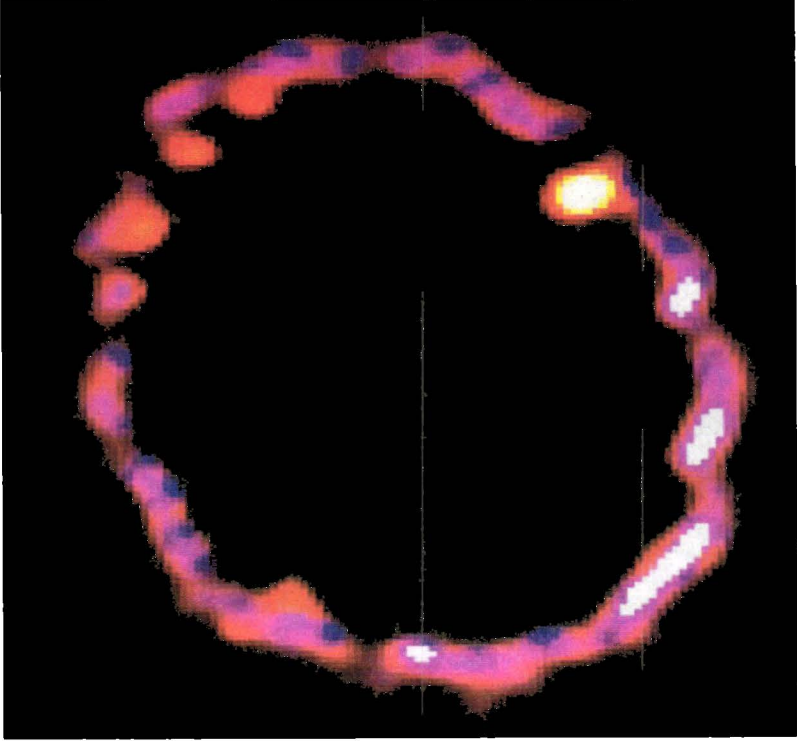
চিত্রঃ ১৩৫
"আমি ঐসব মানুষের জন্য নিদর্শন প্রকাশ করে থাকি যারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২৬)
– 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণ পরবর্তী প্রচন্ড উত্তাপ, উত্তপ্ত ধূলা-বালির রিং বলয় এবং কেন্দ্রে অস্পষ্ট জন্ম নেয়া 'ব্ল্যাক হোল' ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

hole-এ পড়তে দেয়া যায়, তাহলে কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর সেই ঘনায়নকৃত মৃত্যুকুপে পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই পৃথিবী ১ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধ্যের ছোট একটি মার্বেল পিন্ডে পরিণত হবে।

প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রেই এই Black hole-র অস্তিত্ব রয়েছে। এদের আয়তন আমাদের সৌরজগতের চেয়ে বড়ও হতে পারে আবার

কখনও ছোটও হতে পারে। বস্তুতপক্ষে সরাসরি Black hole টি কখনো দেখা যায় না। শুধু এর চার পাশের Event horizon থেকে মুক্ত

চিত্রঃ ১৩৬
"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে যা সে জানত না।" (৯৬ ঃ ৫)
– প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই সৃষ্টি হয়ে আছে বিরাট বিরাট 'ব্ল্যাক হোল', যা কুরআনের বাণীতে উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বে মানুষ কিছুই জানতো না। বিজ্ঞান পরবর্তীতে তা আবিষ্কার করে প্রমাণিত করেছে মাত্র।

X-ray-র অস্তিত্ব থেকেই এর অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। Black hole-এ কোন বস্তু সরাসরি পতিত হয় না। এর বিস্ময়কর টেনে নেয়ার (Sucked) শক্তির আওতায় কোন বস্তু এসে পড়লে তখন ঐ শক্তি বস্তুটিকে টেনে-ছিড়ে-ফেঁড়ে বস্তুকণায় পরিণত করে এবং কেন্দ্রাভিমুখী প্রচন্ডবেগে প্রবাহিত করায় তা Event horizon-এ আগমন করে। এই Event horizon-এ আগমন করার সাথে সাথেই পূর্বের চেয়ে আরো প্রবল কেন্দ্রাভিমুখী গতির কারণে তাড়িত হয়ে এবং প্রচন্ড চাপে নিষ্পেষিত হয়ে বস্তুকণা এতবেশি উত্তপ্ত হয় যে, তা রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) নির্গত করে

এবং প্রবল থেকে প্রবলতর কৌণিক ঘূর্ণীর কারণে চিরতরে অন্ধকার মৃত্যুকুপ Black hole-এ পতিত হয়। এই তারকা মৃত্যুকুপকে Black hole
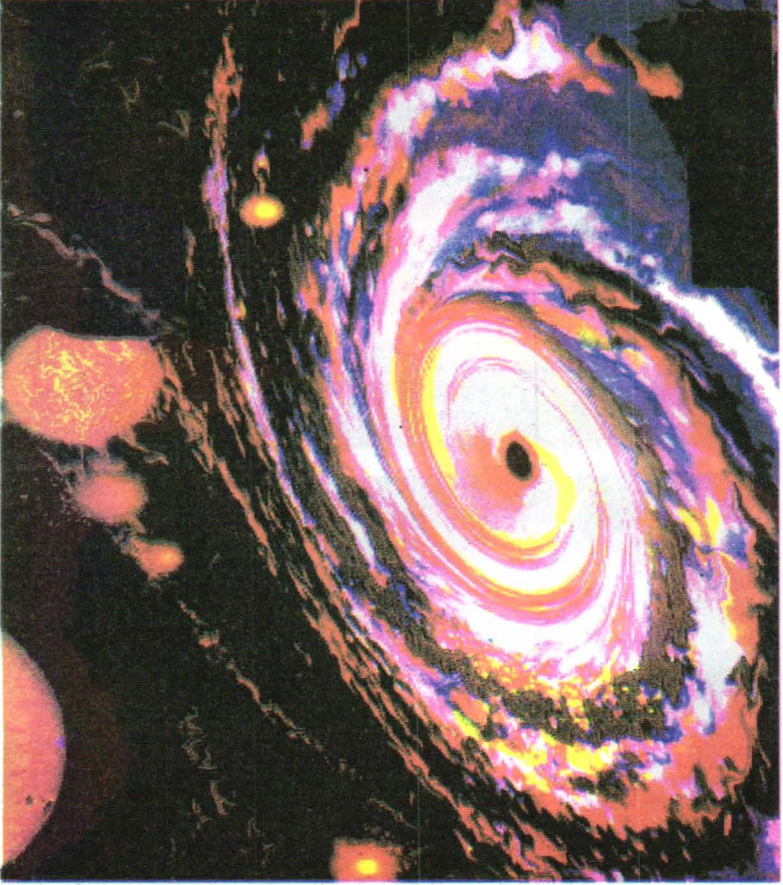
চিত্রঃ ১৩৭
"তারা কি সুক্ষ্মসতর্কতার সাথে কুরআনকে অনুধাবন করে না?" (৪ ঃ ৮২)
– মহাকাশে মহাজাগতিক মহাবিস্ময়ের বিস্ময় 'তারকা মৃত্যুকুপ'। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে স্রষ্টার নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে।

নামকরণ করার কারণ হলো–'Absolutely no information passes out of Black hole and that is why it is black'

যেহেতু এর ভিতর থেকে কোন প্রকার তথ্যই লাভ করা যায় না। এই কারণেই এটা চির অন্ধকার। Black hole-র রাক্ষসী করালগ্রাস থেকে
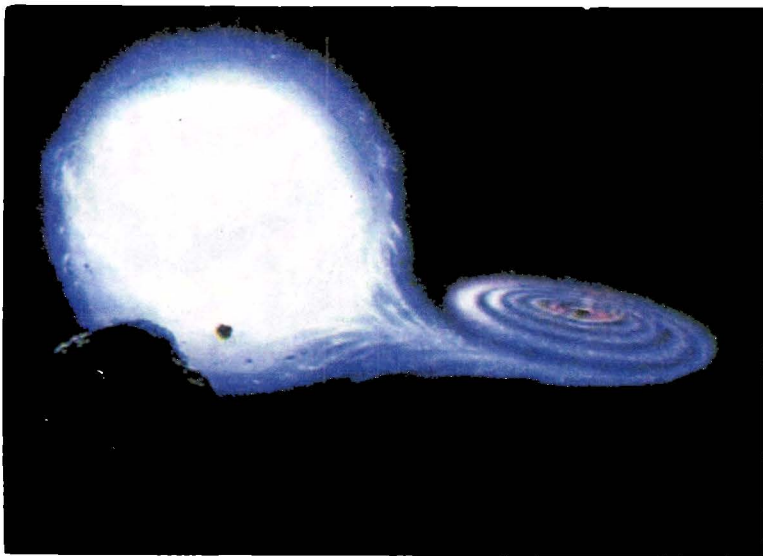
চিত্রঃ ১৩৮

– ধূলা-বালির মেঘপুঞ্জকে (নেবুলা) গিলে খাচ্ছে 'ব্ল্যাক হোল'।

– 'বাইনারী স্টার' বা 'ডাবল্ স্টার' পদ্ধতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রটি হতে সৃষ্ট 'ব্ল্যাক হোল' তার সঙ্গী নক্ষত্রটিকে প্রবল টানে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে গলধঃকরণ করে চলেছে।

আলো পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর সর্বনাশী মৃত্যুকূপের (ধ্বংসস্থানের) অভ্যন্তরে আসলেই যে কি ঘটে চলেছে তা
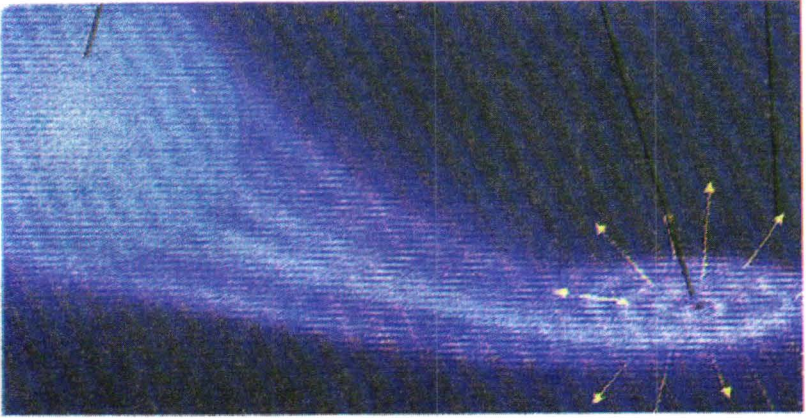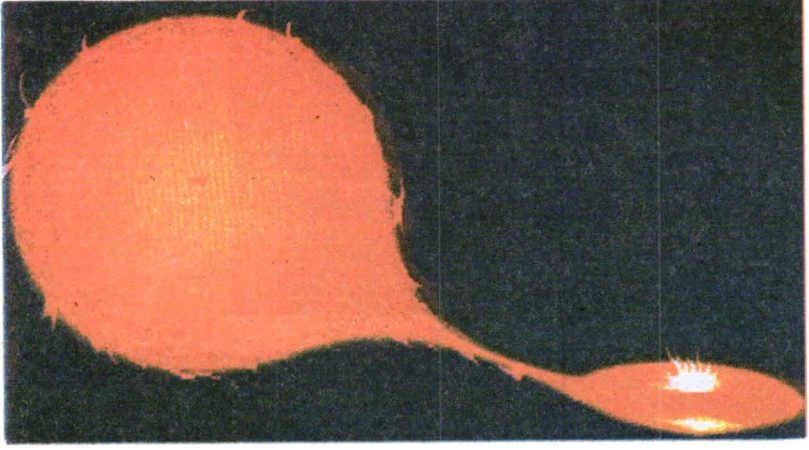
চিত্রঃ ১৩৯

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে।" (৪০ ঃ ৮১)

"এগুলোই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের (কুরআনের) নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

মানুষের বর্তমান বোধগম্যের সম্পূর্ণ বাইরে What is inside a Black hole? It is impossible to tell. You will never be able to

see inside a Black hole and you can never know– না এর ভিতরের দৃশ্য দেখা যাবে, আর না এর প্রকৃত রহস্য জানা যাবে !
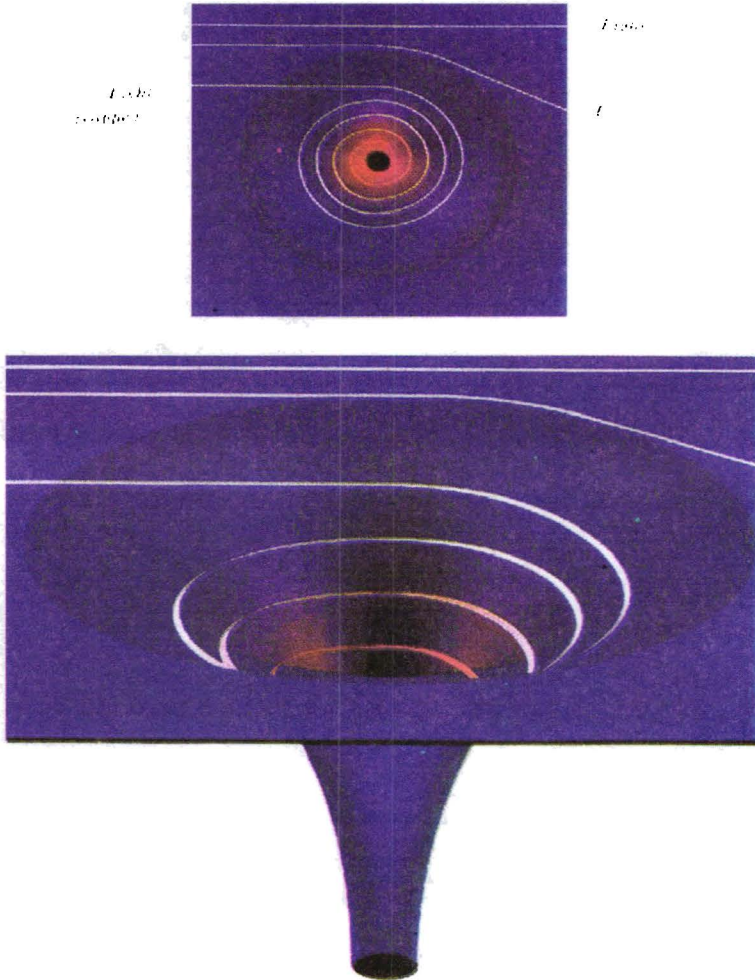
চিত্রঃ ১৪০

"অবশ্যই এটা এক গুরুতর শপথ যদি তোমরা জানতে।" (৫৬ ঃ ৭৬)
–বাস্তবিক পক্ষে 'ব্ল্যাক হোল' এক ভয়ঙ্কর ও গুরুতর ব্যাপার বৈ-কি। বস্তুজগতে সবচেয়ে বেশি দ্রুত গতিশীল 'আলোক রশ্মি' (Light) পর্যন্ত 'ব্ল্যাক হোল'-এর করালগ্রাস থেকে রক্ষা পায় না। 'ব্ল্যাক হোল'-এর প্রবল টানে আলো তার মধ্যে হারিয়ে যায়।
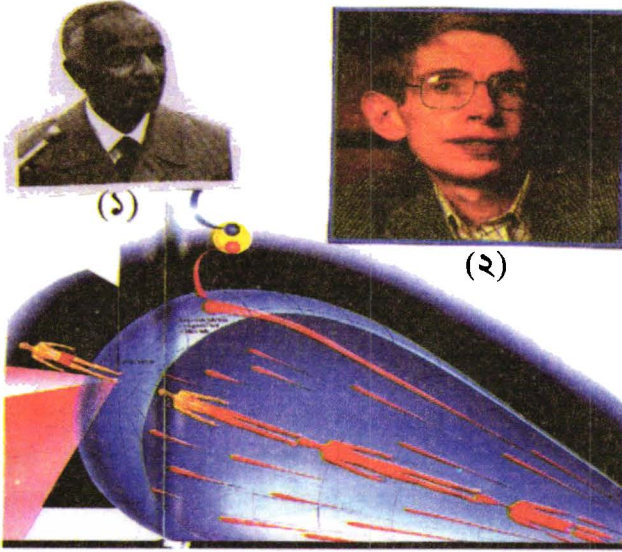
চিত্রঃ ১৪১

"আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ্ আছে কি যে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা ?" (১৪ ঃ ১০)

"সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতেই অবতীর্ণ। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।" (১৮ ঃ ২৯)

– (১) ১৯৩৫ সালে 'ব্ল্যাক হোল' প্রস্তাবক 'মিঃ সুব্রামানিয়াম চন্দ্র শেখর'।

– (২) 'ব্ল্যাক হোল' বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'মিঃ স্টীফেন হকিংস'।

১৪০০ বৎসর আগে পবিত্র কুরআনের পেশকৃত "তারকা মৃত্যুকুপ" বা "নক্ষত্র ধ্বংসস্থান" এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত Black hole-র মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

এবার পুরো বিষয়টিকে পাশাপাশি গুছিয়ে এনে, তা 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তোমার প্রভুর বাক্য সম্পর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে	(১) 'বিজ্ঞান' সমসাময়িককালে যা প্রত্যক্ষ করে, তা-ই প্রকাশ করে থাকে। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত আবিষ্কার সম্পন্ন না

সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন। (৬ ঃ ১১৫)	হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাথমিক তথ্যসমূহে উঠা-নামা বা রদ-বদল হতেই থাকে, দৃঢ় এবং স্থির হতে পারে না। যেহেতু বিজ্ঞান তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যা প্রত্যক্ষ করে থাকে বা লাভ করে থাকে, কেবল তাই প্রকাশ করে, সেহেতু আবিষ্কৃত বিষয়ের সীমানা ছাড়া বিজ্ঞান একচুল পরিমাণও বেশি কিছু জানার বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের দাবী করে না।
(২) "এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)	(২) বিজ্ঞান 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধান'লব্ধ জ্ঞানের নিদর্শন।
(৩) "শপথ সেই 'পতনস্থানের' যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তোমরা জানতে, এটা অবশ্যই এক মহা গুরুতর শপথ।" (৫৬ ঃ ৭৫-৭৬)	(৩) বিংশ শতাব্দীর সাড়া জাগানো যে কয়টি বিস্ময়কর মহাজাগতিক বস্তুর আবিষ্কার ঘটেছে, তার মধ্যে একটি অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে –'ব্ল্যাক হোল'। এই ব্ল্যাকহোলের সীমানায় আগত কোন বস্তুই এমনকি সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন 'আলোকরশ্মি'ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় না। পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞান Black hole-র Event horizon point-এ পা রাখামাত্রই ভেংগে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ফলে প্রকৃতপক্ষে তাতে

	কি ঘটে, না তা জানা যায় আর না এর ভিতর থেকে কোন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। যেহেতু এটা চির অন্ধকার, তাই নামকরণ করা হয়েছে 'Black hole'.
(৪) বিগত প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে, 'কুরআন' Black hole সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বিশ্ব মানবসম্প্রদায়ের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরেছে।	(৪) আঠারো শতকের শেষদিকে, সর্বপ্রথম বিট্রিশ বিজ্ঞানী 'জন মিচেল' এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞানী 'লা-প্লাস' এই Black hole-র অস্তিত্ব মহাকাশে থাকার সম্ভাবনা প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে এবং ১৯১৬ সালে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আইনস্টাইন' কর্তৃক 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Special theory of relativity এবং 'সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব' (General theory of relativity) প্রকাশিত হওয়ায় Black hole-র প্রস্তাব নতুন করে উত্থিত হয়। অবশেষে ১৯৩৫ সালে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 'সুব্রামানিয়াম চন্দ্র শেখর' ইংল্যান্ডে এক বিজ্ঞান সভায় দৃঢ়ভাবে Black hole-র পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন। পরিশেষে প্রায় শত বৎসরের সকল জল্পনা কল্পনা ও তর্কের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭০ সালে Astronomical Satellite

	'UHORO' X-ray-র সন্ধান করতে গিয়ে মহাকাশে X-ray-র উৎস হিসেবে 'Black hole' আবিষ্কার করে।
(৫) "তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁহার বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন। (৬ : ১১৫) "বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ : ৪৬)	(৫) বিজ্ঞান পক্ষপাতহীন – সত্যের মশাল বহনকারী বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশে অনমনীয়তাই বর্তমান বিশ্বে আবিষ্কৃত প্রায় প্রতিটি বিষয়েই 'কুরআনের' বাণীসমূহকে বিশ্বব্যাপী উদ্ভাসিত করে চলেছে। ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ কুরআন আর অগ্রসরমান বিজ্ঞান একই ট্র্যাকে এসে যেন একাকার হয়ে গেছে। যা ছিল পূর্বে 'কুরআন' এখন তাই হয়ে গেল 'বিজ্ঞান'।
(৬) "এগুলো জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ : ১) "এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ : ৩৪) "তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের সত্য প্রতিপালক ! সত্য ত্যাগ করার পর	(৬) প্রতিটি নব নব আবিষ্কার যদি জ্ঞানের সমারোহ নিয়ে হাজির হয়েছে বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে একই বিষয়ে যদি কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক অনেক পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী এবং তথ্যের সওগাত নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে থাকে বিজ্ঞান তাকেও গ্রহণ না করে পারে না। কিন্তু সমস্যা যা তা হলো—ভূ-পৃষ্ঠের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক প্রকট মতপার্থক্য, যার প্রভাব মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপরও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি আছে? তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ?" (১০ ঃ ৩২)	

"আল-কুরআন বিজ্ঞানময়"। (৩৬ঃ২) আজকের নতুন সভ্যতায় জ্ঞানের ব্যাপক সমারোহে কুরআনের উল্লেখিত দাবী নিরেট বাস্তবতার আলোকে ও প্রমাণসাপেক্ষে কোন অবস্থায় আর অস্বীকার করা চলে না। অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে 'ব্ল্যাক হোল'ও একটি অন্যতম প্রমাণ, যা মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির আড়ালে মহাকাশে যে অবস্থান করে সেখানে প্রচন্ড প্রতাপে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সে কথা মানবসমাজকে অবহিত করেছিল। বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞান অধুনা সে বিষয়টি হাতে-কলমে প্রমাণ করে মহাসত্যতার স্থায়ী আসনে 'কুরআনকে' সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ্, তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাব আল্-কুরআনকে ধারণ করে মানবসমাজ ধন্য হওয়ার পথে আর কোন অন্তরায় আছে কি?

'মহাকাশ অভিযান'

আল্-কুরআনঃ

"অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের নিরূপণ কারো সাধ্যের মধ্যে নয়।" (৭২ ঃ ২৬)

"আমি ঐ সব মানুষের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করে থাকি যারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২৬)

"আকাশ ও ভূ-মন্ডলের মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (২ ঃ ১৬৪)

"আল্লাহ্ তিনি, যিনি উম্মীগণের জন্য তাদের মধ্য হতে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অবগত করেন।" (৬২ ঃ ২)

"যিনি পবিত্র বাণীসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শুনাচ্ছেন, তোমাদেরকে শুদ্ধ করছেন, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তোমাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহ অবগত করছেন।" (১ ঃ ১৫১)

"তোমরা অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

"এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্বাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)

"হে জ্বীন ও মানবসম্প্রদায়! যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে পার হয়ে যেতে, তা হলে তা করতে পার, কিন্তু তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না 'চরম ক্ষমতা' অর্জন ব্যাতিরেকে" (৫৫ ঃ ৩৩)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত কোন্ নিয়ামত (বিজ্ঞান সম্মত প্রস্তাব)-কে অস্বীকার করতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৪)

"আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা (বিবেকসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) জ্ঞান খাটায় না, যারা (স্ববাক হওয়া সত্ত্বেও) মূক এবং (শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বধির।" (৮ ঃ ২২)

"অতএব হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

"নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য।" (১৬ ঃ ৫২)

৭২ ঃ ২৬ আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সমগ্র মহাবিশ্বে সকল প্রকার অদৃশ্যজাত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, আর কারো নেই, এবং থাকার কথাও না। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি ঐ বিষয়ে অধিক ওয়াকিফহাল হবেন, এটাই যুক্তির কথা, অন্যদের জন্য বিষয়টি হবে আন্দাজ এবং অনুমান নির্ভর, যা সত্যের নিকটেও পৌঁছার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান যে কত ব্যাপক-বিরাট-বিস্তৃত, সীমা-পরিসীমাহীন, তারও কোন পরিমাপ কারও পক্ষে চিন্তা-অনুমান করাও দুঃসাধ্য। তাঁর এই মহান এই আশ্চর্যজনক-বিস্ময়কর জ্ঞান দিয়েই তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কখন কোথায় কি ঘটবে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি এর পরিকল্পনাকারী, প্রস্তুতকারী, পরিচালনা এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রণকারীও বটে।

৬ ঃ ১২৬ আয়াতে বলা হয়েছে–মানবসমাজে যারা চিন্তাশীল, গবেষক এবং সত্যদর্শনে আগ্রহী ও স্মরণকারী, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের জন্য সর্বত্র নিদর্শন বিছিয়ে রেখেছেন যেন ঐ সকল নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের প্রভুর স্বাক্ষর তারা অবলোকন করে তাঁর সামনে মাথা অবনত করতে পারে এবং নিজেদের জীবনকে স্বার্থকতার মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এই চিন্তাশীল লোকেরা মহাবিশ্বের যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সেখানেই কেবল তাদের প্রভুর অসংখ্য নিদর্শন তারা দেখতে পায়, কি আকাশে, কি পাতালে, কি সাগরে, কি ভূমিতে যেখানেই তাকায়, সেখানেই শুধু তাদের একমাত্র বিশ্বপ্রভুর হাতের কাজ–তাদের দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়। তাদের চিন্তার রাজ্য তাতে তরঙ্গায়িত হয়, ভাবাবেগ দূরীভূত হয়ে তাদের বিবেক সত্যগ্রহণে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসে। ২ঃ১৬৪ আয়াতটিতে সে কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

৬২ঃ২ এবং ১ঃ১৫১ উল্লেখিত বাণীসমূহে বলা হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের মানবমন্ডলীকে তাদের প্রভুর নিদর্শন অবলোকন করানো, আল্লাহ্র বাণীসমূহ শ্রবণ করানো, শিরক্ থেকে তাদেরকে পবিত্র করা এবং মহাবিশ্বের অজ্ঞেয়-অজানা বিষয়সমূহ পরিপূর্ণরূপে অবহিত করার সাথে সাথে সর্বপ্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানও শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি মানবসমাজের মধ্য থেকেই একজন 'রাসূল'ও প্রেরণ করেছেন। যাঁর ২৩ বৎসরের নবুওয়াতের-রেসালাতের জীবন কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবসম্প্রদায়কে সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের আলো বিতরণ করতে থাকবে। ৮৪ঃ১৯, ৪৫ঃ১৩ এবং ৫৫ঃ৩৩ এই আয়াত ৩টি পাশাপাশি রেখে নজর দিলেই অনুধাবন করা যায়। মহাকাশ বিজ্ঞানের কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের জ্ঞানের সীমার মধ্যে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই হাজির করা হয়েছে। ৮৪ ঃ ১৯ আয়াতে স্পষ্টতই বলে দেয়া হয়েছে যে, মহাবিশ্বটি বিরাট-বিশাল, সীমা-পরিসীমাহীন ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়ে থাকা সত্ত্বেও এক সময় আসবে–যখন মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন বর্তমানের অবিশাস্য অকল্পনীয় – গ্রহ থেকে গ্রহে, এক সৌর জগত থেকে অপর সৌর জগতে, আন্তমহাকাশীয় ভ্রমণ সম্ভব করে তুলতে পারবে। এই সম্ভাবনার একমাত্র কারণ যা ৪৫ঃ১৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ তায়ালা নিজের থেকে করুণা করে–সমগ্র সৃষ্টিজগতকে (আকাশমন্ডল ও পৃথিবী) মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। এখন মানুষ অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে থাকলে একদিন অবশ্যই এই সুবর্ণ সোনালী সুযোগ পেয়ে যাবে।

আমাদের এই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অথবা স্থানীয় আঞ্চলিক আকাশসীমা থেকে কোটি-কোটি মাইল দূরের অন্য গ্রহ, বেশ কয়েক আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোন সৌরজগত, কিংবা মিলিয়ন-মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোন 'Star City' বা গ্যালাক্সীতে আন্তঃমহাকাশীয় ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে
৫৫ঃ৩৩ আয়াতে। যেখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর মাটি

ছেড়ে অথবা আঞ্চলিক আকাশীয় এলাকা থেকে দূর-দূরান্তের আন্তঃমহাকশীয় সফরে বেরিয়ে যেতে হলে, অবশ্যই অত্যন্ত জরুরীভাবে মানুষকে ব্যবহৃত আকাশযানের জন্য 'চরম শক্তি' ও 'ক্ষমতা' অর্জন করতে হবে। নতুবা ভ্রমণযানটি পৃথিবীর মাটির মায়া (মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ) ত্যাগ করতে না পারায় ভূ-পৃষ্ঠেই আবার ফিরে আসবে। এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে মানুষের পাশাপাশি অগ্নি দিয়ে সৃষ্ট জ্বীনজাতিকেও একই সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলে দূর-দূরান্তে গ্যালাক্সীয় অঞ্চলে আন্তঃমহাকাশীয় সফরের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই অনুমানের চাইতে শতগুণ বেশি গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা, আমরা জানি আগুণ এক প্রকার Radiant Energy (আলোকশক্তি), আর এই Radiant Energy দিয়েই জ্বীনসম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ার কারণে তারা আলোর গতিতে চলাচল করতে পারে। এটা তাদের স্বাভাবিক গতিও বলা যায়। এখন প্রশ্ন হলো–যারা আলোর গতিতে চলার ক্ষমতা রাখে, তারাও কি তাহলে দূর-দূরান্তের আন্তঃমহাকাশীয় আকাশ সফর করতে ব্যর্থ? কুরআনের বক্তব্য স্পষ্টভাবে সে কথাই তুলে ধরেছে।

বর্তমান রকেট প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে প্রচন্ড ক্ষমতা সৃষ্টি করে পৃথিবীর Escape velocity (১১ কিঃমিঃ/সেকেন্ড)-র বন্ধনমুক্ত হয়ে 'কক্ষপথ' (Orbit) ও চাঁদে সফলতার সাথেই অভিযান সম্পন্ন করছে। এর পরের ধাপে 'সৌরজগতের' বিভিন্ন গ্রহে কিন্তু রকেট প্রযুক্তি তার বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতার জন্য আর সফল অভিযান চালাতে পারবে না–ব্যর্থ হবে। এই 'সৌরজগত' অভিযানে অবশ্যই প্রয়োজন হবে আলোর গতির কাছাকাছি গতি সম্পন্ন (আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) প্রচন্ড ক্ষমতাশালী Space Ship-এর, এবং এই সীমা পর্যন্ত জ্বীনজাতিও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে সমর্থ তাদের প্রকৃতিগতপ্রাপ্ত গতির কারণে। কিন্তু এই সৌরজগতের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্র ও গ্যালাক্সীয় বেল্টে যেখানে দূরত্বের একক কিলোমিটার বা মাইল বিরাট-বিশাল ফাঁকার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে যায় এবং সেখানে দূরত্বের একক হিসাবে আগমণ করে 'আলোক বর্ষ' এবং 'পারসেক' (এক আলোকবর্ষ

হলো–আলো প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতিতে পূর্ণ একটি বৎসরে যতটুকুন পথ যেতে পারে, তার সমান। আবার এক পার্সেক = ৩.২৬ আলোকবর্ষ)। তাই যেহেতু পরবর্তীতে নক্ষত্রসমূহ থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের গ্যালাক্সীসমূহ শত-সহস্র মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দুরত্বে অবস্থান করছে, সেহেতু সেই পরিবেশে আলোর গতি সম্পন্ন যান বা জ্বীনজাতি অভিযান চালাতে বাস্তবভাবেই ব্যর্থ এবং অপারগ। সে অবস্থায় অবশ্যই আরো বিশাল ক্ষমতার অধিকারী আকাশযান উদ্ভাবন প্রয়োজন হবে এবং চেষ্টা করলে মানবসম্প্রদায় ও জ্বীনজাতি তাতেও সফলতা লাভ করতে পারবে। ৫৫ঃ৩৩ আয়াতটি গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ একটি অনন্যতার দাবীদার, বর্তমান রকেট প্রযুক্তি তার মাত্র প্রাথমিক রহস্য উন্মোচন করতে সমর্থ হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলোর গতির কাছাকাছি গতি সম্পন্ন মহাকাশযান উদ্ভাবন হলে আয়াতের অর্ধাংশ রহস্য আবরণমুক্ত হবে এবং পরবর্তীতে আরো অকল্পনীয়-অসীম ক্ষমতার মহাকাশযান তৈরী হলে আয়াতের পুরো রহস্যই প্রমাণিত হয়ে এক ও একক মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য এবং গুণগান সমগ্র সৃষ্টিজগতব্যাপী নতুনভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

আল্লাহ্ তায়ালা 'আমর' বা নির্দেশ' নামক যে শক্তি দিয়ে (মধ্যাকর্ষণ দিয়ে) পৃথিবীপৃষ্ঠে আমাদের আবাসযোগ্যতা বিধান করেছেন এবং মহাশূন্যের মাঝে-গ্যালাক্সী, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ সকল কিছুকে পারস্পরিক আকর্ষণশক্তির (মহাকর্ষবল) মাধ্যমে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই শক্তিকে ডিঙ্গিয়ে তার বিপরীত Space Ship কে চালিয়ে আন্তঃমহাকাশ পাড়ি জমানো সহজ কথা নয়। এ এক জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য যা শুধু সমাজের জ্ঞানবানরাই অনুধাবণ করতে পারে। কিন্তু যদি এরপরও জ্ঞানবান সমাজ বিষয়টির প্রকৃত বা মূল আহ্বানকে অনুধাবনের চেষ্টা না করে বা বিষয়টি ধর্মান্ধতার দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে তার পরিণতির কথা শোনানো হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। ৮ঃ২২ আয়াতে বলা হয়েছে – আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তারা নিকৃষ্টতম জীব, জ্ঞানপাপী, যারা বিবেকসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানকে সঠিক কাজে লাগায় না, বাকশক্তি

থাকা সত্ত্বেও যারা সত্য কথা বলে না–বোবা হয়ে থাকে এবং শ্রবণশক্তি প্রখর থাকা সত্ত্বেও যারা না শুনার ভান ধরে। অন্ততঃ সৃষ্টির সেরাজীব হিসাবে মানবসম্প্রদায়ের মাঝে এ জাতীয় আচরণ কখনই শোভনীয় নয় – কাম্যও নয়। তাই ৫ঃ১০০ আয়াতে জ্ঞানী সমাজকে সতর্ক সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে 'মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনকে ভয় করে চলো, তাঁর নিদর্শন চোখে দেখে, কানে শুনে, এবং জ্ঞান দিয়ে বুঝার পরও কেন নির্বোধ সাজতে চাও?,

১৬ঃ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে Total Submission'-নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্রই প্রাপ্য। 'অতএব তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়, জীবনের সফলতা-স্বার্থকতা-কামিয়াবী এখানেই নিহিত।' উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহের এই হচ্ছে মোটামুটি বক্তব্য।

বিজ্ঞানঃ

দৃশ্য-অদৃশ্য হাজার-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় তথ্য ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান মানবসমাজকে অবহিত করতে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে মহাকাশ অভিযান বা আন্তঃমহাকাশীয় ভ্রমণ সম্পর্কে যা প্রমাণ করেছে এবং তথ্য দিয়েছে, তা হলো–আমরা যে মহাবিশ্বের অধীন, সেই মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ বিস্তৃত হয়ে মহাশূন্যে অবস্থান করছে। এই মহাবিশ্বের বড় বড় বস্তুসম্ভার হচ্ছে 'Star city' বা 'গ্যালাক্সীসমূহ', যে গ্যালাক্সী গড়ে প্রায় প্রতিটি ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ধারণ করে ক্রমান্বয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে সম্প্রসারিত হয়ে মহাশূন্যের মাঝে উড়ে যাচ্ছে। এক একটা গ্যালাক্সি প্রায় গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ জায়গা নিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে। একটি গ্যালাক্সী থেকে অপর গ্যালাক্সীর গড় দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ২ মিলিয়ন (২০ লক্ষ) আলোকবর্ষ। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত সীমারেখায় ১০০ কোটির মত গ্যালাক্সী আবিস্কৃত হয়েছে। আর তা হচ্ছে মূল মহাবিশ্বের মাত্র ১০ ভাগ (অনুমানকৃত)।

সর্বশেষ উন্নততর প্রযুক্তি এই ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষসীমার বাইরের আর কোন তথ্য প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। অর্থাৎ, মূল

চিত্রঃ ১৪২
"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে (যা কিছু আছে তাতে) জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (২ ঃ ১৬৪)
– 'মহাবিশ্বটি' মহান স্রষ্টার মহাকীর্তির এক তুলনাবিহীন জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল তার কিছুটা অবগত হওয়া সম্ভব।

মহাবিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ এখনো কিছুই জানতে পারেনি, আর জানার সম্ভাবনাও দৃশ্যত খুবই ক্ষীণ। কারণ ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের বস্তুকে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, বস্তুগুলো প্রায় আলোর গতিতে উড়ে অদৃশ্য অজানা ঠিকানায় হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই দূরত্বের পর আর কোন বস্তুর আলো কখনই পৃথিবীর দিকে আসবে না এবং সে কারণেই আমরাও তাদের চেহারা দেখতে পাবো না। এই দূরত্বসীমা থেকেই মহাবিশ্বের বাকী ৯০ ভাগ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একতরফাভাবে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে।
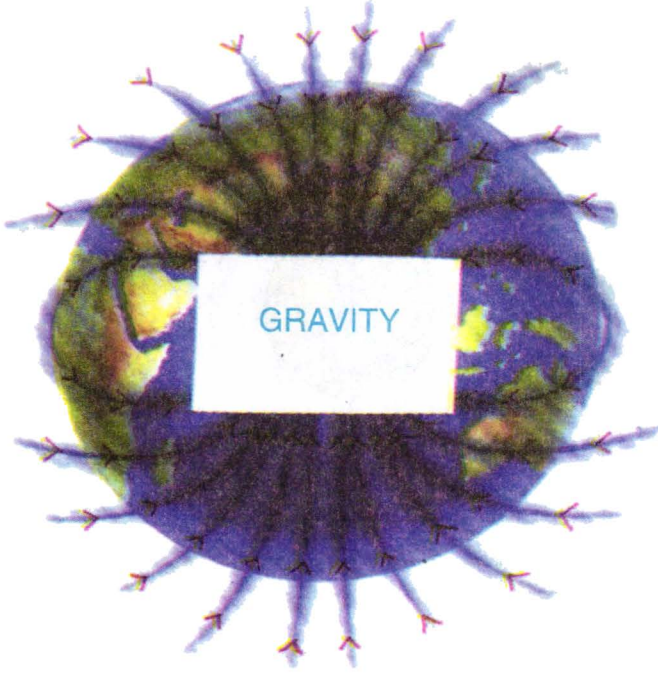
চিত্রঃ ১৪৩

"তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য এমন অনুগত (শক্তিসম্পন্ন) করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পৃথিবীর যে কোন অংশেই চলাফেরা করতে পার (যেন ছিটকে পড়ে না যাও)।" (৬৭ ঃ ১৫)

– উল্লেখিত শক্তি-ই 'মাধ্যাকর্ষণ বল' হিসেবে বিজ্ঞানবিশ্বে পরিচিত। এই শক্তিটি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের প্রতিটি বস্তুকে প্রবল বেগে কেন্দ্রের দিকে টেনে নিতে চায়; ফলে বস্তু পৃষ্ঠদেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে পারে না।

এই মহাবিশ্বে প্রতিটি গ্যালাক্সী একে অপরকে, নক্ষত্রসমূহ একে অপরকে আবার সৌরজগতের সূর্য তার পরিবারের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরকে মহাকর্ষবলের (Gravity) মাধ্যমে আকর্ষণ করার ভিতর দিয়েই মহাশূন্যের ওপরে ভারসাম্য সৃষ্টি করে ঘুর্ননরত অবস্থায় ব্যবস্থিত হয়ে বিরাজমান আছে। প্রতিটি মহাকাশীয় বস্তু স্থানীয়ভাবে মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে কেন্দ্রমূখী প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় বস্তুর পৃষ্ঠ দেশের ওপরে অবস্থিত বস্তুসমূহকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ফলে পৃষ্ঠদেশ থেকে কোন বস্তু বিনা প্রয়োজনে মহাশূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে না। এই
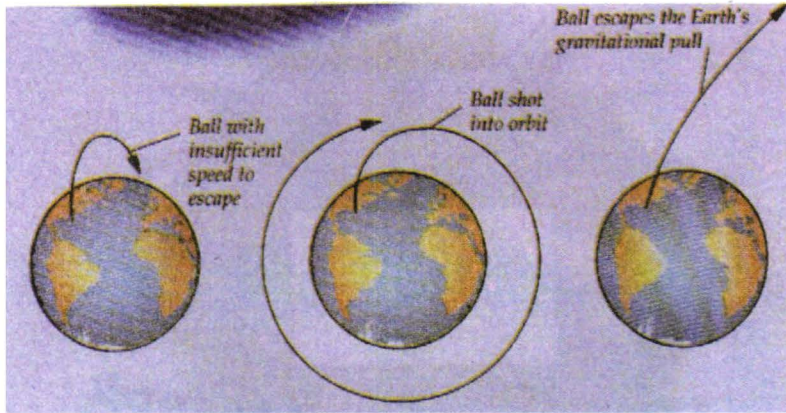
চিত্রঃ ১৪৩
"আল্-কুরআন মহাবিজ্ঞানময়।" (৩৬ ঃ ২)
(১) বস্তুর 'মুক্তিগতি' (escape velocity) কম থাকায় পুনরায় পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসছে।
(২) বস্তুর 'মুক্তিগতি' পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ক্ষমতার চাইতে বেশি থাকায় পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।
(৩) বস্তুর 'মুক্তি গতি' পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের তুলনায় বেশি লাভ করায় পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের দিকে চলে যাচ্ছে।

মধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে আমরা ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান করতে পারতাম না। সকল কিছুসহ মহাশূন্যে হারিয়ে যেতাম। যে বস্তু যত বড় তার মধ্যাকর্ষণ বল তত বেশি। কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশ থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে যেতে চাইলে মধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে অবশ্যই 'মুক্তিগতি' বেশি হতে হবে। নতুবা ঐ

বস্তুর আওতামুক্ত হওয়া যাবে না। ঘুরে ফিরে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। এরপর একটা সৌরজগতে তার পরিবারের সদস্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু ইত্যাদির মাঝে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মাইলের ব্যবধান বজায় রাখে—যা পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানরত মানবমন্ডলীর জন্য অবশ্যই বড় লম্বা দূরত্ব বৈকি। আবার একটি নক্ষত্র অপর নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে গড়ে প্রায় ৪ (চার) আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থান করে।
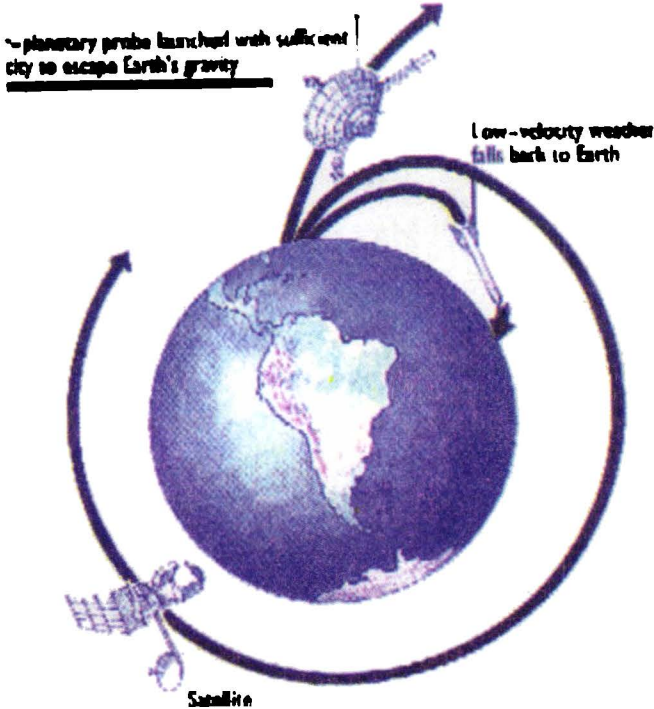
চিত্রঃ ১৪৪

"তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করছো না?" (৭১ ঃ ১৩)

–পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেট 'মুক্তিগতি' (Escape velocity) কম হওয়ার কারণে পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসছে, পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারছে না। 'Satellite' 'মুক্তিগতি' (১১ কিঃমি/সেঃ) লাভ করায় কক্ষপথে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। 'Planetary Probe' পৃথিবীর Escape velocity যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করায় অনায়াসে মহাশূন্যের দিকে অগ্রসর হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে।

গ্যালাক্সীগুলোর মধ্যবর্তী পরস্পর গড় দূরত্ব প্রায় ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। এই অবস্থায় বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাশ পাড়ি দেয়ার জন্য যে যান তৈরী করে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তার নাম হলো 'রকেট'। এই রকেট প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীর বাইরে কক্ষপথে (Orbit-এ) এবং পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদে মানুষ স্ব-শরীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এই চাঁদ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল প্রায়। বর্তমান রকেট প্রযুক্তি
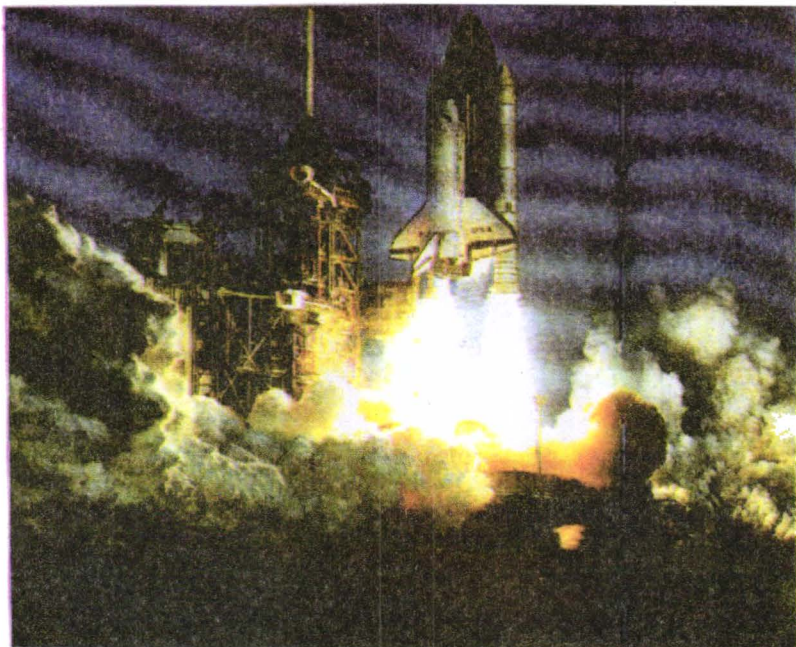
চিত্রঃ ১৪৫

"হে জ্বীন ও মানবসম্প্রদায় ! যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে পার হয়ে যেতে, তা হলে তা করতে পার কিন্তু তোমরা তা কখনই পারবে না 'চরম শক্তি-ক্ষমতা' অর্জন ব্যতিরেকে।" (৫৫ ঃ ৩৩)

– পৃথিবীর Escape velocity (১১ কিঃ মিঃ/সেঃ)-র বিপরীতে রকেট বুস্টারের মাধ্যমে প্রচন্ড শক্তি অর্জনের প্রক্রিয়ায় মহাকাশ খেয়াযান ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বন্ধন মুক্ত হয়ে (মধ্যাকর্ষণের বিপরীতে) মহাশূন্যে উঠে যাচ্ছে।

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এ এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে–চন্দ্র অভিযানের পর এই প্রযুক্তি আর মহাশূন্যে সামনের দিকে অবদান রাখতে পারবে না। কারণ এর প্রস্থান গতিবেগ এতই নগণ্য যে, পরবর্তী সৌরজগতের বেল্টে কিংবা নক্ষত্র বেল্টে কোটি-কোটি মাইলের লম্বা দূরত্বের পথ দিন নয়, মাস নয়, বছরের পর বছর বর্তমান Rocket speed – এ সমাপ্ত করতে পারবে না। মিলিয়ন-

চিত্রঃ ১৪৬
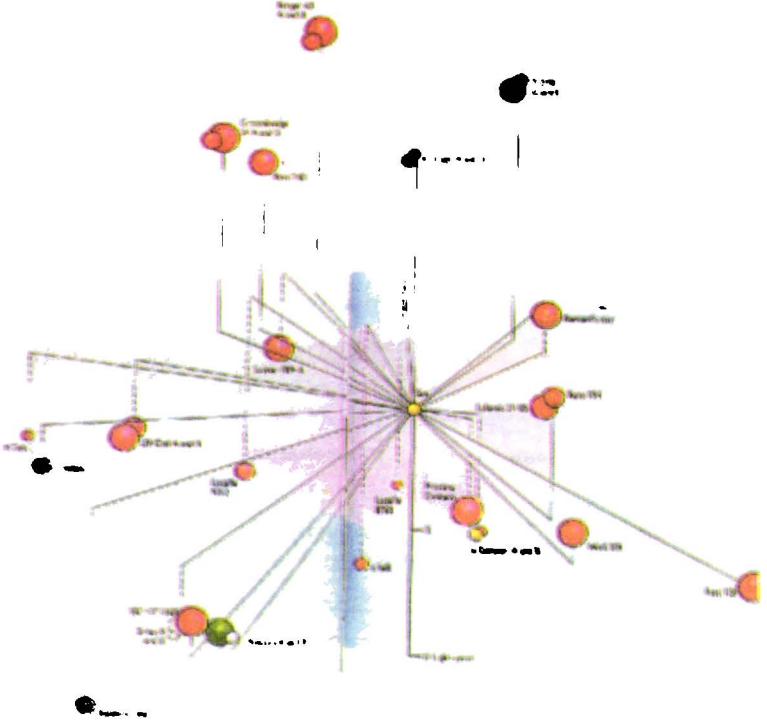
"এই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্তাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষনীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)

– আগামী দিনগুলোতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ধারা বজায় থাকলে মানুষ তাকে চাহিদামত ব্যবহার করে গ্রহ থেকে গ্রহে, এমনকি এক সৌরজগত থেকে অপর সৌরজগতে সফল অভিযান পরিচালনায় সাফল্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে পারে। ছবিতে আমাদের সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্রসমূহ দেখা যাচ্ছে।

মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সী অভিযানের তো কোন প্রশ্নই আসে না। বিজ্ঞানীগণ হিসাব করে দেখেছেন আমাদের সৌরজগত এবং নক্ষত্র

NEAREST STARS

Name	Constellation	Distance (light years)*
Sun	–	0.000015
Proxima Centauri	Centaurus (The Centaur)	4.2
Alpha Centauri A	Centaurus (The Centaur)	4.3
Alpha Centauri B	Centaurus (The Centaur)	4.3
Barnard's Star	Ophiuchus (The Serpent Bearer)	5.9
Wolf 359	Leo (The Lion)	7.6
Lalande 21185	Ursa Major (The Great Bear)	8.1
Sirius A	Canis Major (The Great Dog)	8.6
Sirius B	Canis Major (The Great Dog)	8.6
UV Ceti A	Cetus (The Whale)	8.9

BRIGHTEST STARS FROM EARTH

Name	Constellation	Distance (light years)*
Sun	–	0.000015
Sirius A	Canis Major (The Great Dog)	8.6
Canopus	Carina (The Keel)	313
Alpha Centauri A	Centaurus (The Centaur)	4.3
Arcturus	Boötes (The Herdsman)	36
Vega	Lyra (The Lyre)	25
Capella	Auriga (The Charioteer)	42
Rigel	Orion (The Huntsman)	773
Procyon	Canis Minor (The Little Dog)	11
Achernar	Eridanus (River Eridanus)	144
Betelgeuse	Orion (The Huntsman)	427

চিত্রঃ ১৪৭

"তিনিই মানুষকে অবহিত করেছেন, ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ ঃ ৫)
– ছকে আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্র হতে নিকটবর্তী ও উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব দেখানো হয়েছে।

রাজ্য স্ব-শরীরে সফর করতে চাইলে মানবমন্ডলীকে অবশ্যই আলোর গতির সমান গতি অথবা কাছাকাছি গতি সম্পন্ন প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী Space ship তৈরী করতে হবে। নতুবা ঐ স্বপ্ন চিরদিনই কেবল স্বপ্ন থেকে যাবে, কোনদিনই বাস্তবতার মুখ দেখতে পাবে না।
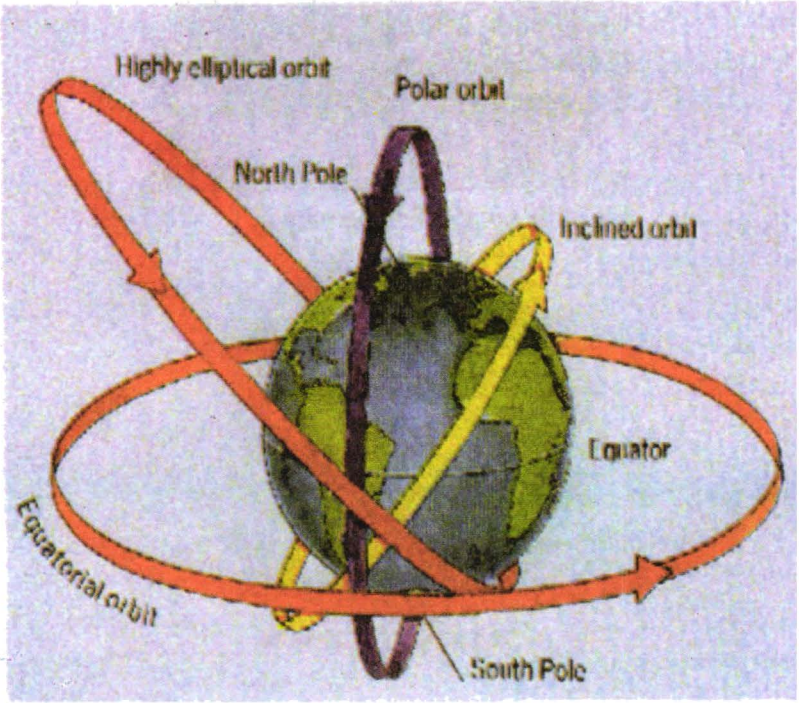
চিত্রঃ ১৪৮

"অদৃশ্য জ্ঞান কেবল তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের নিরূপণ কারো সাধ্যের মধ্যে নয়।" (৭২ ঃ ২৬)
"তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)
–পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর মহাশূন্যে অদৃশ্য অথচ বাস্তব, বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথ দেখানো হয়েছে।

Yury Gagarin.

JOHN GLENN

চিত্রঃ ১৪৯

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করে কি অস্বীকার করতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৪)

– ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ার 'ইউরি-গ্যাগারিন' এবং ১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকার 'জন গ্ল্যান' প্রথমবারের মত প্রচন্ড শক্তি-সম্পন্ন রকেটের মাধ্যমে পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে বাস্তবে 'কুরআনের' বাণীকে সত্যে পরিণত করেন। প্রচন্ড শক্তি অর্জনের মাধ্যমেই তারা রকেটযোগে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।
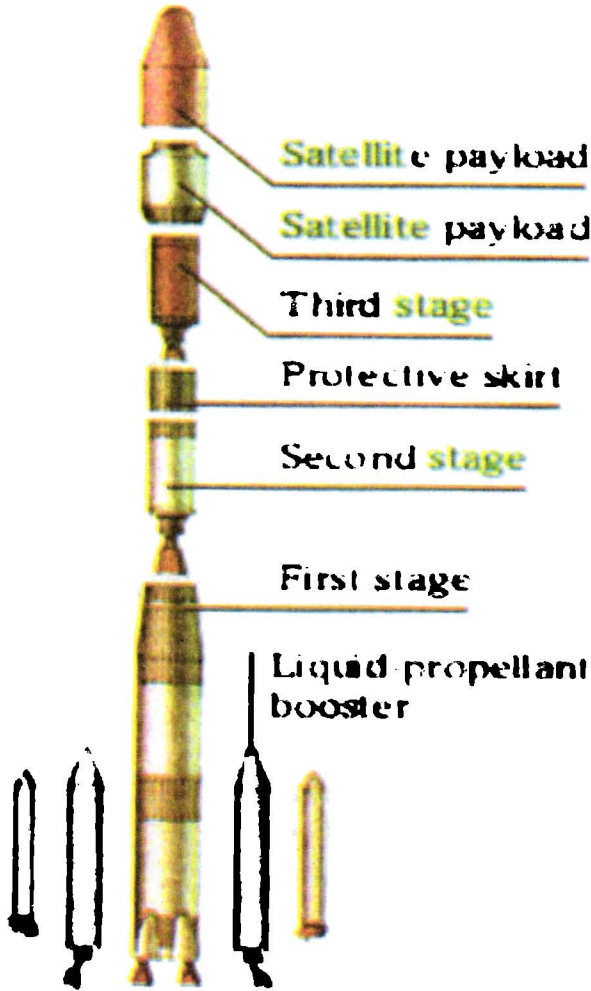
চিত্রঃ ১৫০

"নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানীসম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)

– বর্তমান রকেট প্রযুক্তিতে First stage, Second stage এবং Third stage নামক শক্তির উৎসের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে 'প্রচন্ড শক্তি' অর্জন করে তবেই রকেটগুলো স্যাটেলাইট বা অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে পৃথিবী এবং আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।
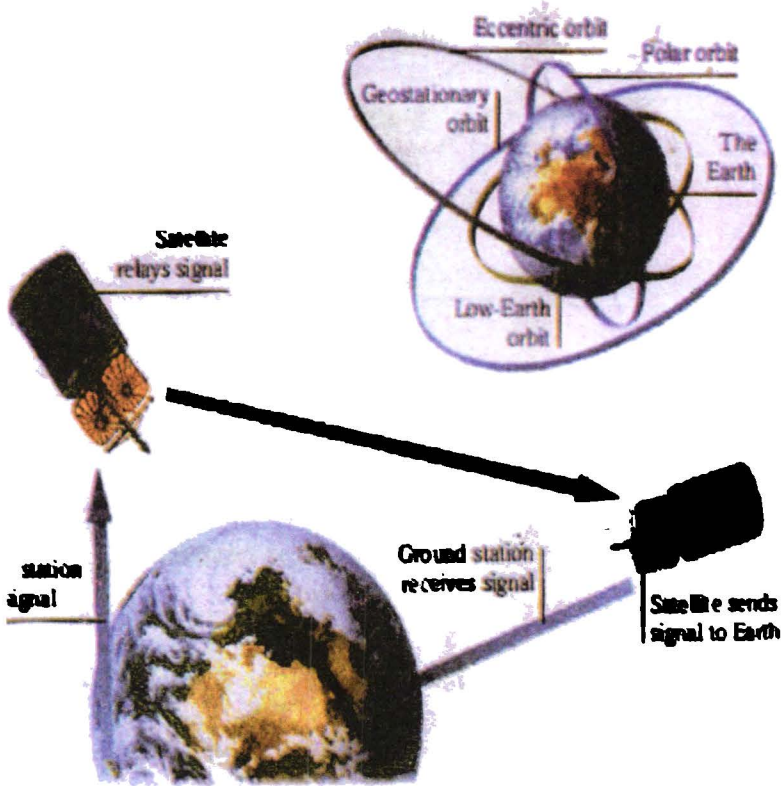
চিত্রঃ ১৫১

"এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

– ঘন্টায় প্রায় ২৮,০০০ কিঃ মিটার গতির 'প্রচন্ড শক্তি' সম্পন্ন রকেটের মাধ্যমেই কেবল আজকের আধুনিক বিশ্ব (Modern world) তার উপগ্রহগুলোকে (Satellites) পৃথিবীর চারদিকে মহাশূন্যে স্থাপন করে বিশ্ববাসীর বর্ণনাতীত উপকার সাধন করে চলেছে।

বর্তমান উক্ত রকেট প্রযুক্তি তার সার্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ আল্-কুরআনের পবিত্র বাণীসমূহকে সত্য-রূপ দিয়ে প্রমাণ করে চলেছে।
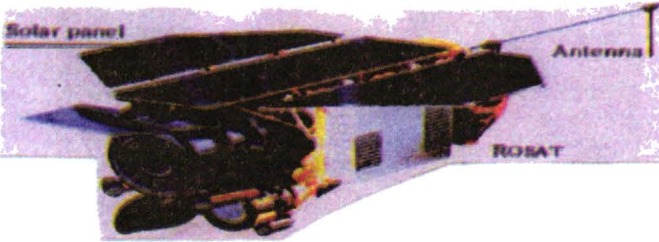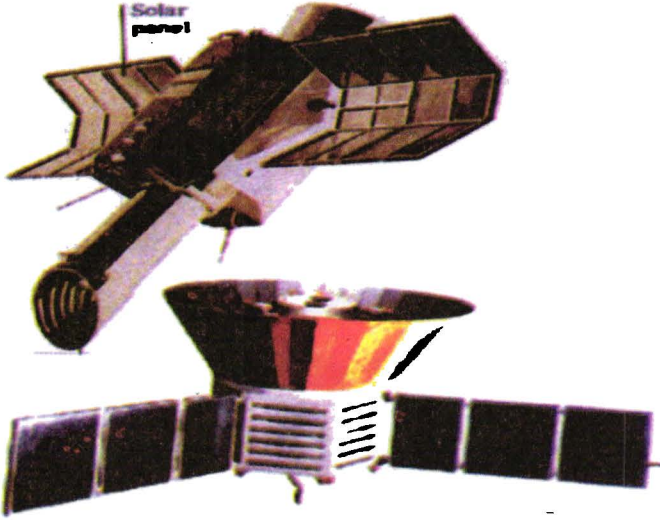
চিত্রঃ ১৫২

"তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করবে।"

(৮৪ ঃ ১৯)

–বর্তমান বিজ্ঞান Compton observatory, Cobe satellite, International ultra violet explorer, The Roentgen satellite সহ শত রকমের স্যাটেলাইট মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপন করে মহাবিশ্বের হাজারো বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর দৈনন্দিন অগণিত কল্যাণসাধন করে চলেছে। যা কেবল 'প্রচন্ডশক্তি' অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছে।
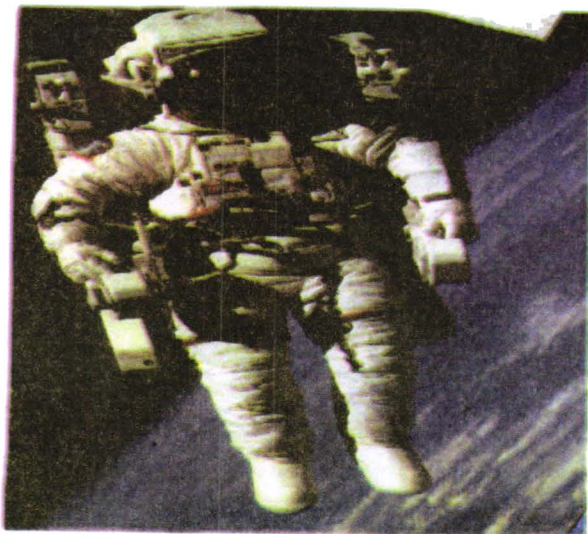
চিত্রঃ ১৫৩

"আমি ঐসব মানুষের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করে থাকি যারা স্মরণকারী এবং চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২)

– বর্তমান রকেট প্রযুক্তির 'প্রচন্ড ক্ষমতাকে' ব্যবহার করে রাশিয়ার 'Alexei Leonov' এবং আমেরিকার 'Edward white' পৃথিবী এবং নিকটবর্তী আকাশের সীমানা অতিক্রম করে মহাশূন্যে প্রথম পদচারণা (Space walk) করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং 'কুরআনের' বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবকে 'সত্য' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।
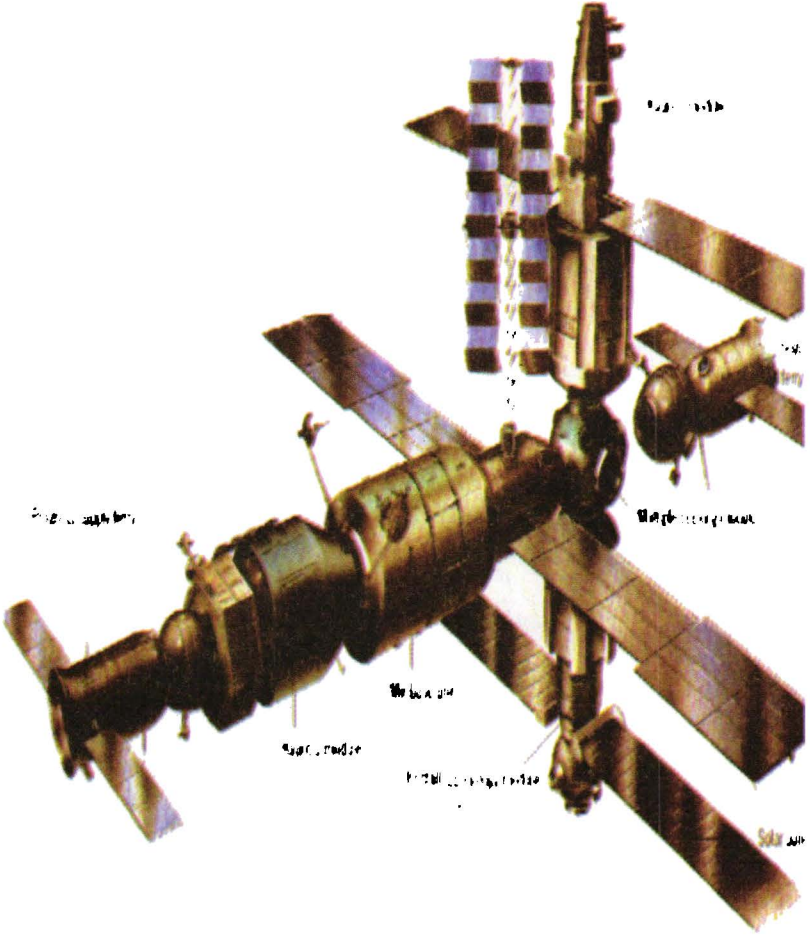
চিত্রঃ ১৫৪

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে ?" (৪০ ঃ ৮১)

– মহাশূন্যে রাশিয়ার Space station 'Mir' এ পর্যন্ত তৈরী সকল 'স্পেস স্টেশন'-র তুলনায় বেশ বড় এবং কর্মক্ষমতায়ও বেশ সফলতার পরিচয় ইতোমধ্যেই দিতে পেরেছে। কিন্তু রকেট প্রযুক্তির 'প্রচন্ড ক্ষমতা' আবিষ্কৃত না হলে পৃথিবী ও আকাশের সীমানার বাইরে মহাশূন্যে এ জাতীয় স্পেস স্টেশনের কথা কল্পনাও করা যেত না।

"এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

– পৃথিবী ও আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে মহাশূন্যে 'Space Station Mir' কে কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে দেখা যাচ্ছে।
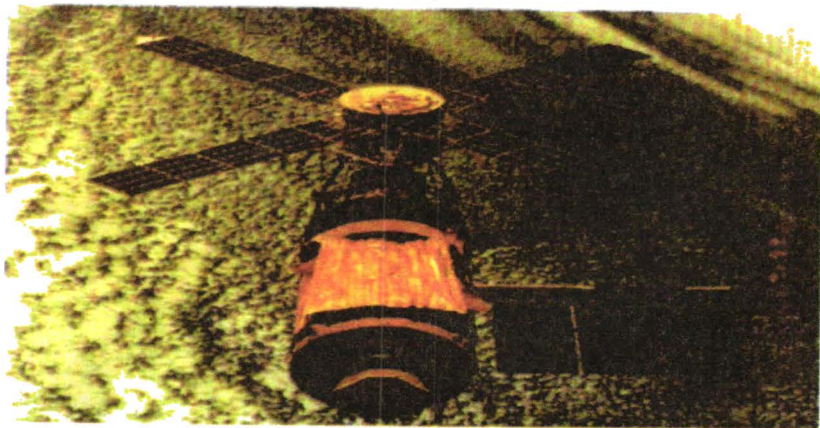
"নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁর প্রাপ্য।" (১৬ ঃ ৫২)

– মহাশূন্যে গবেষণাগার 'Skylab'-কে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত অবস্থায়, এক একটি মহাকাশ গবেষণাগার মহাকাশ বিজ্ঞানে এক একটি জ্ঞানের সোপান; প্রচন্ড শক্তি সম্পন্ন রকেটের সাহায্যেই কেবল পৃথিবীর Escape velocity কে পরাজিত করে এগুলিকে মহাশূন্যে স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। তাই যে উৎস বা সত্ত্বার কাছ থেকে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ উক্ত Escape velocity-র তথ্য মানবমন্ডলী লাভ করলো, বিনাশর্তে আনুগত্য তো একমাত্র তিনিই পাওয়ার যোগ্য।
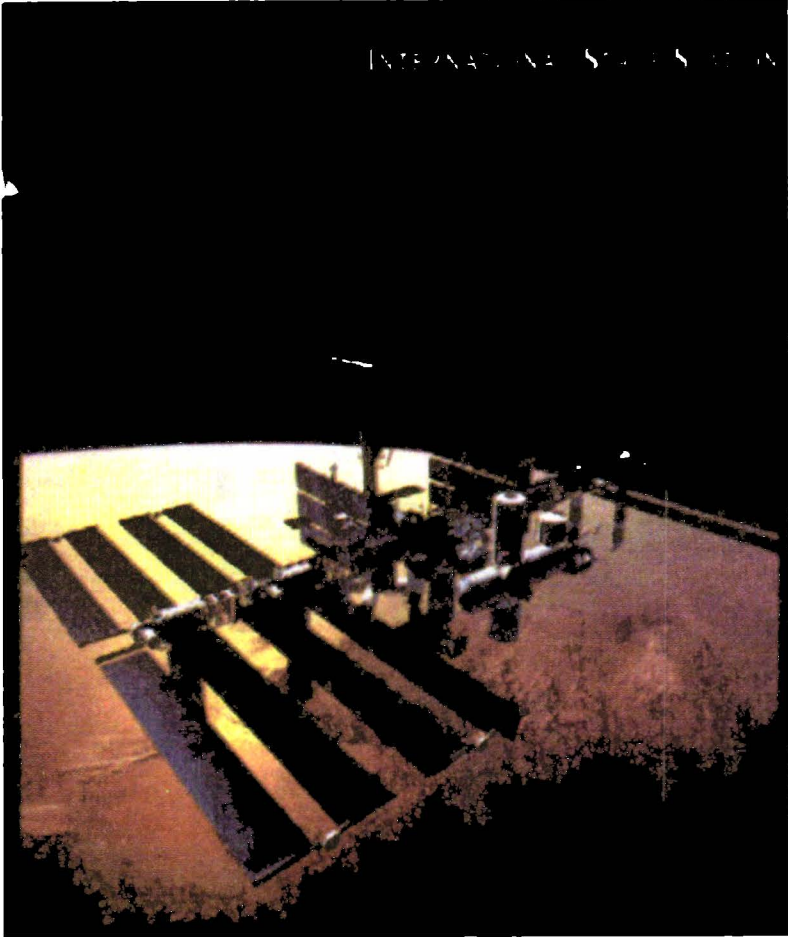
"কুরআন তোমাদেরকে জ্ঞান-চক্ষু হিসেবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে দেখতে পেলে সে নিজেরই কল্যাণসাধন করল।" (৬ ঃ ১০৪)

– ১৯৯৮ সাল থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে তৈরী হচ্ছে 'International Space station' গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ প্রথমবারের মত একটি নির্দিষ্ট অত্যাধুনিক Space station ব্যাবহার করার সুযোগ লাভ করবে। সর্বমোট ৪৫টি 'রকেট সফরের' মাধ্যমে উক্ত স্টেশনের সাজ-সরঞ্জাম পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে 'প্রচন্ডশক্তির' উপর নির্ভর করে মহাশূন্যে উঠানো হচ্ছে।
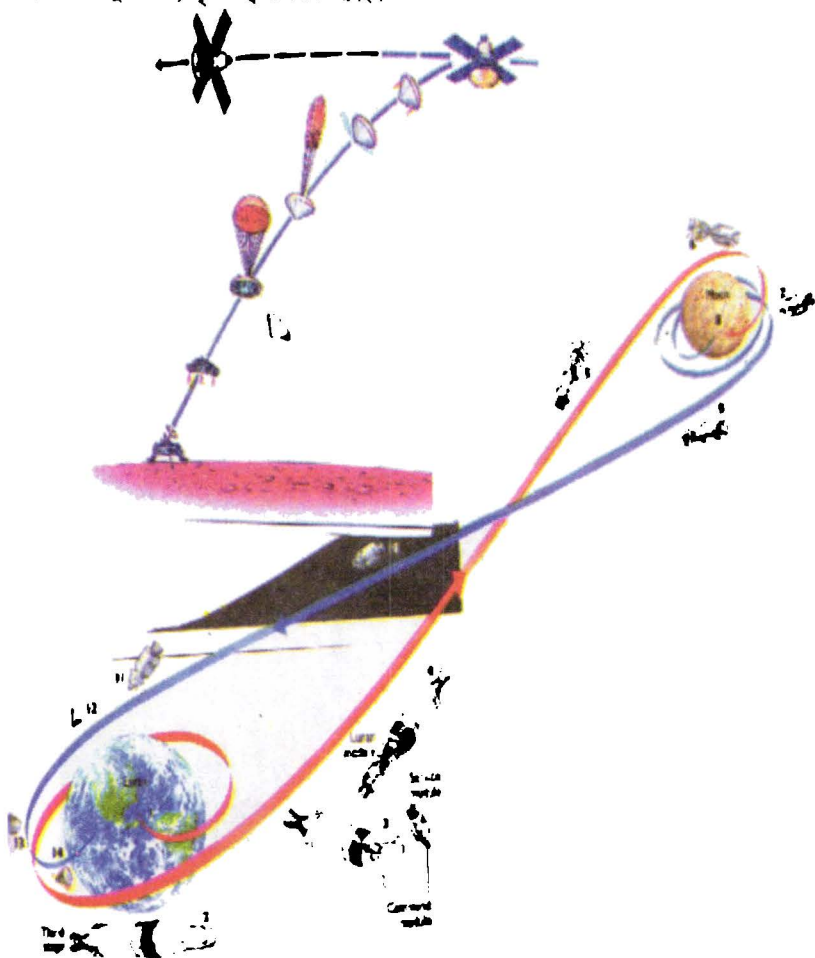
"তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত আছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

– পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত চাঁদের মাটিতে পৌঁছতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ রকেট প্রযুক্তিতে উৎপন্ন 'প্রচন্ড শক্তির' মাধ্যমে পৃথিবীর 'মুক্তিগতি' (Escape velocity) লাভ করে তবেই মহাশূন্যের দিকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে চন্দ্র বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হন।

APOLLO 16 LUNAR MISSION
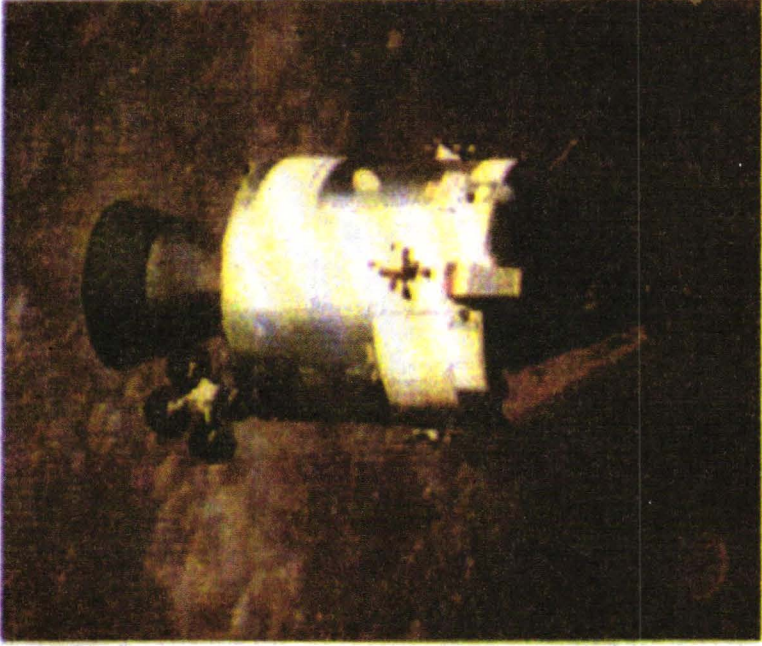
COMMAND AND SERVICE MODULES IN LUNAR ORBIT

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ ঃ ৮১)

– রকেটের সাহায্যে 'প্রচন্ডশক্তিতে' পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করে মানুষ পৃথিবী এবং স্থানীয় আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে 'মুডুলসে' করে চাঁদের পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রচন্ড 'গতিশক্তি' ছাড়া মানুষের পক্ষে মহাশূন্যে এ জাতীয় মিশন কখনই সম্ভবপর ছিল না। 'কুরআন' বর্তমান বিজ্ঞানের কত অগ্রে থেকে সেই মূল তথ্য সরবরাহ করেছে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।
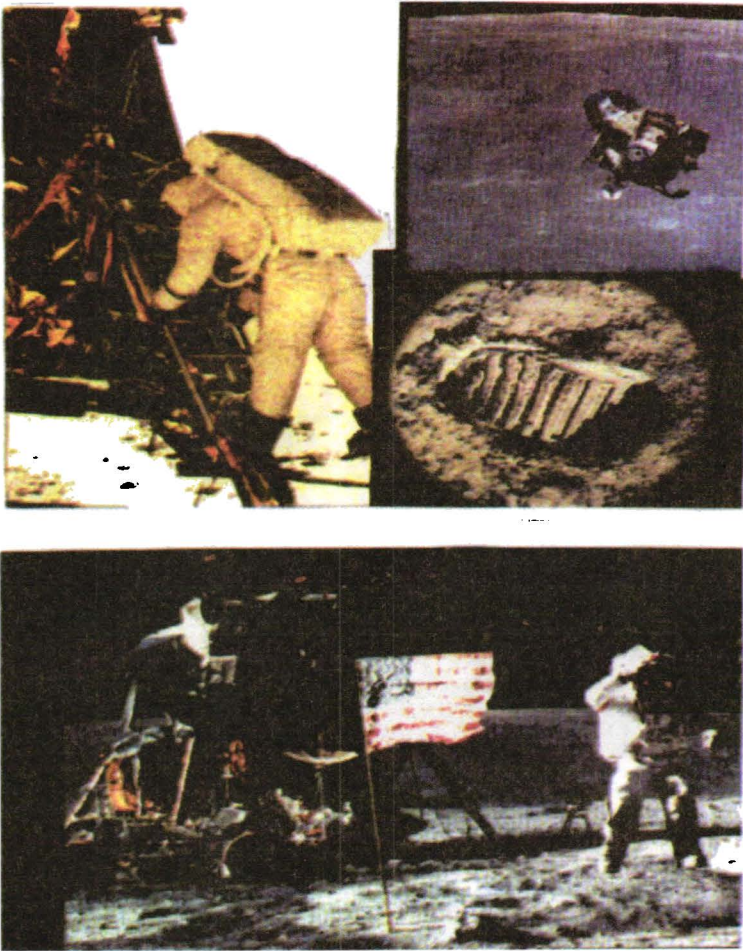
চিত্রঃ ১৬০

"এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্তাধীন, নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন।" (৪৫ : ১৩)

– 'এ্যাপোলো-১১' মিশন ওপরে উল্লেখিত পবিত্র ঐশীবাণীর বাস্তব প্রমাণ। চন্দ্রপৃষ্ঠে স্বশরীরে মানুষের পদার্পন মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন সংযোজন, যা মানুষের আয়ত্বাধীন ভিন্ন জগতে প্রথম পদচিহ্ন এবং প্রথম পদচারণা। এই বিজয় একই সাথে প্রমাণ করলো 'কুরআন' সত্য, কুরআন অবতীর্ণকারী 'মহান আল্লাহ্' সত্য এবং কুরআন যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তিনিও সত্য 'রাসূল'।
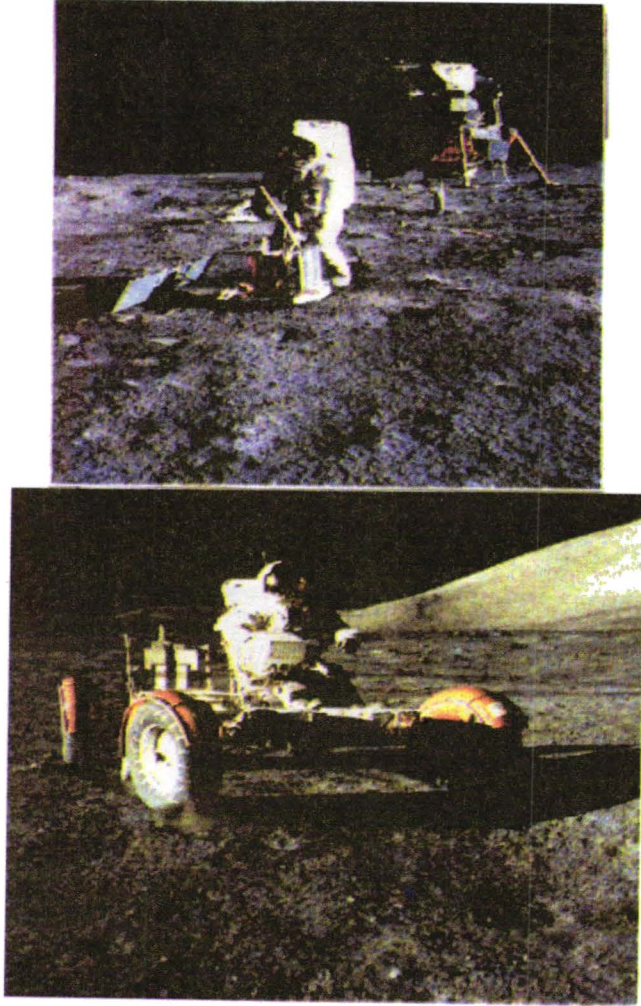
চিত্র ঃ ১৬১

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এ এক মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"অতএব হে জ্ঞানী সমাজ আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।" (৫ ঃ ১০০)

– পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে প্রতিটি মিশন-ই প্রমাণ করছে – আল্লাহ্‌র বাণী সত্য এবং বাস্তব। ছবিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে নভোচারীদের দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ঃ ১৬২

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করে কি অস্বীকার করতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৪)

– ১২ জন আমেরিকান নভোচারী, যারা কুরআনের বর্ণিত 'প্রচন্ডশক্তি' অর্জনের জন্য 'রকেট' ব্যবহার করে পৃথিবী এবং স্থানীয় আকাশের সীমানা অতিক্রম করে চন্দ্রপৃষ্ঠে অভিযান পরিচালনা করেন। এতে প্রমাণ হয় কুরআনের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবটি অদৃশ্য বিষয় হলেও পূর্ণ মাত্রায় সত্য এবং সঠিক।

"এগুলিই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১)
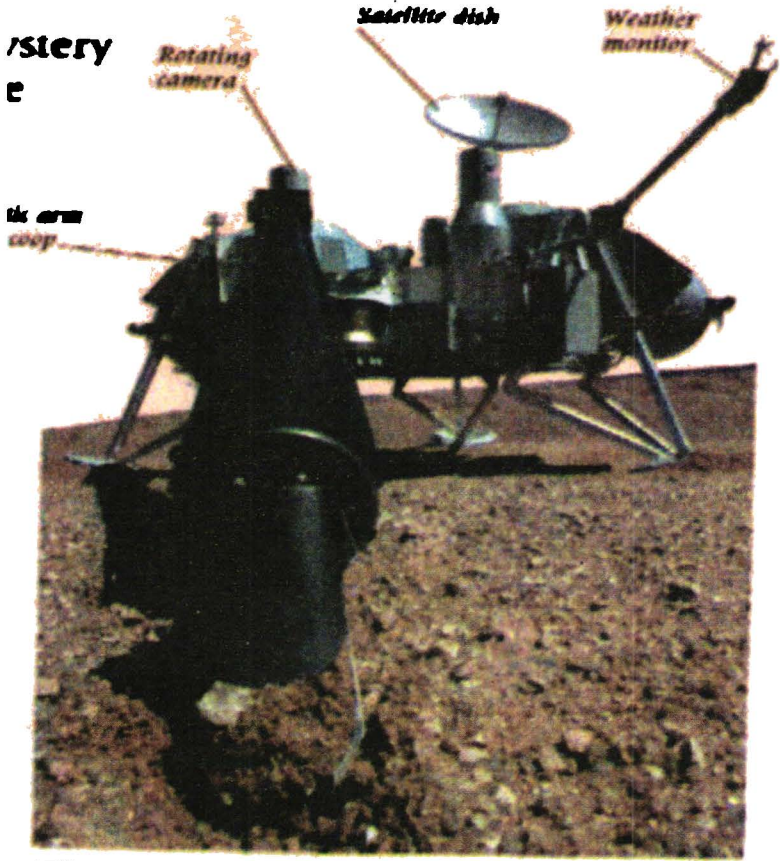
চিত্রঃ ১৬৩

"(রাসূল), তোমাদেরকে শুদ্ধ করছেন, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এবং তোমাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহ অবগত করছেন।" (১ ঃ ১৫১)

– পৃথিবী এবং স্থানীয় আকাশের সীমানা অতিক্রম করে মহাশূন্যে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি'র আকর্ষণ। কুরআন সেই মূল বিষয়ের প্রস্তাব খুবই জ্ঞানপূর্ণভাবে পেশ করেছে। বর্তমান বিজ্ঞান Escape velocity নামক 'প্রচন্ডশক্তি' অর্জনের পরেই বিভিন্ন গ্রহে তার মিশন পাঠাতে সমর্থ হয়েছে। ছবিতে Viking Lander কে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে মঙ্গলের মাটি পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।
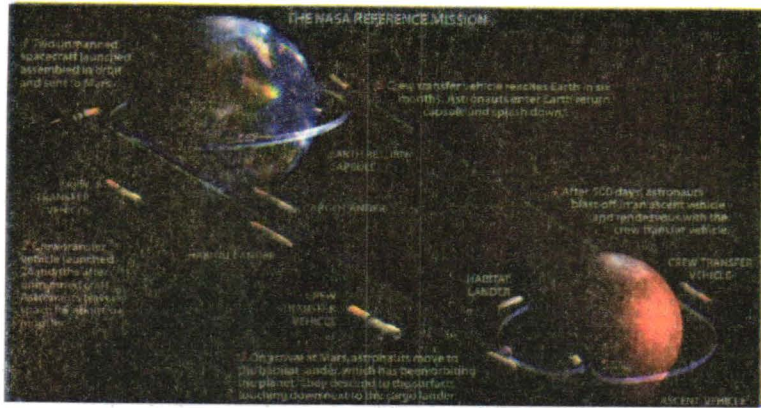
চিত্রঃ ১৬৪

"এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্ত্বাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)
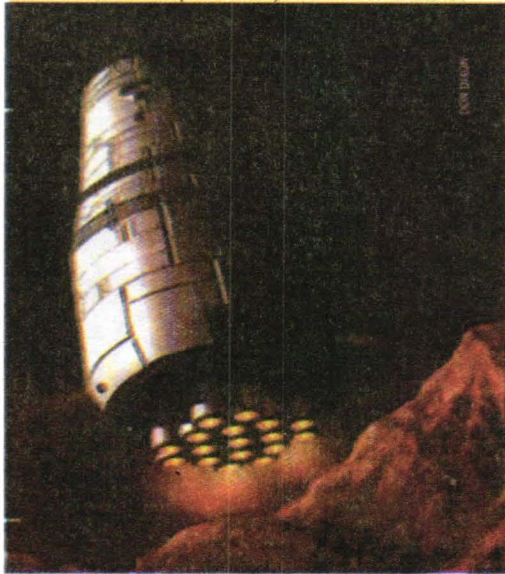
চিত্রঃ ১৬৫

– চলতি একবিংশ শতাব্দীতে মহাকাশ বিজ্ঞানে অন্যতম সাফল্য বয়ে আনবে মঙ্গলগ্রহে মানুষের স্বশরীরে পদার্পণে। প্রায় ছয় মাসের অনবরত এই আকাশ ভ্রমণে নভোচারীগণ পৃথিবী এবং নিকটবর্তী আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী 'প্রচন্ডশক্তি' সম্পন্ন Space ship ব্যবহার করবেন। ইতোমধ্যে উক্ত প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

চিত্র ঃ ১৬৬

"হে জ্বীন ও মানবসম্প্রদায় ! যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে পার হয়ে যেতে, তা হলে যেতে পার কিন্তু তোমরা তা কখনোই পারবে না 'প্রচন্ডক্ষমতা' অর্জন ব্যতিরেকে।" (৫৫ ঃ ৩৩)

– সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তাঁরই বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের অনুকূলে মহাকাশ বিজ্ঞানে এক ধাপ–এক ধাপ করে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ছবিতে মঙ্গলের মাটিতে মানুষের তৈরী আকাশযানের মাধ্যমে অবতরণের দৃশ্য অগ্রিম দেখানো হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'কুরআন' কিভাবে এত নিখুঁত ও সুক্ষ্ম পরিমাপে অদৃশ্য এই বিষয়গুলোর তথ্য দিয়ে গেল?

এ যেন ঝিনুকের মাঝে এক মহাসাগর প্রবিষ্ট করে রাখা হয়েছে। একটি বাণী অথচ বিজ্ঞানের হাজার বছরের সাফল্য তাতে নিহীত রয়েছে। সত্যিই "নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য।" (১৬ ঃ ৫২)

চিত্রঃ ১৬৭

"তিনিই মানুষকে অবহিত করেছেন, ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ ঃ ৫)

– বর্তমান বিশ্বে মানুষ উন্নতির ধাপে ধাপে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। চাঁদ এবং মঙ্গলের মাটিতে চলতি শতাব্দীতে কৃত্রিমভাবে জীবনময় কলোনী বা শহর গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' মহাবিশ্বকে মানুষের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, ফলে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে অনেক কিছুতেই সাফল্য লাভ করার চেষ্টা করছে 'মুক্তিগতি' অর্জনের মাধ্যমে।
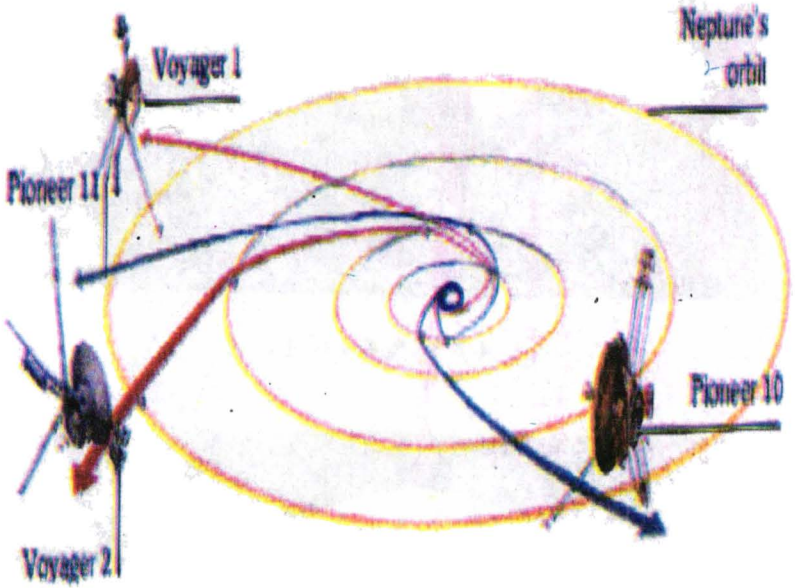
চিত্র ঃ ১৬৮

"তিনি এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সকল কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।" (৬৪ ঃ ৪)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (৬ ঃ ৬৭)

– পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার গোপন রহস্য 'Escape velocity' বা 'মুক্তিগতি' নামক 'প্রচন্ডশক্তি' ব্যবহারের তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে কক্ষপথ (Orbit), চাঁদ (Moon), অন্যান্য গ্রহ (Planets) সমূহে এমনকি বহির্জগত (Outer Space) সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য লাভ করার জন্য বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান মনুষ্যবিহীন 'Space Probe'–Pioneer এবং Voyager পর পর উৎক্ষেপন করে মহাকাশ বিজ্ঞানে সোনালী যুগের সূচনা করেছে। ইতোমধ্যেই পাইওনিয়ার গ্রুপ এবং ভয়েজার গ্রুপের প্রতিটি প্রুব (Probe) এক এক করে প্রতিটি গ্রহকে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট গ্রহ ও এর উপগ্রহসমূহের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যই সরবরাহ করেছে এবং করছে।

কি আশ্চর্য ! কুরআনে বর্ণিত একটি বাক্য (৫৫ ঃ ৩৩), যা বিজ্ঞানের সহস্র-লক্ষ বছরের গবেষণা এবং কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দিয়ে গেল এবং প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল, 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স'।
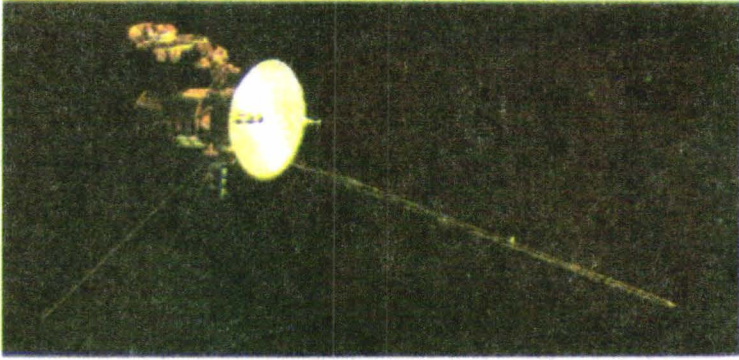
VOYAGER 2
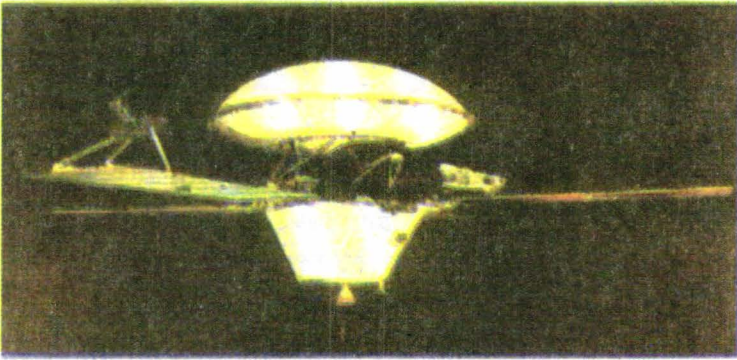
VIKING ORBITER AND LANDER

চিত্র ঃ ১৬৯

"আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা (বিবেকসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) জ্ঞান খাটায় না, যারা (স্ব-বাক হওয়া সত্ত্বেও) মূক এবং (শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বধির।" (৮ ঃ ২২)

– রকেটের সাহায্যে 'প্রচন্ডশক্তি' তথা Escape velocity অর্জন ছাড়া পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে ভাইকিং, পাইওনিয়ার, অথবা ভয়েজার কি মহাকাশে এভাবে পাড়ি জমায়ে বিজ্ঞানবিশ্বকে ধন্য করতে সমর্থ হতো? কক্ষনই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং কুরআন 'প্রচন্ডশক্তির' (Escape velocity-র) তথ্য ১৪০০ বৎসর পূর্বে পেশ করে মহাকাশ বিজ্ঞানের ভীত রচনা করেছে।
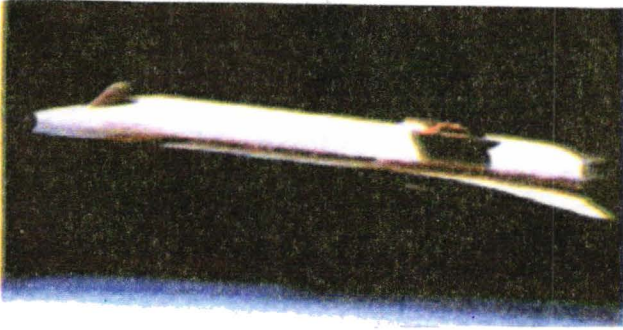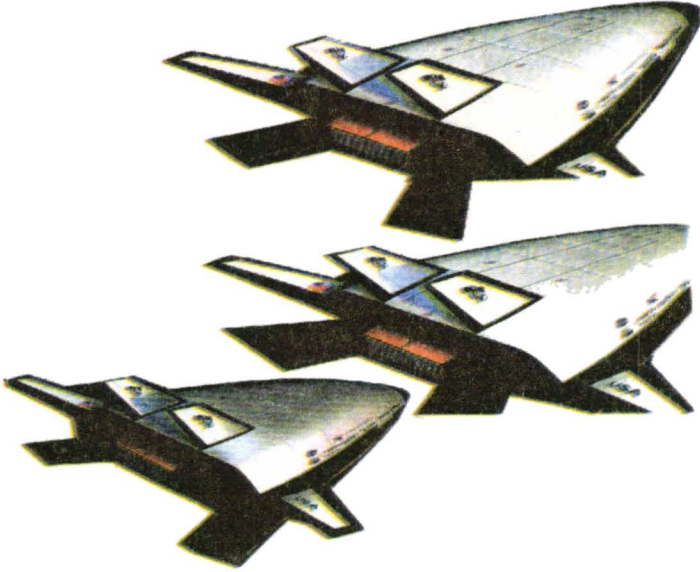
চিত্রঃ ১৭০

"তোমরা ধাপে ধাপে অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

– চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলোর গতির মাঝামাঝি গতি সম্পন্ন 'Space Ship' তৈরীর প্রকল্প হাতে নিয়ে বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে যাচ্ছেন। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মানুষ কল্পনার তরীকেও হয়তোবা বাস্তবে হাতের নাগালে পেয়ে যাবে এবং প্রমাণিত হবে 'আল্-কুরআন' সত্য এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রস্তাবক।
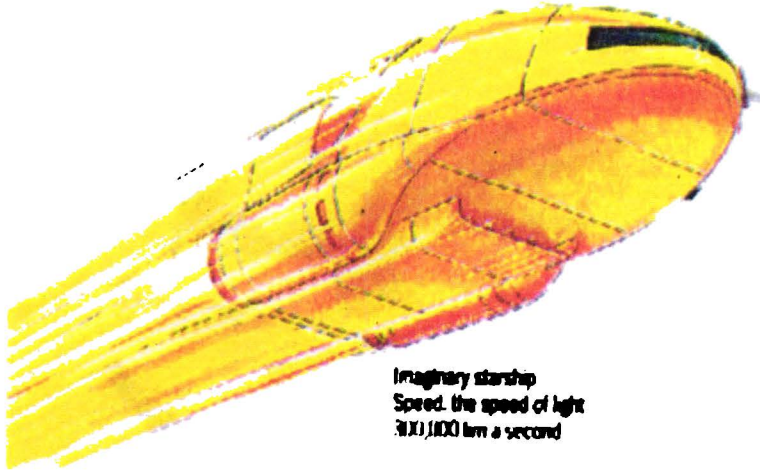
Space shuttle
Speed in orbit about 28,000 km/h

Jumbo jet
Cruising speed about 950 km/h

চিত্রঃ ১৭১

"তোমরা ধাপে ধাপে অবশ্যই (বিজ্ঞান বিষয়ে) উন্নতির প্রসার লাভ করবে।"

(৮৪ ঃ ১৯)

– চলতি শতাব্দীর শেষের দিকে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি সমান গতি সম্পন্ন 'Space Ship' তৈরীর নকসা এঁকে বিজ্ঞানীগণ প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা-ভাবনাও ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যেই নতুন Space ship তৈরীর উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। অথচ একেবারে সাদা-মাটা হিসাবেও নজরে পড়ে যে এই আলোর গতি সম্পন্ন প্রচন্ড ক্ষমতাধর আকাশযানটিও আমাদের সৌরজগত এবং নিকটবর্তী দু'একটি নক্ষত্রে হয়তোবা অভিযান চালাতে সমর্থ হবে, কিন্তু এর বাইরে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেননা লোকাল গ্রুপের সদস্য আমাদের 'মিলকি ওয়ে' গ্যালাক্সীর ভিতর প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে যে নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের খুবই নিকটবর্তী, তার দূরত্ব হচ্ছে ৪.৩ আলোকবর্ষ। এখন পৃথিবী থেকে নতুন আবিস্কৃত আলোর গতি সম্পন্ন Space shipe দিয়েও যদি ঐ নক্ষত্রে অভিযান শুরু করা হয়, তাহলে Space shipeটি নভোচারীদের নিয়ে আলোর গতিতে ঐ নক্ষত্রে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা কার্য সম্পাদন করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে সময় লেগে যাবে কম পক্ষে ১০ বৎসর। মানুষের এই সংক্ষিপ্ত হায়াতে আলোর গতি সম্পন্ন মহাকাশ যান দিয়েও নিজ গ্যালাক্সীতে অন্যান্য নক্ষত্রে অভিযান চালাতে যেখানে ব্যর্থ, সেখানে মিলিয়ন-মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের গ্যালাক্সী সমূহে অভিযান চালাবে কিভাবে? এ এক বিরাট প্রশ্ন ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীমহলকে হিমশিম খাইয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি আলোর গতির চাইতেও কয়েক গুণ বেশি গতি সম্পন্ন অকল্পনীয় ক্ষমতাশালী মহাকাশযান (Space ship) উদ্ভাবন ছাড়া আন্ত:মহাকাশীয় ভ্রমন কখনই সম্ভবপর হবে না? উত্তর একটাই – হাঁ, তবে বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অর্থাৎ শত-শত আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রসমূহে এবং মিলিয়ন-মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সীসমূহে অভিযান চালাবার জন্য সত্যিকার অর্থে আলোর গতির কতগুন বেশি গতি সম্পন্ন মহাকাশযান তৈরী করা প্রয়োজন– সে হিসাব করার সময় এখনও আমাদের সামনে আসেনি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'Theory of relativity' কিন্তু আলোর গতির চাইতে দ্রুত গতি অনুমোদন করে না। এই Theory বলে যে, যদি কোন বস্তু আলোর গতির চাইতে আরো দ্রুত গতি লাভ করতে পারে, তাহলে বস্তুটির আয়তন শূন্যের কোঠায় চলে যাবে, আসল আকৃতি হারিয়ে ফেলবে পরিণামে বস্তুর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে কুরআন কিন্তু দাবী করেছে যে, মানুষ চেষ্টা করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আন্তঃমহাকাশীয় অভিযান সফল করে তুলতে পারবে। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা করুণা করে মহাবিশ্বের সকল কিছুকে মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। যদিও এখন এই মুহূর্তে বিজ্ঞান মস্তিস্কে

বিষয়টি সমাধানের কোন চিহ্ন ফুটে উঠেনি, তথাপিও অধুনা ভিন্ন জগতের 'UFO'দের পৃথিবীপৃষ্ঠে আনা-গোনায় বিজ্ঞানীগণ
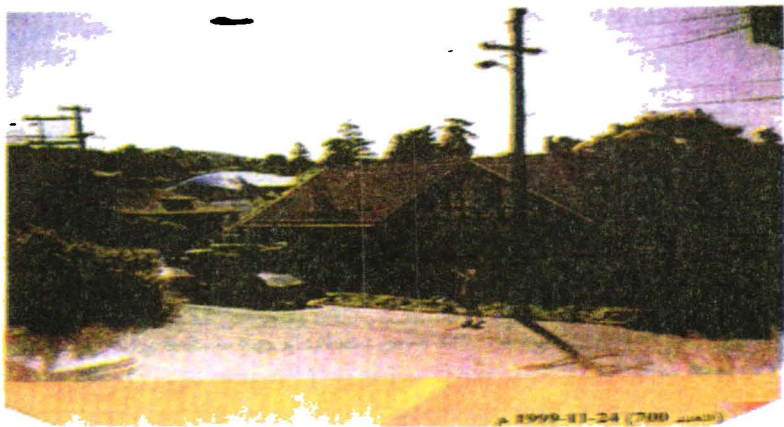
চিত্রঃ ১৭২

"যারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন।" (১৭ ঃ ৫৫)

– বিগত শতাব্দীতে সময়ে সময়ে ভিন্ জগৎ থেকে আগত (ধারণা করা হচ্ছে) উড়ন্ত সসারের রহস্য উন্মোচিত হলেও পৃথিবীর মানুষের জন্য স্বল্প সময়ে মহাকাশের দ্বার আরও ব্যাপকভাবে খুলে যাবে।

আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে পৃথিবীর মানুষ নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির প্রসার ঘটিয়ে স্বশরীরে Space ship-এ করে মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের আন্তঃমহাকাশীয় অবস্থানে ভ্রমণ অভিযান সফল করে তুলতে পারবে। আমাদের এই পৃথিবীতে ইতোমধ্যেই ভিন্ন জগত থেকে আগত UFO (সসার) গুলো সে আশার আলোই ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই UFO গুলোর মূল রহস্য যেদিন মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে, সেদিন থেকেই মানুষের জন্য মহাবিশ্বের সকল দুয়ার খুলে যাবে। এ ছাড়াও বর্তমান বিজ্ঞানীমহল মহাকাশে 'Warm hole' এবং 'Black hole' সম্পর্কেও আশাবদী। তাদের ধারণা এ জাতীয় কোন 'সুড়ঙ্গ ব্যবস্থাপনা' মহাকাশে অবশ্যই থেকে থাকবে। যেগুলির এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেই মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষের পথ অতিক্রম করে অন্য প্রান্ত দিয়ে ভিন্ন কোন গ্যালাক্সীয় অঞ্চলে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।
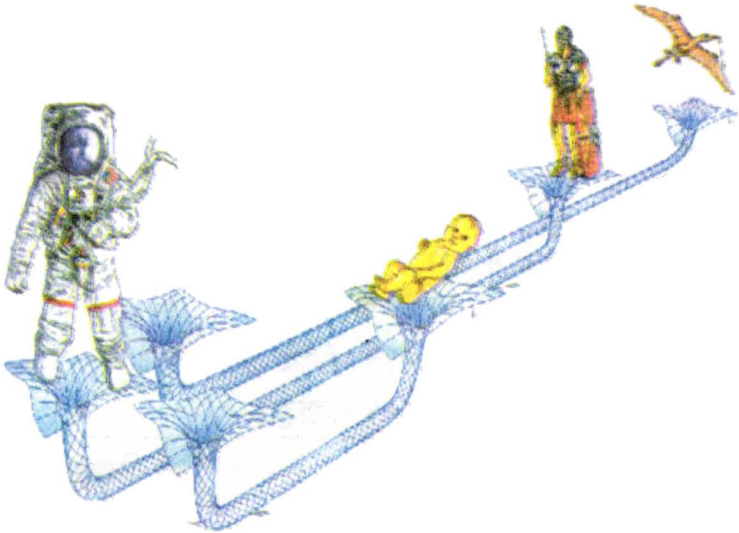
চিত্রঃ ১৭৩

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন।"

(২৫ ঃ ৬)

– সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে হয়তবা Black hole কিংবা Warm hole (অনুমানকৃত) প্রকাশিত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণে অবদান রাখবে।

আগামী দিনগুলোতে এই বিষয়ে যে কোন পথই উম্মক্ত হউক না কেন সকল অবস্থায় মহাকাশযানকে অবশ্যই অকল্পনীয় 'প্রচন্ড শক্তি ও ক্ষমতার' অধিকারী যে হতেই হবে – তাতে বিজ্ঞানীমহল একমত। কারণ Warm hole-এ Space ship কে প্রচন্ড শক্তির প্রতিক্রিয়া থেকে যেমনি বাঁচতে হবে, ঠিক তেমনি Black hole যদি সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে তাহলে–সেখানে অভিকর্ষের মৃত্যুকুপ হতেও বাঁচার জন্য মহা ক্ষমতার আবরণে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিষয়টির জটিলতা এতই নাজুক যে ঠিক এই মুহূর্তেই তার সমাধান পেশ করা বর্তমান প্রযুক্তির আলোকে সত্যই বড় কঠিন ব্যাপার। তবে বিজ্ঞান দিন দিন যে অগ্রগতি লাভ করছে এবং বিজ্ঞানীমহলে 'Warm hole, Black hole' ও UFO সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠ্ছে, তাতে আগামী দিনে সবাই আশাবাদী যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কিংবা আঞ্চলিক আকাশ সীমা থেকে (আমাদের সৌরজগত আঞ্চলিক আকাশ সীমার অন্তর্গত) 'মহাবিশ্বে' মানুষ তার অভিযান সফল করে তুলতে পারবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান মহাকাশ অভিযানে যে রকেট প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে–সে সম্পর্কেও মানুষ এক সময় অন্ধকারে ছিল, অথচ এখন এই 'রকেট' পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন কর্তৃক সৃষ্ট ১১কিঃ মিঃ / সেকেন্ড, 'Escape velocity'-র বিপরীতে ঘন্টায় প্রায় ২৮,০০০ কিঃ মিটার – প্রচন্ড গতি সৃষ্টি করে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। উপরে আলোচিত আন্তঃমহাকাশীয় ভ্রমণও এই জাতীয় কোন পদ্ধতিতে প্রচন্ড ও বিশাল ক্ষমতার অধিকারী আকাশ যান দিয়েই কেবল সম্ভব হতে পারে – এ ব্যাপারে বিজ্ঞান নিশ্চিত এবং আশাবাদী।

এবার পুরো বিষয়টিকে পাশাপাশি গুছিয়ে এনে দেখিঃ

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল তাঁরই, তাঁর জ্ঞানের নিরূপণ কারো সাধ্যের মধ্যে নয়।" (৭২ ঃ ২৬)	(১) অদৃশ্যের জ্ঞান, 'বিজ্ঞানের' নেই। তবে তার চলার পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণে যদি অদৃশ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে তা স্বীকার করে।

(২) "তিনি গোটা জমিনকে তোমাদের জন্য অনুগত (এমন শক্তি সম্পন্ন) করিয়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পৃথিবীর যে কোন অংশেই চলা-ফেরা করতে পার (যেন ছিট্‌কিয়ে পড়ে না যাও)।" (৬৭ ঃ ১৫)	(২) বিজ্ঞান পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে প্রমাণ করেছে এবং স্বীকার করেছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষসহ সকল কিছুর অবস্থান, চলাফেরা কাজ-কর্ম সবকিছুই যে উক্ত শক্তির কারণেই সম্ভব হচ্ছে তাও স্বীকার করে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সব কিছুই মহাশূন্যে ছিটকে' হারিয়ে যেত তাও মেনে নেয়। ১৮৬৫ সালে 'নিউটন' মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন।
<u>(৩) "হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায় ! যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে পার হয়ে যেতে, তা হলে যেতে পার, কিন্তু তোমরা তা কখনোই পারবে না 'প্রচন্ডক্ষমতা' অর্জন ব্যাতিরেকে।" (৫৫ ঃ ৩৩)</u>	(৩) পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে চাইলে স্বাভাবিকভাবে তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে কোন বস্তুকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে চাইলে একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১১ কিলোমিটার/সেকেন্ড, 'মুক্তি গতি' অর্জন করতেই হবে। কারণ পৃথিবীর 'মুক্তি গতি' (Escape velocity) প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটার। আর প্রচন্ড ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন ছাড়া ১১ কিঃ মিটার/ সেকেন্ড গতি লাভ করা যে অসম্ভব তা বর্তমানে সর্বত্র স্বীকৃত। বর্তমান 'রকেট' প্রযুক্তি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।
(৪) "তোমরা অবশ্যই ধাপে-ধাপে (বিজ্ঞান বিষয়ে) উন্নতির	(৪) ১৮৬৫ সালে 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' কর্তৃক মধ্যাকর্ষণ

প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ : ১৯)	শক্তি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে সাফল্য জনকভাবে Sputnik-1 নামে রকেট রাশিয়া কর্তৃক প্রথম মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়।
"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ : ৮১) "এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করেছেন আয়ত্তাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন।" (৪৫ : ১৩)	১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ান নভোচারী 'ইউরি গ্যাগারিন' এবং ১৯৬২ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকান নভোচারী 'জন গ্ল্যান' রকেটের মাধ্যমে 'প্রচন্ডশক্তি' সৃষ্টি করে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং পৃথিবীর চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করে আসেন। ১৯৬৯ সালে ২০শে জুলাই 'Nail Armstrong' এবং 'Buzz Aldrin' প্রচন্ড শক্তির রকেট দিয়ে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণকে পরাজিত করে প্রথম বারের মত চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত করেন। ১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ প্রথম রাশিয়ান নভোচারী 'Alexei Leonov' এবং ১৯৬৫ সালের ৩রা জুন আমেরিকান নভোচারী 'Edward White' প্রথম মহাশূন্যে পদচারণা (Space Walk) করেন।
"তিনিই মানুষকে অবহিত করেছেন, ইতোপূর্বে যা সে জানত না।" (৯৬ : ৫)	১৯৭৬ সালের ২০শে জুলাই সর্বপ্রথম (মার্কিন) মনুষ্য তৈরী

	(Man Made) Space Craft Viking-1 সাফল্যজনকভাবে মঙ্গল গ্রহের মাটি স্পর্শ করে।
	১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই মার্কিন এবং রাশিয়ান নভোচারীগণ তাদের Space ship-কে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় পাশাপাশি Docking করে করমর্দন করেন এবং পরস্পর মিলিত হন।
"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)	১৯৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী স্মরণকালের বৃহৎ মহাশূন্য Space Station – 'Mir' রাশিয়ার পক্ষ থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।
	১৯৯০ সালের ২৪শে এপ্রিল সর্ব প্রথমবারের মত Hubble Space Telescope মহাশূন্যে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার উপরে সংস্থাপন করা হয়।
"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (৬ ঃ ৬৭)	১৯৯৫ সালের ২২শে মার্চ রাশিয়ান নভোচারী 'Valeri Poliakov' এক নাগাড়ে ৪৩৮ দিন মহাশূন্যে অবস্থান করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন।
	১৯৯৮ সালের ২০শে নভেম্বর এ যাবৎ কালের জন্য সর্ব বৃহৎ প্রথম International Space Station-এর মালামালসহ অসংখ্য ফ্লাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। এছাড়াও মানুষ ইতোমধ্যে মহাশূন্য বিষয়ক অগণিত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

	‘প্রচন্ডশক্তি’ নামক ‘Escape velocity’ (১১ কিঃ মিটার/-সেকেন্ড) অর্জন করার পরই কেবল মানবসমাজের সামনে মহাকাশের উল্লেখিত অসংখ্য রহস্যের দ্বার খুলে যায় এবং তারা সফলতা লাভ করে চলেছে।
(৫) “আল্‌-কুরআন বিজ্ঞানময়।” (৩৬ ঃ ২) “এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।” (১০ ঃ ১) “কুরআন তোমাদেরকে জ্ঞান-চক্ষু হিসেবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে দেখতে পেল, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল।” (৬ ঃ ১০৪)	(৫) ১৪০০ বৎসর পূর্বে সর্বোচ্চ জ্ঞানের উৎস থেকে আগত ঐশীবাণী কুরআন, বর্তমান পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে তাই হয়ে গেল–‘বিজ্ঞান’। সুতরাং ‘আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স’ প্রমাণিত ও যথার্থ।
(৬) “তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞান সম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করে কি অস্বীকার করতে পার?” (৫৫ ঃ ৩৪)	(৬) যে কোন উৎস থেকেই আগত সত্য সঠিক ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবকে বিজ্ঞান অতি সম্মানের নজরেই মূল্যায়ন করে এবং যথাযথ সম্মানও প্রদর্শন করে থাকে; কিন্তু মানবসম্প্রদায়ের হীনমন্যতাই ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিকুলতা সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে। সঠিক বিজ্ঞান সর্বদাই সত্যের পক্ষে।
(৭) “আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এ এক মহা সাফল্য।” (১০ ঃ ৬৪)	(৭) কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে বর্তমান বিজ্ঞান পর্যন্ত ব্যবধান প্রায় ১৪০০ বৎসর হওয়ার পরও কুরআনের বৈজ্ঞানিক

"তোমরা প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন। (৬ ঃ ১১৫) "এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)	প্রস্তাবসমূহ বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম ও নাজুক পরিমিতির মাপকাঠিতে এতটুকুও কোন পরিবর্তন হয় না। এতে প্রমাণিত হয় সর্বকালদ্রষ্টা অদৃশ্য কোন এক সত্তার এর পিছনে মুখ্য ভূমিকায় নিয়োজিত আছেন। আর তাঁর বাণী সত্য হলে তাঁর অস্তিত্বও সত্য হতে বাধ্য।

"মূলতঃ গোলামদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (৩৫ ঃ ২৮)

"অতএব হে জ্ঞানীসমাজ! আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

ওপরের 'মহাকাশ অভিযান' অধ্যায়ের দীর্ঘ পর্যালোচনায় প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অবৈজ্ঞানিক যুগে 'কুরআন'-এর পেশকৃত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব 'মুক্তিগতি' (Escape velocity) বিষয়ে বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞান (Space Science) শুধু প্রমাণ-ই করেনি; অধিকন্তু ঐ 'মুক্তিগতি'র ওপর নিজের ভীতও রচনা করেছে যেন ভবিষ্যতে এর ওপর ভিত্তি করে অগণিত মহাকাশবিজয়কে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে পারে।

সুতরাং 'আল-কুরআন' ও বর্তমান 'উৎকর্ষিত বিজ্ঞান' যে একই মূল উৎস থেকে উৎসারিত সে কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। এ অবস্থায় এক ও একক সত্ত্বা 'মহান আল্লাহ'র সম্মুখে অবনত হওয়াই শ্রেয়।

সমাপ্তি কথা

১৮৮০ সাল থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। সেই অগ্রযাত্রার শুরু থেকেই 'বস্তু' এবং 'গতি' (Motion)-ই এই মহাবিশ্বের মূল চালিকাশক্তি, বিজ্ঞানীদের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। তারা বিশ্বাস করতো ঐ বস্তু এবং গতি বিশৃংখল অবস্থার ভিতর দিয়েই পরিকল্পনাহীনভাবে মহাবিশ্বকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই মহাবিশ্বে অবস্থান করে 'মহাসত্য' নামক না কোন 'সত্ত্বার' কথা চিন্তায় আনা যায়, না চূড়ান্ত বা শেষ পরিণতি নামক কোন শাস্তিমূলক অবস্থা সম্মুখে আসতে পারে সে কথা ভাবা যায়? অবস্থার তান্ডবে বিজ্ঞানের বিপরীতে কথা বলার কোন সুযোগই ছিল না। এভাবে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিবেশে বস্তুবাদ গোটা মানবসমাজকে প্রভাবান্বিত করে সম্পূর্ণরূপে বাধ্যগত করে নিয়েছিলো।

তারা আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল–'দৈব বা বিশৃংখল' অবস্থায় জন্ম নেয়া এই মহাবিশ্বের সকল স্তরেই কেবল 'Survibal of the fitest' -কেই অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য আরও ১০০টি প্রাণীর মত 'মানুষ' নামধারী এই বনী আদমের জীবন নির্বাহ করাই যুক্তিযুক্ত। এক কথায় আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাসা-ভাসা কিছু অস্পষ্ট তথ্যকে সম্বল করে বিজ্ঞানীগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের ব্যক্তিগত, অপরিপক্ক, কাল্পনিক ও অপরিণামদর্শী মতামতকে বিজ্ঞানের 'মোড়কে' সাজিয়ে মানবসমাজে ছড়িয়ে দেন। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ইনিষ্টিটিউশনগুলোকে বাস্তবতার অন্তরায় আখ্যা দিয়ে ধূলিস্যাত করেন। ধর্মীয় সকলপ্রকার আবেগকে স্থায়ীভাবে রহিত করার চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

প্রায় শত বৎসর বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানতার ইমেজে কাটাবার পর বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে জাগ্রত হয়ে তারা দেখতে পেলেন তাদেরই প্রতিটি আবিষ্কার সুস্পষ্ট প্রমাণভিত্তিক মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টার অদৃশ্য ছবিকে (উপস্থিতিকে), তাঁর হাতের কাজকে, তাঁর পবিত্র ঐশীবাণী সম্ভারকে দিবালোকের স্পষ্ট আলোতে সত্যায়িত করে ভূ-পৃষ্ঠে মানবমন্ডলীর জ্ঞানের রাজ্যে দৃঢ়ভাবে বিছিয়ে গেছে।

এই পর্যায়ে বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের অবস্থা হয়েছিল গ্রামের সেই নির্বোধ শিশুটির মত–যে শিশুটি মুরগীর বাচ্চার ডানায় প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি 'পর' গজাতে দেখে চিৎকার দিয়ে সবাইকে জড়ো করে বলেছিল 'এটি মুরগীর বাচ্চা নয়, অন্য কিছু হবে। কারণ ওর শরীরের কোথাও 'পর' না গজিয়ে শুধু পাখায় কয়েকটি 'পর' গজিয়েছে।' বয়স্করা জ্ঞানের কারণে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কোন কথা না বলে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে স্থান ত্যাগ করেছিল। আর শিশুটি তাদের এহেন আচরণে হতবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল নয়নে তাকিয়ে ছিল। অতঃপর কিছুদিন যেতে না যেতেই শিশুটি আর মুরগীর বাচ্চাটিকে চিন্‌তে পারল না, কারণ ইতোমধ্যেই বাচ্চাটির সমস্ত শরীরে রং-বেরংয়ের অসংখ্য 'পর' গজিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শিশুটি এ অবস্থায় পুরো বিষয়টি উপলব্ধি করে বিড়-বিড় করে বলতে থাকলো–'আমি এখনো ছোট মানুষ, তাই সবকিছুই এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।'

দুর্ভাগ্য আমাদের সেই একতরফাভাবে ভাবুক বিজ্ঞানবাদীদের, যখন তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তদস্থলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে দেয়ার ব্যর্থ কসরত করেছিল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তর ছিল শৈশবকাল; বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা ও গবেষণার সবেমাত্র যাত্রা শুরু হয়েছিল। অসম্পূর্ণ জ্ঞান তখন মানবমন্ডলীকে বানিয়ে দিয়েছিল–ধর্মহীন, আদর্শহীন এক নিরেট রাসায়নিক সংমিশ্রণজাত বস্তুতে। হাজার হাজার বছর ধরে একজন স্রষ্টার নামে মানবসমাজে যে ভীত্ রচিত হয়েছিল, বস্তুবাদী-বিজ্ঞান সে ধারণার ভীত্ কিছুটা নাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপকতর বাস্তব প্রসার ঘটায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন অগণিত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, 'কৃত্রিম মরু ধূলীঝড়' সৃষ্টিকারী পূর্বের বিজ্ঞানীমহল কথা বলার শক্তি-ই হারিয়ে ফেলেছেন।

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে মিথ্যার আবর্জনা সত্যকে জোরপূর্বক ঢেকে রাখলেও বর্তমান বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রার কারণে মহাবিশ্বের মহাজাগতিক বিষয়সমূহ এক এক করে আবরণ সরিয়ে প্রকাশিত হয়ে মহাসত্যের দিকে মানবজাতিকে ডাক দিয়ে চলেছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি আবিষ্কার-ই স্পষ্ট আলোতে ঐশীগ্রন্থ 'আল্-কুরআনকে' সম্পূর্ণরূপে 'সত্যগ্রন্থ' হিসাবে সত্যায়িত করছে এবং আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে, তাই এই জ্ঞানপূর্ণ

অবস্থান উপলব্ধি করার পরও যদি কেউ 'মহাসত্যকে' ধারণ করতে না পারে, তা'হলে সত্যিই সে দুর্ভাগা।

সত্য উপলব্ধির জন্য সর্বকালের সকল মানুষের মন উন্মুক্ত হোক- এই কামনাসহ এই সিরিজের অন্যান্য বই উপস্থাপনার আশ্বাস রেখে এখানেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

"ওমা তাওফিকী ইল্লা-বিল্লাহ্"

Glossary – (পরিভাষা সংগ্রহ)

Atom (পরমাণু)ঃ বস্তুর উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

Asteroid (গ্রহানু)ঃ ছোট পাথুরে বস্তু বা শীলাখন্ড যা সূর্যকে কেন্দ্র করে এর চতুর্দিকে আবর্তন করে থাকে। সৌরজগতের ভিতর মঙ্গল এবং বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে লক্ষ-লক্ষ শীলাখন্ড দিয়ে বিরাট বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। তাছাড়া শনিগ্রহের চতুর্দিকেও অনুরূপ পাথুরে-শীলাখন্ডের বেল্ট বর্তমান আছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান)ঃ মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যত প্রকার বস্তু বর্তমান আছে, এদের বিজ্ঞানভিত্তিক (Scientific) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-ই (Study) হচ্ছে 'এ্যাস্ট্রোনোমি' (জ্যোতির্বিজ্ঞান)।

Atmosphere (বায়ুমন্ডল)ঃ মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী গ্যাসীয় স্তরকে Atmosphere (বায়ুমন্ডল) বলা হয়।

Aurora (মেরু জ্যোতি)ঃ গ্রহের মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে সূর্যের প্রবহমান উত্তপ্ত বায়ু (Solar wind)-র দ্বারা উর্ধ্ব আবহ্মন্ডলে আলোর যে বৈচিত্রময় রংয়ের প্রদর্শনী সৃষ্টি হয়, এটাকেই Aurora বা মেরুজ্যোতি বলা হয়। মেরুজ্যোতি সবসময়ই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

Big Bang (সৃষ্টিতত্ত্ব)ঃ যে মতবাদ কল্পনাতীত এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করে, এটাই 'Big Bang' নামে পরিচিত।

Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র)ঃ খুবই পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি নক্ষত্রের একটি অপরটিকে ঘিরে যদি আবর্তন করে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিকর্ষ (Gravitation) বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে Binary star বলা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই Binary পদ্ধতিতে মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

Black hole (নক্ষত্র ধ্বংস-স্থান)ঃ মহাকাশে বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব অথচ অদৃশ্য এমন স্থান যেখানে অভিকর্ষ বল (Gravitation) অকল্পনীয় টানে (Enormous pull) সকল কিছুকে কেন্দ্রের দিকে টান্‌তে থাকে। এই টান থেকে সবচেয়ে দ্রুততম 'আলোকরশ্মি' ও আত্মরক্ষা করতে পারে না, ব্ল্যাক হোলের মুখে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। Black hole মহাকাশে 'মৃত্যুকূপ-র' ভূমিকায় রত।

Cluster (গুচ্ছ)ঃ বহু সংখ্যক নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সীর কাছাকাছি-নিকটে 'গ্রুপ' হয়ে অবস্থান করাকে ক্লাস্‌টার বলা হয়।

Comet (ধূমকেতু)ঃ ধূলা-বালি, শিলাখন্ড ও পাথর কুঁচি এবং বরফের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু খন্ডকে 'ধূমকেতু' বলে। ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে (oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Coma (কোমা)ঃ ধূমকেতুর বরফাচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সূর্যের কিরণে সৃষ্ট ব্যাপক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে 'Coma' বলে।

Constellation (নক্ষত্র পুঞ্জ)ঃ খুবই নিকটবর্তী হয়ে অবস্থানগ্রহণকারী একগুচ্ছ তারকা, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে দেখতে কোন জিনিসের একটা আকৃতির মত দেখায়, এটাই নক্ষত্র পুঞ্জ (Constellation) নামে পরিচিত। পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে সর্বমোট ৮৮টি Constellation নির্দিষ্ট আছে।

Core (মধ্যবর্তী স্থান)ঃ নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা Asteroid বা Comet-এর কেন্দ্রীয় অংশকে বলা হয়, যা এর চতুর্দিকের একাধিক স্তরের বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

Corona (কোরোনা)ঃ সূর্যের আবহমন্ডলের বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরের (Outermost part) অংশকে 'Corona' বলা হয়।

Cosmic ray (মহাজাগতিক রশ্মি)ঃ খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (Highly energetic particles) যা মহাশূন্যে প্রায় আলোর গতিতে ভ্রমণ করে থাকে। Gamma-ray, X-ray, Ultra violet ray সবই Cosmic ray-র অন্তর্ভুক্ত।

Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব): মহাবিশ্বের সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসম্পর্কে 'গবেষণাই' হচ্ছে 'Cosmology।

Day (দিন): কোন গ্রহ তার অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘূর্ণনে (Spin around once) যে সময়ের প্রয়োজন হয়, এর সমষ্টিকে দিন (Day) বলা হয়।

Dwarf Star: আমাদের সূর্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সূর্যকে Dwarf star বলা হয়।

Eclipse (গ্রহণ): মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবর্তন করতে গিয়ে কখনও একটি বস্তুকর্তৃক অপর কোন বস্তু পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে যায়, এটাই 'Eclipse'। যেমন চন্দ্র যখন সূর্যের সম্মুখ দিয়ে গমন করে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না, ঐ অবস্থাকেই তখন সূর্য গ্রহণ (Eclipse) বলে।

Electron (ইলেকট্রন): সকল পরমাণুর ভিতর নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণিকা যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। সংখ্যায় এরা সবসময় নিউক্লিয়াসের উপাদান প্রোটন কণিকার সমানসংখ্যক হয়ে থাকে। এদের ওজন প্রায় 9.1×10^{-31}kg.

Element (উপাদান): একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

Escape Velocity (মুক্তি গতি): কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে পালিয়ে যেতে সর্বনিম্ন যে গতির প্রয়োজন হয়, তাই Escape velocity। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পূর্ণরূপে পালিয়ে যাওয়ার সর্বনিম্ন 'মুক্তিগতি' হচ্ছে ১১.২ কিঃমিটার/সেকেন্ড।

Event horizon: ব্ল্যাক হোলের চতুর্দিকে সৃষ্ট 'বাউন্ডারী' (Boundary) যেখানে 'মুক্তি গতি' (Escape velocity) আলোর গতির সমান প্রায়। এই স্থানে কোন বস্তু আসার পর আর তার রক্ষা নেই, বস্তুটি মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে 'ব্ল্যাক হোলে' চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

Gas Giant: তুলনামূলকভাবে ছোট কোর (Core) বিশিষ্ট এবং ঐ কোরকে ভিত্তি করে চতুর্দিকে গ্যাস ও তরল পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট গ্রহকে 'গ্যাস জায়ান্ট' বলা হয়।

Light Second (আলোক

Galaxy (নক্ষত্র শহর): নক্ষত্রসমূহ, ধূলা-বালি ও গলিত পদার্থের মেঘপুঞ্জ (নেবুলা), স্টার ক্লাস্‌টার, গ্লোবুলার ক্লাস্‌টার ইত্যাদির একত্রে মিলিত এক বিরাট দল বা গ্রুপকেই বলা হয় গ্যালাক্সী। বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছেন।

Giant Star: আমাদের সূর্যের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় সূর্য হচ্ছে 'Giant Star'.

Gravitation (অভিকর্ষ): যে শক্তি (The force of attraction) বস্তুসমূহকে পরস্পরের দিকে টানে, তাই অভিকর্ষ বল বা Gravitation, উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ই সবসময় অভিকর্ষ (Gravitation)বলের টানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gamma-ray (গামা-রে): সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশান (High energy radiation), যা জীব এবং প্রাণীর দেহকোষের সংস্পর্শে আসামাত্র কোষগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধ্বংসসাধন করে থাকে। সকল প্রকার আলোকরশ্মির মধ্যে Gamma-ray সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও বিপদজনক।

সেকেন্ড): এক সেকেন্ড সময়ে আলোকরশ্মি যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট সেকেন্ড বলা হয়। এক সেকেন্ডে আলোকরশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

Light Minute (আলোক মিনিট): পূর্ণ এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট মিনিট বলে।

Light Year (আলোকবর্ষ): আলোক রশ্মি (Ray of light) এক বৎসর সময়ে যতটুকু পথ যেতে পারে, ঐ দূরত্বকে 'এক আলোকবর্ষ' (One light year) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে এক আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (৬ ট্রিলিয়ন মাইল)।

Magnitude: মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের 'উজ্জলতা'কে বলা হয়।

Moon (চাঁদ): ধূলা-বালি, শিলাপ্রস্তর দিয়ে তৈরী প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাস সম্পন্ন বিরাট বল, যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Meteor (উল্কা): ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথরকণা বা কুচি যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করামাত্র বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলোর ফুল্‌কি সৃষ্টি করে, যা Shooting Star হিসাবেও পরিচিত।

Meteorite (ভূপতিত উল্কা): যে সকল উল্কা বায়ুমন্ডলে পুড়ে-পুড়ে পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত সে আঘাত করে। এদেরকে Meteorite বলা হয়।

Meteoroid :

যে সমস্ত উল্কা আকারে একটু বড় এবং সূর্যকে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, এদেরকেই বলা হয় Meteoroid।

Meteor shower :

পৃথিবী যখন কোন ধূমকেতুর কক্ষপথ ছেদ করে পরিভ্রমণ করে তখন ঐ ধূমকেতু থেকে নির্গত ব্যাপক Meteor (উল্কা) পৃথিবীর আবহমন্ডলে প্রবেশ করে (স্বল্প সময়ের জন্য) বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে পুড়ে বিরাট এলাকা নিয়ে একই সাথে যে ব্যাপক আলোর ফুলঝুরি প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে ওটাই Meteor shower।

Matter: বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্ব ধারণ করেছে।

Molecule (অনু): রাসায়ণিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' গঠিত হয়। অনুকেই সাধারণত পদার্থের মৌলিক এক হিসেবে ধরা হয়।

Milky Way Galaxy: আমাদের এই সৌরজগত যে গ্যালাক্সীর অন্তর্গত, তাকেই Milky way galaxy বলা হয়। গ্যালাক্সীটির মাঝখানে অত্যাধিক বিকিরনের কারণে দুধের মত সাদা ধবধবে পথের ন্যায় চিহ্ন থাকায় ঐ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

NASA (নাসা): The National Aeronautics and Space Administration যা আমেরিকান সরকারের নির্দেশে মহাকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের পিছনে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

Nebula (নেবুলা): ধূলা-বালি এবং গ্যাসের সমন্বয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ, যে মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি নামে না, কিন্তু জন্ম নেয় শত-সহস্র নক্ষত্র। অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল হচ্ছে নেবুলা।

Neutron (নিউট্রন): বস্তুর ক্ষুদ্রতম Unit– 'এ্যাটমিক নিউক্লি'-র ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র কণিকা (Sub atomic particle) যা নিরপেক্ষ, চার্জবিহীন (Zero electric charge) এবং এদের ওজন হচ্ছে প্রায় 1.67×10^{-27}kg। পরমাণুর ভিতর প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী করে।

Neutron Star (নিউট্রন ষ্টার): বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (Supergiant Star) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধ্বংসাবশেষে ছোট আকারের যে প্রচন্ডগতিতে আবর্তনশীল অংশটি (Small spinning part) থেকে যায়, তাকেই 'নিউট্রন স্টার' বলা হয়। এটা 'নিউট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

Nova (নোভা): যে সকল নক্ষত্র হঠাৎ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়ে চিরতরে ম্লান হয়ে যায়, ঐ নক্ষত্রগুলোকে নোভা বলা হয়।

Nucleus: জ্যোতিশাস্ত্রে গ্যালাক্সীর মধ্যস্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট অংশকে 'nucleus' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধূমকেতুর সম্মূখে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকেও Nucleus হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

Nuclear Fusion: যে পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ভিতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্যাসীয় কণা (Atoms) পরস্পর মিলিত হয়ে বড় বড় ভারী বস্তুকণা সৃষ্টি করে, ঐ পদ্ধতিকেই 'Nuclear fusion' বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি সংঘটিত হওয়ার সময় ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে তেজস্ক্রীয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

Orbit (কক্ষপথ): মহাশূন্যের মাঝে কোন একটি বস্তু যে কাল্পনিক পথের উপর দিয়ে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আরেকটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে ঐ পথটিকেই 'Orbit' বা কক্ষপথ বলে। যেমন পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর দিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে।

Planet (গ্রহ): নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত অপেক্ষাকৃতভাবে বড় বস্তুকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রের মত এদের ভিতরে তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয় না। আমাদের সৌরপরিবারে এ পর্যন্ত ৯টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

Pulsar (পালছার): নিউট্রন স্টার থেকে নির্গত আলোকরশ্মি (Radiation), যা নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচন্ড গতিতে আবর্তিত হয়ে থাকে।

Planetary nebulae: ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের বাইরের দিকের স্তরের নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ যা মহাশূন্যে মেঘের ন্যায় ছড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে।

Prominence: সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, যা কখনও লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আঠ হাজার মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Protostar: একটি পূর্ণ নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পথে 'প্রাথমিক একটা পর্যায়', যে পর্যায়ে তখনও ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিউশান' শুরু হয়ে পারমাণবিক চুল্লী চালু হয়নি।

Proton (প্রোটন): পরমাণুর অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা, যা নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। এর ওজন হচ্ছে 1.67×10^{-27}kg।

Photon (ফোটন): আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকাই হচ্ছে 'ফোটন'। মহাশূন্যে এর চলার গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল।

Parsec (পারসেক): ৩.২৬ আলোকবর্ষ সমান এক 'Parsec'। মহাশূন্যে ব্যাপক-বিশাল দূরত্বের হিসাবকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ করার নিমিত্তে 'পারসেক' হিসাবের অবতারণা করা হয়েছে।

Quasar (কোয়াসার): টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত সীমানার প্রায় প্রান্তে আবিষ্কৃত. খুবই উজ্জ্বল মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক, যা দেখতে একটি নক্ষত্রের মত কিন্তু এটা উজ্জ্বলতা ছড়ায় ১০,০০০ মিলিয়ন গড় গ্যালাক্সীর তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সীর আলোর সমান।

Radiation (তেজস্ক্রিয়তা): কোন বস্তু থেকে নির্গত তাপ যা শক্তি হিসেবে ঢেউয়ের (Wave) মত চলার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

Red giant (লাল বামন): আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় নক্ষত্রের ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত, যখন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়ে আয়তনে বহুগুণে বেড়ে যায়।

Satellite (উপগ্রহ)ঃ মহাশূন্যে কোন গ্রহকে অপর কোন বস্তু কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকলে ঐ আবর্তনকারী বস্তুটিকে উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী উপগ্রহ ও (Satellite) পৃথিবীকে, চাঁদকে আবর্তন করছে, তবে শর্ত হচ্ছে উপগ্রহের আবর্তনগতি আবর্তনকৃত বস্তুর কমপক্ষে 'মুক্তিগতির' সমান হতে হবে।

Solar System (সৌর জগত)ঃ একটি নক্ষত্রকে ঘিরে যে কয়টি গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু ও গ্রহানু চতুর্দিকে আবর্তন করে এবং নক্ষত্রের অভিকর্ষবলের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে, নক্ষত্রসহ ঐ গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহানুগুলোকে একত্রে সৌরজগত বলা হয়ে থাকে।

এক কথায় নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে আবর্তনশীল সকল বস্তুকে একত্রে সৌরজগত নামে অভিহিত করা হয়।

Solar wind: সূর্যের পৃষ্ঠদেশ (Surface) থেকে মহাশূন্যে (Invisible particles) অদৃশ্য ক্ষুদ্রবস্তুকণার অনবরত যে আলোক ধারা (Stream) প্রবাহিত হতে থাকে, এটাই Solar wind।

Space Craft: মহাশূন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানকার্যে পরিভ্রমণ করার জন্য যা' তৈরী করা হয়।

Space probe: মনুষ্যবিহীন আকাশযান, এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কসমূহের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরক্ষণে তা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীগণের নিকট প্রেরণ করা।

Space Shuttle: যে আকাশ যানের (Space craft) মাধ্যমে নভোচারী এবং প্রয়োজনীয় মালামাল মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, তাকে Space shuttle বলে। একে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করা হয় কিন্তু অবতরণ করে বিমানের মত। Space shuttle বার বার ব্যবহার করা হয়।

Space Station: এটা বড় ধরনের মনুষ্যবাহী উপগ্রহ বা Satellite মহাশূন্যের মধ্যে, মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকার্য চালাবার জন্য একে ভাসমান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Universe (মহাবিশ্ব)ঃ মহাশূন্যে বিরাজমান সকল প্রকার

Sun (সূর্য): একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র, যা আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং এর অভ্যন্তরে 'ফিউশান' পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত তাপ ও আলো ছড়িয়ে গোটা সৌরজগতকে ভাসিয়ে রাখছে।

Supergiant star: খুবই উজ্জ্বলতা সম্পন্ন বৃহৎ নক্ষত্র। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক মিলিয়ন বৎসর। নক্ষত্র যত বড় হবে তার আয়ুষ্কাল তত কম হবে।

Supernova (সুপার নোভা): বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের (Supergiant star) ধ্বংসজনক 'মহা বিস্ফোরণ-ই হচ্ছে 'সুপার নোভা', যা কল্পনাতীত আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই সুপার নোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাক হোল'।

Star (নক্ষত্র): অবিরত বিস্ফোরণশীল গ্যাসীয়বল যার ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় আলো এবং তাপ (Light and heat)। আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র।

মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে আয়তনের জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে, ঐ স্থান এবং বস্তুসমূহসহ পুরোটাকেই মহাবিশ্ব বলা হয়।

X-ray (এক্স-রে): খুবই সংক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট 'ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশান', যা জীব এবং প্রাণীদেহের জন্য খুবই বিপদজনক আলোকরশ্মি।

Year (বৎসর): একটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে একবার আবর্তন করে আসতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ের দৈর্ঘ্যকেই 'বৎসর' বলা হয়। পৃথিবী ৩৬৫ দিন, ৬ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে, যা গণনায় এক বৎসর ধরা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. আল-কুরআনুল কারীম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং
2. The Holy Quran– Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Saudi Arabia.
3. The Translation of The Holy Qur'ân in Simple English– SMH, QADRI.
4. তাফহীমুল কুরআন– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
5. Guide to Space–Peter Bond–1999.
6. Night Sky–Discovery Channel–1999.
7. A Photographic Tour of the Universe–Gabriele Vanin–1996.
8. The Search for Infinity–Gordon Farser, Egil Lillestor & Inge sellevag–1999.
9. The Universe Revealed–Pam Spence–1996.
10. Astronomy From the Earth to the Universe–Pasa Choff–1995.
11. Stars & Planets–Ian Ridpath–1997.
12. Astronomy & Space–Lisa Miles and Alastair Smith–1999.
13. Astronomy Dictionary–Philip's–1999.
14. Inventions–G.I.Brown–1996.
15. Man in Space–Eugene A. Cernan–1999.
16. The Changing Universe, Big Bang and After–Trinh Xuan Thuan–1993.
17. Astronomy & Astrophysics–Zeilik, Gregory–1998.
18. Space Atlas–Robin Kerrod–1996.

19. Embracing Earth–Payson R. Stevens and Kevin W. Kelley–1992.
20. The Universe Explained–Colin Ronan–1994.
21. The Visual Dictionary of the Universe–Eyewitness Visual Dictionaries–1994.
22. How the Universe Works–Eyewitness Science Guides–1994.
23. Inventors and Discoverers–Changing Our World–1888.
24. LIFE–Eyewitness Science–1996.
25. ECOLOGY–Eyewitness Science–1995.
26. Guinness Book of Knowledge–1997.
27. Force & Motion–The Science Museum, London–1993.
28. MATTER–The Science Museum–1992.
29. Time & Space–Eyewitness Science–1994.
30. Astronomy–Eyewitness Science–1995.
31. Atlas of the Universe–Patrick Moore–1999.
32. Qur`ân for Astronomy and Earth Exploration from Space–S. Waqar Ahmed Husaini–1996.
33. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব–১ কাজী জাহান মিয়া–১৯৯৬
34. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব–২ কাজী জাহান মিয়া–১৯৯৭
35. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান–ডঃ মরিস বুকাইলি–১৯৮৬
36. মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা–সুধাংশু পাত্র–১৯৮৫
37. চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব –অনুবাদকঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান–১৯৯৫
38. The Universe Seen Through The Quran–Mir Anees-ud-din–1999.
39. Great Scientific Discoveries–Chambers Compact Reference–Gerald Messadie–1998 to June -2000.
40. Astronomy Magazine (U. S. A.), from July–1998 to June-2000.

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন, পিতা মরহুম জামাল আহাম্মাদ, মাতা জয়গুনা বানু, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেইচর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৯ সালে।

তাঁর শৈশবকাল গ্রামেই কাটে। পিতার চাকুরী সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে পড়াশুনা করতে হয়। কৈশরকাল কাটে ভৈরবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার সাথে সাথে তিনি চট্টগ্রামে পাহাড়তলী রেলওয়ে হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

অতঃপর যখন তিনি ৭ম শ্রেণীতে উন্নীত হন তখনই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ফলে তাঁর শহরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তিনি পরিবারের সবার সাথে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। সেখানে গ্রামের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯৭৪ সালে তিনি এস.এস.সি পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে ১৯৭৯ সালে পাওয়ার টেকনোলজি থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি তিন বছর চট্টগ্রাম পোর্টে এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরী করেন। অতঃপর সৌদি আরবের রিয়াদে একটি কোম্পানীতে চাকুরী নেন। একই কোম্পানীতে প্রায় ২০টি বছর চাকুরীরত থাকাকালে কুরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখার খুবই আগ্রহ জাগে এবং উক্ত বিরাট সময়ে তিনি কুরআন ও বিজ্ঞানের অসংখ্য দলিল সংগ্রহ করেন। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে তিনি কাঙ্ক্ষিত লেখায় নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

বাংলাদেশে আসার পর তিনি ডিভাইন লাইট রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে তার গবেষণা চালিয়ে যান। বিগত কয়েক বছর থেকে 'লাইট আপন লাইট' নামে একটি জনপ্রিয় টিভি প্রোগ্রাম তিনি এককভাবে পরিচালনা করে আসছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের কুরআন ও বিজ্ঞান গবেষকদের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ২০০৭ সালে তিনি অন্যান্যদের সাথে, 'দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর এই সাধনার পেছনে একটি মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করছে, আর তা হচ্ছে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আমরা তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।